প্রথম খণ্ড

লুই ফিসার

পূর্ব্বাশা লিমিটেড

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৫৫
দাম পাঁচ টাকা

পূর্ব্বাশা লিঃ, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা
হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম পর্ব্ব

মানুষ, রাষ্ট্রনীতি আর যুদ্ধ

ডানকার্ক ও তার পর

যুদ্ধ রক্তাক্ত রাজনীতির নামান্তর। যুদ্ধ সুরু হবার আগে সংগ্রামটা কূটনীতিকদের কথা-ছোড়াছুড়ির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। কূট-নীতিকরা যখন ব্যর্থ হয়, মাত্র তখুনি সৈন্যদের ভেতর বোমা ছোড়াছুড়ির পর্ব্ব সুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধপূর্ব্ব রাজনীতিরই পরিণাম।

বিগত যুদ্ধে একটি বিষয়ের মীমাংসা হ'য়ে গেছে।—পৃথিবীর ওপর জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপানের আধিপত্য করবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। অবশ্য, অন্যান্য অনেক সমস্যারই কোনো কিনারা হয় নি। সেই সব সমস্যার হয় রাজনৈতিক, না হয় সামরিক সমাধান খুঁজে বার করতে হবে।

অস্ত্রসজ্জার ক্রমবর্দ্ধমান ভীষণতাদ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। লোকক্ষয় ও সম্পত্তিনাশের দিক দিয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে অধিক। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরও বেশী ভয়ঙ্কর হবে। প্রত্যেকটি যুদ্ধ তার পূর্ব্ববর্ত্তী যুদ্ধ অপেক্ষা ভীষণতর হয়েছে। কিন্তু এই তথ্যটি জানা থাকা সত্বেও যুদ্ধের গতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। যুদ্ধের ক্রমস্ফীত ভয়াবহতার একমাত্র ফল দেখা যায় এই যে কোনো কোনো গবর্ণমেন্ট তদ্দরুণ যুদ্ধে জড়িত হতে ভয় পায়। কিন্তু সেইটেই আক্রমণকারীর আসল পুঁজি। গড়পরতা সাধারণ মানুষের যুদ্ধের ভয় এত প্রচণ্ড যে লোকায়ত্ত গবর্ণমেন্ট নিমজ্জমান ব্যক্তিকর্ত্তৃক তৃণখণ্ড ধারণের ন্যায় যে জিনিষের ভেতর শান্তির এতোটুকু আশ্বাস আছে তাকেই আঁকড়ে ধরে—তা সম্মেলন হোক্, বক্তৃতা হোক্, চাই কি ক্ষুদ্র একটি পত্র হোক্। তোষণনীতির উদ্ভব এভাবেই প্রধানতঃ হয়।

১৯৩১ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে একনায়কত্বশাসিত প্রধান প্রধান রাষ্ট্র প্রত্যেকটিই পররাষ্ট্রআক্রমণদোষে দোষী। কেবলমাত্র একনায়কত্ব-শাসিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিই এই দোষ জানানো যায়; কোনো গণতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্র পররাষ্ট্র আক্রমণ করে নি। আধুনিক গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রগুলিকে তাদের প্রজাপুঞ্জের মুখ চেয়ে চল্‌তে হয়; স্বৈরাচারী রাষ্ট্রগুলির সে বালাই নেই।

গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক দাঁড়াবে তাকে কেন্দ্র ক'রেই যুদ্ধের সম্ভাবনা নিবারণের প্রশ্নটি আবর্ত্তিত হচ্ছে। একনায়কত্ব-শাসিত রাষ্ট্র কর্ম্মে অত্যন্ত ক্ষিপ্র, কারণ নীতিগত খুঁতখুঁতি কিম্বা জনমত—এর কোনোটাই তার সিদ্ধান্তকে ব্যাহত করতে পারে না। পক্ষান্তরে, গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রগুলির সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া মন্থর—যখন কয়েকটিতে মিলে প্রত্যেকের পক্ষে গ্রহণীয় একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চায় তখন হয়তো আদৌ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় না, অথবা কোনো কিছু না করার সিদ্ধান্তই শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হয়। ১৯৩৯-এর আগে এই ধরণের ঘটনা কয়েক বারই ঘটেছে।

এটাকে শক্তির চিহ্ন বলা যায় না। গণতন্ত্রগুলির শান্তি স্বৈর-শাসিত রাষ্ট্রগুলির সর্ব্বাত্মক আক্রমণ দ্বারা প্রথমে ব্যাহত, পরে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়েছিলো। কিন্তু আলবানিয়া, চীনের ওপর জাপানের আক্রমণ, আবিসিনিয়া, আলবানিয়া ও স্পেনের ওপর ইতালীর আক্রমণ এবং অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর নাৎসিদের আক্রমণ ঠেকাবার শক্তি গণতন্ত্রগুলির ছিলো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তিই ছিলো। ১৯৩৬-এর মার্চ্চে হিট্‌লার কর্ত্তৃক রাইনল্যাণ্ডের পুনঃসশস্ত্রীকরণ একমাত্র ফ্রান্সই ভণ্ডুল ক'রে দিতে পারতো।

পররাষ্ট্রআক্রমণ ও সম্প্রসারণনীতি যে পরিণামে নিজেদেরই বিনাশ ডেকে আনে এটা বোঝ্‌বার মতো বুদ্ধি একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রগুলির

ছিলো না। এদিকে, গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রগুলি তাদের সমস্যা-সমাধানে চূড়ান্ত রকমের অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলো।

গণতন্ত্রশাসিত কতিপয় রাষ্ট্র রাষ্ট্রনীতিক প্রত্যাসন্ন বিপদের বার্ত্তা পান নি। কিন্তু কেউ কেউ, দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্ট, পূর্ব্বাহ্ণেই বিপদের আভাস পেয়েছিলেন। ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে তিনি প্রকাশ্যে আসন্ন বিপদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি পার্লামেণ্ট ও ভোটদাতাদের বিতৃষ্ণার জন্যে রাষ্ট্রনীতিকরা এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন ছিলো না। কেবল মাত্র রাজনৈতিক কিম্বা অর্থনৈতিক তৎপরতাই বিপদ এড়াবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। এই ক্ষেত্রে কূটনীতির বৈদেশিক কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় দপ্তরগুলির অবাধ ক্ষমতা ছিলো। তারা ভুল করলো, কেন না, কূটনীতি তখন জটিল দরকষাকষি ও দেয়া-নেয়ার প্রক্রিয়ামাত্র ছিলো—এখনও তা-ই আছে। সুতরাং ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থগুলির প্রতি অতিরিক্ত নজর দিতে গিয়ে বৃহত্তর আন্তর্জ্জাতিক লক্ষ্য—শান্তি—কূটনীতির দৃষ্টিতে হারিয়ে যায়। তাছাড়া, বিপদ "কেটে" যেতে, অবস্থা "শান্ত" হ'তে রাষ্ট্রনীতিকের দল ও জনসাধারণ অতিরিক্ত রকম খুসী হ'য়ে ওঠে। আপাততঃ ফাঁড়া কেটে গেছে এইতেই ওদের আনন্দ; সমস্যার যথার্থ সমাধান হ'লো কি না তা' তারা বিচার ক'রে দেখে না। তারপর কোনো একদিন হয়তো দেখা যায়, সেই অমীমাংসিত সমস্যা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী বৎসরগুলিতে চক্রশক্তির বিপক্ষীয় কোনো গবর্ণমেণ্টই যুদ্ধনিরোধের জন্যে পুরাপুরি, এমন কি আংশিক চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। তৎপরিবর্ত্তে রাজনীতিকরা বলেছিলো: হিট্‌লার সংগ্রামমুখী, কাজেই তার নিকট আমাদের নতি স্বীকার করা দরকার। কিন্তু একবার সে গুছিয়ে বসতে পারলে তার

বন্ধুত্ব রুশিয়ার পাল্টা জবাব হিসাবে যথেষ্ট কাজে লাগ্‌বে। তারা বল্‌লো : আবিসিনিয়া আক্রমণ একটি দুষ্কৃতি ও কুৎসিত ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যদি মুসোলিনিকে খুব বেশী চেপে না ধরি, তা হ'লে সে হয়তো হিটলারের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে যোগ দিতে পারে। তারা বল্‌লো : স্পেনে বামপন্থীদের জয় হ'লে সর্ব্বত্র বামপন্থী প্রভাব ছাড়িয়ে পড়তে পারে ; ফ্রাঙ্কো রোম ও বার্লিনের ক্রীড়নক হ'তে পারে, কিন্তু টাকা ধার দিয়ে তার সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার ক'রে, স্পেনের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না ক'রে আমরা তাকে হাত করতে পারি। আশু লাভালাভের নিরিখে তারা সব কিছু বিচার করেছে, আদর্শের হিসাব তাদের চিন্তায় কখনও স্থান পায়নি।

এই তোষণের প্রক্রিয়াগুলির ফলে হিট্‌লার, হিরোহিতো এবং মুসোলিনি অনেকগুলি যুদ্ধই বিনারক্তপাতে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তাতে ক'রে আসল যুদ্ধ আরও বেশি রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

রাজনীতি শুধু যুদ্ধ বাধাবার জন্যেই দায়ী নয়, যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যেও দায়ী। (যুদ্ধজয়ের ফলকে নষ্ট করতেও রাজনীতি দায়ী।)

যুদ্ধপূর্ব্ব রাজনৈতিক দ্বিধাসঙ্কোচগুলি যুদ্ধ বাধাবার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিলো। তোষণনীতি সংক্রামক। এক গবর্ণমেণ্ট তাকে বর্জ্জন করতে আরেক গবর্ণমেণ্ট তাকে তুলে ধরলো। ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন ছাড়া অন্য কোন চক্রশক্তি-বিরোধী দেশ আক্রান্ত হবার আগে যুদ্ধঘোষণা করে নি। ফ্রান্স ১৯৩৯-এর ৩ রা সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটায় যুদ্ধরত হলো, তার কারণ সেই দিন বেলা এগারটায় ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। বরাবরই ফ্রান্সের একা পরিত্যক্ত হয়ে থাক্‌বার ভয়। একমাত্র গ্রেট ব্রিটেনের লোকরা ভালো ক'রে বুঝেছিল—বিলম্বে হ'লেও বুঝেছিল—তাদের জাতীয় ও

রাজ্যিক স্বার্থ কতো বিপন্ন। নাৎসি আক্রমণের আঘাত ব্রিটিশ ভূমি ও ব্রিটিশ জনগণের ওপর নিপতিত হবার আগেই তাই নেভিল চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্ট খুব বেশি ফ্যাসীবিরোধী না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হ'লো। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একই রূপ গড়িমসি করতে লাগ্‌লো। মাসের পর মাস ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনী শুধু কাগজী ইস্তাহার ফেলেছে, অথচ তাদের হাতে বোমা ছিলো। ১৯৪০-এর ২রা ফেব্রুয়ারী 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌'-এ যুদ্ধসংবাদ পরিবেশিত হয় দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের একেবারে তলার দিকে মাত্র ছয় ইঞ্চি পরিমিত জায়গায়। তার শিরোনামা ছিল—"পশ্চিম সমরাঙ্গনে তৎপরতা বৃদ্ধি"। তিনদিন পর ঐ কাগজটি আবার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ছাপ্‌লো: "ফরাসী পক্ষ কর্তৃক খণ্ডযুদ্ধে জয়ের দাবী।" ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের কাগজে এক শিরোনামা এইরূপ: "ইংলণ্ডের আকাশে ভীষণতম যুদ্ধে বৃটিশ কর্তৃক তিনটি নাৎসীবিমান ভূপাতিত এবং চব্বিশটি বিমান পর্য্যুদস্ত"। নেভিল চেম্বারলেন ১৯৪০-এর ৩১শে জানুয়ারী পার্লামেণ্টে অভিযোগ করেন, "কমন্সসভার বিতর্ক এবং সংবাদপত্রের অপেক্ষাকৃত চমকপ্রদ স্তম্ভের খবরগুলি পড়লে এই ধারণাই হবে যে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধজয়ের জন্য খুব সামান্য চেষ্টাই করেছে।" উপরের শিরোনামাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এইরূপ অভিযোগ করবেন তা মোটেই বিচিত্র নয়।

এটাকে বলা যায় যুদ্ধের উপক্রমণিকার পর্য্যায়। নাৎসী ও বল্‌শেভিক সৈন্যেরা মিলে পোল্যাণ্ডকে উৎখাত করেছিলো। তারপর জার্ম্মান যুদ্ধ কিছুদিন যেন থেমে থাকে। শেষে হিট্‌লার স্ক্যাণ্ডিনেভীয় উপদ্বীপ ও পশ্চিম ইউরোপের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

সত্যিকার যুদ্ধ হচ্ছিল উত্তরাঞ্চলে তুষার প্রদেশে—লাল ফৌজ ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে। ১৯৩৯-এর ৩০শে নভেম্বর রুশিয়া কর্তৃক

ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ এবং সেই দিনই রাত্রিতে হেলসিঙ্কির ওপর বোমাবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রুশবিরোধী মনোভাবের স্রোত বয়ে গেলো। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট রুশিয়ার সহিত বানিজ্যের ওপর নীতিগত বাধা আরোপ করলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নাম সভ্যপদ থেকে খারিজ করলো। চীন, স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর যখন ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ সঙ্ঘটিত হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘ চোখ বুঁজে ছিলো। কিন্তু রুশ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সে ঘুরে দাঁড়ালো। নিউইয়র্ক সহরে বিশপ ম্যানিং ফিন্‌ল্যাণ্ডের জন্যে সাহায্যের আবেদন জানালেন। ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে লুথারপন্থী চার্চ্চ পাঁচলক্ষ ডলার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অভিযান সুরু করলো। স্পেনীয়রা যখন ফ্যাসিষ্ট আক্রমণে উৎসাদিত হচ্ছিল, হার্ব্বার্ট হুভার তখন চুপ ক'রে ছিলেন। আজ তিনি ফিন্‌দের জন্যে সর্ব্বাত্মক সাহায্য-অভিযানের প্রস্তাব করলেন।

ফিন্‌রা তাদের শক্তিমান প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রচণ্ড সব আক্রমণ প্রতিহত করলো এবং বহু সোভিয়েট তরুণের প্রাণ নিলো। ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট ক্যোস্‌টি কেল্লিও ১৯৪০-এর ১লা ফেব্রুয়ারী এই "বর্ব্বর অর্থহীন আক্রমণ"-এর অবসানের জন্য "সম্মানজনক শান্তির" আবেদন জানালেন।

মস্কোর 'প্রাভ্‌দা' জবাব দিলে, "ফিন্ দস্যুদের বিনাশ ও বিলোপ করা হবে।" কাগজটি সেই সঙ্গে আরও জানালে, "আমাদের মহান নায়ক ষ্টালিনের নেতৃত্বাধীনে আমরা ফিন্‌দের ওপর জয়লাভ করবো।" "ষ্টালিন এমন এক মানুষ যার হৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায়, মুখমণ্ডল শ্রমিকের ন্যায়, চেহারা সৈনিকের ন্যায়।" কিন্তু 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' ষ্টালিনকে "হৃদয়হীন প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচারী" আখ্যায় আখ্যাত করলো। ওয়াণ্টার লিন্‌ম্যান লিখলেন, "ষ্টালিন

একজন হৃদয়হীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি।" তিনি ফিন্‌দের সাহায্য করার ওপর জোর দিলেন। মস্কোতে 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের' প্রতিনিধি জোসেফ বার্ণস ১৯৩৯-এর ১লা ডিসেম্বর ঐ কাগজে লিখলেন যে ফিন্‌ল্যাণ্ড "সুদীর্ঘ জাতীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি সংহত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। 'ফ্যাসিষ্ট' কথাটাকে সোভিয়েট যেরূপ ঢিলে অর্থে ব্যবহার করে, সে অর্থেও ফিন্‌ল্যাণ্ডকে ফ্যাসিষ্ট বলা যায় না।"

ব্রিটেনে ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারীতে গৃহীত একটি 'গ্যালাপ্ পোল' (জনমতনির্ণায়ক পদ্ধতি)-এর ফল থেকে জানা যায়, যে-সমস্ত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা গেছে তাদের ভেতর শতকরা ৭৪ জন ফিন্‌ল্যাণ্ডে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার পক্ষপাতী ছিল, আর শতকরা ৩৩ জন ছিল সৈন্য পাঠাবার পক্ষপাতী।

কম্যুনিষ্ট পার্টির কিছু বুদ্ধিজীবী সভ্যপদে ইস্তফা দিলে; সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণকারী দেশে পরিণত হওয়ায় তারা সরে দাঁড়ালো। হেল্‌সিঙ্কিতে ব্রিটিশ ট্রেড-ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের অধিনায়ক স্যার ওয়াল্টার সিট্রিন ফিনীয় সহর ও সমরাঙ্গন পরিদর্শনে দশদিন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি লিখলেন যে, যুদ্ধোপকরণের দিক দিয়ে ফিন্‌ল্যাণ্ডকে চূড়ান্ত সাহায্য দেওয়া দরকার। হয়তো জনবলের সাহায্যও প্রয়োজন।

১৯৩৬ সালে সিট্রিন স্বরচিত একটি পুস্তকে সোভিয়েট শাসন ও তার পদ্ধতি-প্রকরণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ফিন্‌ল্যাণ্ডের ব্যাপারে সিট্রিন আরও বেশি সোভিয়েট-বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে হিটলারের আক্রমণে রুশিয়া যখন মূল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো, তিনি সোভিয়েট-সুহৃৎ হয়ে দাঁড়ালেন। রাজনীতিতে বাস্তবস্বার্থের নির্দেশ ও স্বদেশপ্রেম আদর্শের চাইতে বলবত্তর প্রেরণা। হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতি, ইহুদী-নিপীড়ন ও অমানুষিক বৈরনির্য্যাতন

সত্ত্বেও ১৯৩৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহু উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক ইংরাজ তোষণকারী তাকে চমৎকার লোক বলে মনে করেছিলো। তারপর যুদ্ধকালীন স্বদেশপ্রেমের প্রয়োজনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ঘুরে গেলো। তারা তাদের গবর্ণমেণ্টকে অনুসরণ করলো ; তাদের জ্ঞানবিশ্বাসকে নয়।

ব্রিটেনের আজন্মমৃত্যু নিরাপত্তা পরিকল্পনার রচয়িতা স্যার উইলিয়াম বীভারিজ ১৯৪৫-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী কমন্সসভায় বল্‌লেন, "আদর্শকে আমাদের আঁকড়ে ধরে থাক্‌তে হবে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে আমাদের আদর্শ অনুযায়ী চল্‌তে হবে। যদি এমন দেখা যায় যে বন্ধুর প্রতি আনুগত্য ও আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভেতর বিরোধ বেধেছে, তা হলে আদর্শকেই অবলম্বন করে থাকা উচিত। কারণ নীতি বা আদর্শের পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু বন্ধুরা সাময়িক ভাবে অযৌক্তিক মনোভাব দ্বারা চালিত হলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সম্ভব, এক সময়ে না এক সময়ে তারা যুক্তিপূর্ণ আচরণ করতে পারে। সুবিধাবাদ, তোষণনীতি, স্বার্থসন্ধানী কর্ম্মাদর্শ, শক্তিদ্বন্দ্বের রাজনীতি—এ সবই আমাদের আশার সমাধি রচনা করে।" পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কার্য্যকালে আদর্শ ভুলে যায়। তাই তাদের বুদ্ধির বিভ্রান্তি ঘটে, তারা প্রচারকবলিত হয়ে পড়ে।

বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা অত্যন্ত তালগোল-পাকানো। ১৯৩৭ সালে নিউ ইয়র্কের একটি প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমি এক সন্ধ্যা অতিবাহিত করেছিলাম। তারা সবাই বেশ বুদ্ধিমান। সকলেরই সংবাদপত্রপাঠের অভ্যাস ছিলো। সম্মিলিত নিরাপত্তা সম্পর্কে সোভিয়েট কমিশার ম্যাক্সিম্ লিট্‌ভিনভের বাগ্মিতাপূর্ণ যুক্তিগুলি তারা পড়েছিলো এবং সম্মিলিত নিরাপত্তার পরিকল্পনা তারা সমর্থন করতো। প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের আপোষকামী বক্তৃতাগুলি তা'রা পড়েছিলো। যুদ্ধসজ্জার দিক থেকে

অপ্রস্তুত, অনন্যশান্তিপ্রয়াসী ব্রিটেন কেন যুদ্ধ এড়াতে চায় তারা তা সহজেই বুঝতে পেরেছিলো। তারা হিট্‌লারের বক্তৃতাগুলিও পড়েছিলো। জার্ম্মানীর বেঁচেবর্ত্তে থাকবার মতো জায়গার ও মালরপ্তানীর বাজারের অভাব এবং ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্ম্মাণীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে—হিটলারের এই যুক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য আছে বলে তারা মনে করতো।

বৈদেশিক ও স্বদেশীয় প্রচারপ্রচারণার প্রতি আধুনিক মস্তিষ্কের আকৃষ্ট হবার ঝোঁক রাজনীতির একটি প্রধান সমস্যা। রচনা ও রটনার ফলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে লোকের বিহ্বলতার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপর পক্ষে, একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সমস্ত সংবাদ ও মন্তব্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় লোকে ক্রমেই চূড়ান্ত রকমের গ্রহিষ্ণু ও বশম্বদ হয়ে পড়ে।

স্বৈরাচারী কিম্বা গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের ধরণ যাই হোক, গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধজয়ের জন্যে ও লোকদের যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্যে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। অস্ত্রের কারখানা-গুলিতে ক্রমাগত ইস্পাত ও লোহার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হতে থাকে। আরেক প্রকার অস্ত্রের কারখানা আছে যেখানে ইতিহাসকে পিটিয়ে তরবারীতে পরিণত করা হয়। এই পেটাইয়ের প্রক্রিয়ায় তারা ইতিহাসকে দুমড়ে মুচড়ে তছনছ করে ফেলে। ঐ একই রাজনৈতিক ধাতব প্রক্রিয়ার দ্বারা তথ্যাবলীকে বিকৃত করা হয়। ফলে শেষ পর্য্যন্ত মনও বিকৃত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্ত্তী শান্তি এই অশুভ বস্তুগুলিকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রণ বিশ্বের পক্ষে একটি ক্রমবর্দ্ধমান বিপদ স্বরূপ। একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রগুলি স্থূল পদ্ধতির সাহায্যে এই নিয়ন্ত্রণ সাধন করে। কিন্তু সমস্ত দেশেই সত্যকে বিকৃত ও বিলুপ্ত করবার প্রবল ও আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে।

১৯৪০-এর ২রা জানুয়ারী মার্শাল হার্ম্মাণ গোয়েরিং বললেন, ইংলণ্ডই নাকি যুদ্ধ চেয়েছিলো! তিনি ঘোষণা করলেন, "জার্ম্মাণ বৃহত্তর জার্ম্মানীর স্বাধীনতার জন্যে এক কঠিন যুদ্ধে নিয়োজিত।" নাৎসী দলের ১৯৪০ সালের দিনপঞ্জীতে জোরের সহিত বলা হলো, পোল্যাণ্ডই নাকি প্রথম আক্রমণের অপরাধে অপরাধী। পুস্তকটিতে আরও মিথ্যে বানিয়ে বলা হলো, "অসংখ্য সীমান্ত-আক্রমণে পোল্যাণ্ড কর্ত্তৃক প্রযুক্ত বলের প্রত্যুত্তরে বল প্রয়োগ করতে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হচ্ছে।"

১৯৪০-এর ১লা জানুয়ারী তারিখে হিটলারের নিজস্ব দৈনিক *Voelkischer Beolachter* নাৎসিবাদের সুবিধা সমূহের এক ফিরিস্তি দাখিল করলো—শ্রমিকের অধিকার, মূল্যনিয়ন্ত্রণ, প্রসূতি-কল্যাণ, স্বাস্থ্যের জন্যে বিধিব্যবস্থা, শিশুবীমা, কারখানা সমূহের জন্যে খেলাধূলার ব্যবস্থা, শক্তির উদ্বোধক আনন্দভ্রমণ (Strength Through Joy Tours), জার্ম্মাণ শ্রমিকদের জন্যে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত কনসার্টের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। কাগজটির মতে এরই জন্যে যুদ্ধ বেধেছে; "ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরা আশঙ্কা করতে লাগলো, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তাদের শ্রমিকরাও অনুরূপ অধিকার দাবী ক'রে বসবে। এটা তাদের পক্ষে অভাবিত। এই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার প্রয়োজন দাঁড়িয়েছিলো।"

এটা অর্থহীন প্রলাপ বই কিছু নয়। কিন্তু সমস্ত একনায়কত্ব-শাসিত রাষ্ট্রেরই অপর দেশের প্রতি ভিত্তিহীন উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আরোপ করার অভ্যাস আছে। বিদেশে শত্রু আবিষ্কার করে স্বদেশে বন্ধুলাভের চেষ্টা করা তাঁদের কার্য্যরীতির একটা অংশ।

Voelkischer Beobachter সুর ওঠাতেই সমস্ত নাৎসি পত্রিকা ও রেডিওর ভাষ্যকারগণ একযোগে তাতে পোঁ ধরলে। ১৯৪০-এর ২রা জানুয়ারী *Beobachter* শিরোনামায় লিখ্‌লে, "ব্রিটিশ

আক্রমণের বিভীষিকা থেকে ইউরোপের মুক্তি।" ১৯৪০-এর ৪ঠা জানুয়ারী কাগজটি "আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ" বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলে; ১৯৪০, ৭ই জানুয়ারী তারিখে লিখ্‌লে, "জার্ম্মানীর ঐক্য ধ্বংস করাই হ'লো ফ্রান্সের সহস্র বৎসরের লক্ষ্য।" তার পরের দিন কাগজটিতে বের হ'লো: "জার্ম্মানীতে বেকার সমস্যা নাই।" তারও পরের দিন প্রথম পৃষ্ঠায় বৃহত্তম শিরোনামায় ছাপা হ'লো: "পোল নরঘাতক দল কর্তৃক সাংঘাতিক ভাবে আহত জার্ম্মান বৈমানিকগণ নির্য্যাতিত।" সেই দিনেরই কাগজে অন্যত্র প্রকাশিত হ'লো: "নির্ব্বিবেক ধনতন্ত্রের দুর্গ ইংলণ্ড।"

হিট্‌লার জার্ম্মান জাতির সমর্থনলাভের আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো। জার্ম্মান জনগণ কেবল তার মিথ্যা স্তোকবাক্যই শুন্‌লে। শ্রমিকদের সে "সমাজতন্ত্রবাদের" প্রলোভন দেখালে; সমগ্র জাতির দেহ ও মনে সে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি বিদ্বেষবিষ সঞ্চার করলে। ফ্রান্সকে ব্রিটিশ-বিরোধী আর ব্রিটেনকে ফরাসী-বিরোধী প্রচার দ্বারা সে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে। আর আমেরিকাকে উপহার দিলে ইউরোপ-বিরোধী প্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ব্যাপার থেকে তফাৎ থাক্‌বার কানমন্ত্র।

যতো পাকা বদ্‌মায়েস, ততো তার অজুহাতের বহর। তবে কেউ না কেউ তাকে বিশ্বাস করে, এই হচ্ছে মুস্কিল।

বহু বামপন্থী ফরাসী হিট্‌লারের কথায় বিশ্বাস করলো। ফরাসী কম্যুনিষ্টরা বিশ্বাস করলো মস্কোর কথায়। মস্কো থেকে বর্ত্তমান যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে প্রচার চল্‌ছিলো।

ফ্রান্সকে প্রচার-কবলিত ক'রে, সমগ্র ইউরোপকে হুমকি দেখিয়ে নাৎসিরা তাদের সৈন্যবল চালু করলে এবং একে একে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের ওপর আঘাত হান্‌লে। ১৯৪০, ২১শে মে যুদ্ধযন্ত্র ইংলিশ চ্যানেলের অভিমুখে সবেগে অগ্রসর হচ্ছিল।

ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনী আক্রমনের ওপর প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করলে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করবার জন্যে অনুরোধ করলেন এবং ঐক্যের আবেদন জানালেন। রাণী উইলহেলমিনা হল্যাণ্ড থেকে ইংলণ্ডে পালিয়ে বাঁচলেন।

১২ মে ১৯৪০ কম্যুনিষ্ট মুখপত্র *Sunday Worker* এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখ্‌লেঃ "এই যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়। দুই বিরোধী দুর্ব্বিত্তদল—একদিকে ইংরাজ-ফরাসী, অন্যদিকে হিট্‌লার-পন্থীদের মধ্যে এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধ থেকে আমাদের তফাৎ থাক্‌তে হবে।" ২২শে মে তারিখে নিউ ইয়র্কের টাইম্‌স্ স্কোয়্যারে এক যুদ্ধ বিরোধী জনতা সম্মিলিত হয়। কম্যুনিষ্ট দলের প্লাকার্ডগুলির ওপর অন্যান্য আওয়াজের ভেতর এই কয়টি আওয়াজ ছিল—"রুজভেল্ট, ডিউয়ি ও হুভার যুদ্ধের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে", "লা গার্ডিয়া, ওয়াল ষ্ট্রিটের হুকুম তামিল করার অভ্যাস ছাড়ো"; "ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন"; এবং "ইয়াঙ্করা যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে না।"

অপর পক্ষে, সিনেটর জেম্‌স্ এফ্. বার্ণস কর্ণেল চার্লস্ এ লিণ্ডবার্গের পরাজিতের মনোভাবসূচক স্বাতন্ত্র্যকামিতার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করলেন। ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি বল্‌লেনঃ "হিট্‌লার কেবল শক্তির মূল্য বোঝে। আমরা যখন উৎপাদন শিল্পের চাকা ঘোরাতে আরম্ভ করবো, এক লক্ষ লোককে কাজে ডেকে আন্‌বো, অমনি ওর টনক নড়ে উঠ্‌বে।" ফ্লোরিডার সিনেটের পেপার ইউরোপের গণতন্ত্রগুলির নিকট আমেরিকান বিমান বিক্রির পরামর্শ দিলেন।

আমেরিকা কেবল তর্ক করেই চল্‌লো। এদিকে ইউরোপ হিট্‌লারের সৈন্যদলের পদভারে, তার ছোঁ-মারা বিমানসমূহের গর্জ্জনে ও বেগবান ট্যাঙ্কের বজ্রনির্ঘোষে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

তারপর ঘটলো ডানকার্কের বিপর্য্যয়। ২৮শে মে বেল্‌জিয়ামের রাজা লিওনোল্ডের সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। ব্রিটিশ ও ফরাসী বাহিনী তাতে গভীর বিপদের মুখে পড়লো। উইনষ্টন চার্চ্চিল পার্লিয়ামেণ্টকে জানালেন, "কঠোর ও বিপর্য্যয়মূলক বার্ত্তার জন্যে সদস্যদের প্রস্তুত থাকতে হবে।" ব্রিটেনের গভীর বিপদের মুহূর্ত্তে তিনি প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। সাড়ে তিন লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য যাতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করতে পারে তার পথ সুগম করবার জন্যে ফরাসী ও ইংরাজ সৈন্যের একটি মিলিত বাহিনী সমুদ্রের দিকে পিঠ দিয়ে ডানকার্কের অভ্যন্তরে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়ালো। প্রত্যাবর্ত্তনকামী সৈন্যরা যখন ডানকার্কের সমুদ্রতীরে অপেক্ষমান, জার্ম্মান বিমানবাহিনী তাদের ওপর মেশিনগানের গুলী চালাতে লাগলো। সৈন্যদের উদ্ধার ক'রে নেবার জন্যে ব্রিটেন থেকে জাহাজ আসতে লাগালো—ডেষ্ট্রয়ার, কাটার থেকে আরম্ভ ক'রে টেম্‌স্‌ নদীর প্রমোদবিহারের জন্যে ব্যবহৃত ষ্টিমার জনসাধারণের ব্যক্তিগত ব্যবহারের নৌকা, তরুণ স্বেচ্ছাসৈন্যচালিত বাচখেলার নৌকা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারের জলযান। সেসব ডানকার্কের অভিমুখে যতই এগিয়ে আস্‌তে লাগলো, জার্ম্মান বিমান বাহিনী ততোই তাদের ওপর খুব নিচু থেকে মেসিনগানের গুলী ও বোমা ছুঁড়তে লাগলো। সৈন্যরা ছোটোখাটো নৌকাগুলিতে উঠ্‌বার জন্যে গলাজল পর্য্যন্ত হেঁটে হেঁটে চল্‌লো। আহত সৈনিকদের ব'য়ে নিয়ে জাহাজে তোলা হ'তে লাগলো। জাহাজগুলি অতিরিক্ত বোঝার ভারে কাৎ. হ'য়ে ব্রিটিশ উপকূলের অভিমুখে ছুটতে লাগলো। আবার জার্ম্মান বিমান তাদের আক্রমণ করলো। ১লা জুন তারিখের এক প্রাতঃকালের মধ্যেই ছয়টি জাহাজ—তাদের কয়েকটিতে সৈন্য বোঝাই ছিলো—বোমাবিধ্বস্ত হ'য়ে ডুবে গেলো। সৈন্যরা আর সব কিছু পরিত্যাগ করলেও তাদের ইস্পাত নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ ত্যাগ

করে নি। মাইন ও টর্পেডোতে সমুদ্র কণ্টকাকীর্ণ। আকাশ থেকে মেশিন-গানের গুলী ছোঁড়বার সময় হাসপাতাল-জাহাজগুলিকেও রেয়াৎ করা হলো না। ব্রিটিশ বন্দরসমূহে সেসব জাহাজ যখন গিয়ে পোঁছলো সৈন্যদের অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। কদর্য্য ময়লা, রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা শতছিন্ন পোষাক পরিহিত কতিপয় সৈন্যকে যখন সিঁড়ি দিয়ে জাহাজ থেকে তীরে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন অশ্রুবিগলিত ক্রন্দন ও উল্লাস-চীৎকারের সে এক অদ্ভুত মাখামাখি। ইংলণ্ড বাহবা দিলো। আমেরিকা বাহবা দিলো। এভাবে জাহাজগুলি কয়েকবারই পারাপার হ'তে লাগলো। যতোবারই জাহাজ সৈন্য নিয়ে নিরাপদে স্বদেশের বন্দরে এসে নোঙর করছে, ততোবারই প্রবল কোলাহলের সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্ধারপ্রাপ্তের সংখ্যা গণনা করা হ'লো। এই উদ্ধারপ্রাপ্তরাই ব্রিটেনের একমাত্র সৈন্য বাহিনী, হিটলারের আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়। অথচ এদের অস্ত্রশস্ত্র সব বিনষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো।

৪ঠা জুন চার্চ্চিল উৎসাহপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ কমন্স সভার এক অধিবেশনে ঘোষণা করলেন, "সহস্র জাহাজ তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্যকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছে।" সেই সঙ্গে চার্চ্চিল বল্‌তে ভুল্‌লেন না যে, এটা জয় নয়, কীর্ত্তি মাত্র। ব্রিটেনের আসন্ন ভাগ্য কী তা তিনি জান্‌তেন। সে ভাগ্য—প্রাণরক্ষার্থে ব্রিটেনের মৃত্যুপণ সংগ্রাম।

ইংলণ্ড তখন একাকী। ৪ঠা জুন্‌ চার্চ্চিল কিন্তু কমন্স সভাকে ও পৃথিবীকে আশ্বস্ত করে বল্‌লেন, "আমরা দম্‌বো না।" "আমরা দম্‌বো না, পিছু হট্‌বো না। শেষ পর্য্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। আমরা ফ্রান্সের জমিতে, সমুদ্রে ও মহাসমুদ্রে যুদ্ধ করবো। ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সহিত আমরা অন্তরীক্ষে যুদ্ধ চালাবো। ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক, আমরা যে কোনো উপায়ে আমাদের

জন্মভূমিকে রক্ষা করবো। আমরা উপকূল ভূমিতে, বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রে, পথে ও প্রান্তরে, পাহাড়ের চূড়ায় সংগ্রাম করবো। আমরা কদাপি আত্মসমর্পণ করবো না। এমন কি যদি এমনও হয় যে এই দ্বীপ কিম্বা তার একটি বৃহৎ অংশ পরাজিত ও অনশনকবলিত হয়েছে—অবশ্য আমি মুহূর্ত্তের জন্যেও এমন সম্ভাবনায় বিশ্বাস করি না—তা হ'লে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী কর্ত্তৃক সজ্জিত ও সুরক্ষিত আমাদের সমুদ্রপারের সাম্রাজ্যবাসী মিত্ররা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। যে পর্য্যন্ত না ভগবানের নির্দ্দিষ্ট নিরূপিত সময়ে নয়া বিশ্ব আমেরিকা তার সমস্ত শক্তি ও সামরিক বল নিয়ে পুরাতন পৃথিবীর উদ্ধার ও মুক্তির জন্যে অগ্রসর হয়ে আস্‌ছে, ততোদিন তারা এই যুদ্ধ করবে।”

চার্চ্চিলের মানসিক গঠন ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর আশাবাদিতার উৎস। যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধে যোগ দেবে এই বিশ্বাস সেই আশাবাদিতাকে আরও সুদৃঢ় করেছিলো।

ব্রিটেনের ভাগ্যের জোয়ার-ভাটায় ডানকার্ক সর্ব্বরিক্ত ভাঁটি। কিন্তু এতোকাল অব্যবহৃত দেশের ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তার বাঁধ খুলে দিয়ে এই ডানকার্কই আবার জয়ের গোড়া পত্তন করলে। ডানকার্কের বিপর্য্যয়ের পর সপ্তাহের পর সপ্তাহ ব্রিটিশ শ্রমিক নরনারী তাদের মেশিনে অবিশ্রান্ত কাজ করেছে। যে পর্য্যন্ত না অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তারা নেতিয়ে পড়েছে, ততোক্ষণ তারা মেশিন ছেড়ে উঠে আসেনি। মেশিনে কাজ করতে করতেই তারা দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাধা করেছে। সমস্ত দিন তা'রা কাজ করেছে, রাত্রিতে বেঞ্চির পাশে মেঝেতে শুয়ে কাটিয়েছে, তার পরই আবার আরও বেশি গুলী গোলা বন্দুক তৈরী করবার জন্যে ঘুম ছেড়ে তড়াক্ করে লাফ দিয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকবার অপরিহার্য্য তাগিদে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের কঠিন পরিশ্রম করবার দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখছি, একটি সমগ্র জাতি বাঁচবার দুর্নিবার আগ্রহে অমানুষিক কঠিন পরিশ্রমে নিয়োজিত।

চ্যানেল ও চার্চ্চিলই প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডকে বাঁচালো। এই দিক দিয়ে রাজকীয় বিমানবাহিনীর কৃতিত্বও কম নয়। চার্চ্চিলের বক্তৃতা জনসাধারণকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌লো। পূর্ব্বের চাইতে গভর্ণমেণ্ট আজকাল অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী, তাই বর্ত্তমান যুগ হচ্ছে "শাঁসালো মানুষের" (big men) যুগ। এই শাঁসালো লোকগুলির প্রচণ্ড ক্ষমতা, জনমনের ওপর তাদের প্রভাবও অপরিসীম। একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রের নায়ক অপরিসীম শক্তির ধারক, তাই তার অপরিসীম প্রভাব। গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রে ঠিক এর উল্টো। রাষ্ট্রনায়ক প্রভাবশালী বলেই সেখানে তার ক্ষমতা, এবং এই প্রভাবকে দীর্ঘস্থায়ী করবার প্রয়োজনেই সে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ব্রিটিশ জনগণের চরিত্রে যা কিছু মহৎ ও শ্রদ্ধেয় তাকে উদ্বোধিত করে তুল্‌তে চার্চ্চিল কম সাহায্য করেন নি।

ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিরা নৈরাশ্য প্রদর্শন করছিলো। কর্ণেল চার্লস এ লিণ্ডবার্গ ইংলণ্ড সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি যে এজন্যে দুঃখিত তা তার ভাবলক্ষণে বিশেষ মনে হয়নি। ভয়বিহ্বল বীর মার্শাল পেতাঁ ফ্রান্স কিম্বা ইংলণ্ডের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। কিন্তু চার্চ্চিল, রুজভেল্ট, চার্লস ছ গল পেরেছিলেন এবং এই ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে ছিলো অগণিত মহৎ হৃদয়বান সাধারণ মানুষের দল।

ডানকার্কের চার বৎসর পর ১৯৪৪-এর ৬ই জুন, ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যবাহিনী সহ ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করলো। ডানকার্কের পাঁচ বৎসর পর এলো বিজয় দিবস।—লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশুর জীবনে রক্তাক্ত, ক্ষুধাদীর্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট পাঁচটি বৎসর। মানুষ

অদ্ভুত জীব—তার সহনশক্তি অপরিসীম। আরও ভালোভাবে বেঁচে থাক্‌বার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে।

অন্ততঃ পক্ষে, পৃথিবী এখন থেকে যুদ্ধমুক্ত হবে এ আশা মানুষ করতে পারে। যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছি আমি, তাই প্রতিদিনের যুদ্ধ বুলেটিন পড়লেই আমার মনে হতো বুলেটের আঘাতে অনাবৃতক্ষতমুখ মনুষ্যমাংসের কথা; দগ্ধ বিমান ও ট্যাঙ্কের আগুনে ঝল্‌সানো কালো হয়ে আসা মনুষ্যদেহের কথা। যুদ্ধ ইস্তাহারে যখন বলা হতো, 'আমাদের মাত্র দুটি বিমান ফিরে আসতে পারে নি', আমি তখন মনশ্চক্ষে দেখতাম বারোটি মৃত তরুণকে। তাদের শোকার্ত্ত পিতামাতা, তাদের পরিবারপরিজন এবং অগণিত বন্ধু—যারা মৃত যুবকদের সব সময়ই স্মরণ করবে এবং স্মরণ করে হৃদয়ে হিমশীতল শূন্যতা অনুভব করবে—তাদের ছবিও সেই সঙ্গে আমার মনে ভেসে উঠতো। এতো দুঃখ, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর মূল্যে যদি যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয় তা হলে সেই যুদ্ধের মূলে একটি মহৎ ও বিরাট উদ্দেশ্য থাকা উচিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সার্থক করে তোলাই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তাকে একটি আন্তর্জ্জাতিক গৃহযুদ্ধে পরিণত করা উচিত ছিলো—সে যুদ্ধ চলতো দাসত্বের বিরুদ্ধে; সকলের প্রতি স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতিসহ এক অখণ্ড পৃথিবী প্রতিষ্ঠাই হতো সে যুদ্ধের লক্ষ্য। এক রাষ্ট্রের ভূভাগ কিম্বা তৈলক্ষেত্র কিম্বা ব্যবসার বাজার অপর রাষ্ট্রকে দেবার উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ, তা একটি বিরাট ও নির্ব্বোধ পাপ।

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌমত্বকে একীভূত করবার প্রস্তাব করে উনস্টন চার্চ্চিল যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাঁর আর কোনো বিবৃতি ইতিহাসকারের দৃষ্টিতে এই বিবৃতিটির ন্যায় মূল্যবান নয়। ১৯৪০ সালের ১৬ই জুন চার্চ্চিল এই প্রস্তাব করেছিলেন। ফ্রান্সের তখন পতনের পূর্ব্বাবস্থা। চার্চ্চিল ফ্রান্সকে ও তাঁর স্বদেশকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, "ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ও ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করছে যে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন অতঃপর আর দুই রাষ্ট্র থাকবে না, এক অখণ্ড ফরাসী ব্রিটিশ ইউনিয়নে পরিণত হবে। * * * এখন থেকে ফ্রান্সের প্রত্যেক নাগরিক গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিকত্ব লাভ করবে; প্রতিটি ব্রিটিশ প্রজাও তদনুরূপ ভাবে ফ্রান্সের নাগরিক হবে।"

চার্চ্চিল ঘোরতর-জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী, তা সত্ত্বেও তাঁর আত্মরক্ষার সংস্কার সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাঁকে আন্তর্জ্জাতিকতা ও জাতীয় সার্ব্বভৌমত্বের বিলুপ্তির পথে নিয়ে গেলো। চার্চ্চিল বুঝেছিলেন যে, স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌমত্বের অধিকার বিলুপ্তিই নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

কয়েক বৎসর পর, ইউরোপীয় যুদ্ধজয়ের কিছু পূর্ব্বে, চার্চ্চিলকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ফ্রান্সের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের মিলিত হবার যে প্রস্তাব তাঁর ছিল তা এখনও বলবৎ আছে কিনা। চার্চ্চিল বলেন, না। পরাজয় এড়াবার সর্ব্বশেষ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকালে যা তিনি করতে প্রস্তুত ছিলেন, জয়লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনার মুহূর্ত্তে তিনি তা করতে রাজী নন। ১৯৪০ সালে অতিমাত্র বাস্তব কারণে

—বিপর্য্যয় রোধ করবার জন্যে—চার্চিল আদর্শবাদী সেজেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৪এর মধ্যেই তাঁর সে আদর্শবাদ কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলো। যখন অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, চার্চিল ভালোত্ব দেখিয়েছিলেন মাত্র তখুনি।

যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের মনে আদর্শবাদ-প্রণোদিত এক কল্যাণময় শান্তির আশা জাগিয়ে তোলে। তারপর সেই একই যুদ্ধ থেকে সৃষ্টি হয় বিষ—যে বিষ আদর্শবাদকে হত্যা করবার জন্যে আক্রমণে তৎপর হয়ে ওঠে। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, দুঃখসহনের মধ্যে দিয়ে প্রগতি আশা করা বাতুলতা। দুঃখ যদি জ্ঞান জন্মাতো, তা হলে পৃথিবী প্রচুর ভূয়োজ্ঞানের আকর হয়ে উঠতো; পৃথিবীতে দুঃখই আর থাকতো না।

ফ্রান্সকে রক্ষা করা চার্চিলের সাধ্যের অতীত ছিলো। দশ লক্ষ নবীন ও সুসজ্জিত ব্রিটিশ কিম্বা আমেরিকান সৈন্য যদি ১৯৪০ এর জুনে নর্ম্যাণ্ডি উপকূলে অবতরণ করতো, কিম্বা ১৯১৪ সনের আগষ্টে জারের আক্রমণের অনুকরণে রুশরা যদি এবারও পূর্ব্ব রণাঙ্গনে একই কালে আক্রমণ চালাতো, তাহলে ফ্রান্সকে বাঁচানো যেতো। সেক্ষেত্রে পরবর্ত্তীকালের এতো আজস্র রক্তক্ষয়েরও প্রয়োজন হতো, না। কিন্তু তা হতে পারে নি। উল্টো, নাৎসী বাহিনী অনিবার্য্যভাবে এগিয়ে চললো। প্যারিস বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলো। ১০ই জুন ইটালী যুদ্ধে যোগ দিলে।

মুসোলিনির জামাতা ইটালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট সিয়ানো ইটালীকে যুদ্ধের বাইরে রাখতে চেস্টা করেছিলেন। এই অপরাধে পরে নাৎসীরা তাঁকে ফাঁসী দেয়। ১৯৪০-এর মে মাসে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইটালীকে যুদ্ধে যোগদান করতে বিরত হবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে মুসোলিনির নিকট তিন তিনটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠান। ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪০ তারিখে মহামান্য পোপ দ্বাদশতম পায়াস যুদ্ধে

যোগদানের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে মুসোলিনিকে একটি পত্র লেখেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা কিম্বা যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ কোনোটাতেই কিছু হলো না; কারণ মুসোলিনি লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলো। মুসোলিনির নিশ্চিত ধারণা হয়েছিলো যে শীঘ্রই ফ্রান্স এবং কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ব্রিটেন আত্মসমর্পণ করবে। আর তা' হলেই ইটালী সস্তা জয়লাভের সুমিষ্ট ফসল কুড়োতে পারবে। কিন্তু কী ভুলই সে করেছিলো! ১৯৪০ এ জয়লাভ তো তার ভাগ্যে ঘটলোই না; উল্টো, ১৯৪৫-এ পরাজয় ও মৃত্যু তার কপালে লেখা ছিল।

গভর্ণমেণ্টের ভুলই জনগণের অধিকাংশ দুঃখদুর্দ্দশার জন্যে দায়ী।

১৯৪০ ফেব্রুয়ারীতে মুসোলিনি ও হিট্‌লার ব্রেনার গিরিবর্ত্মে মিলিত হয় এবং ইটালীকে যুদ্ধে টেনে আনবার সিদ্ধান্ত করে। কর্ণেল জেনারেল গুস্তাভ জোড্‌ল্‌—যিনি দশবৎসর জার্ম্মান সেনাপতি-মণ্ডলীর মস্তিষ্কস্বরূপ ছিলেন—১৯৪৫এর জুনে ধরা পড়বার পর তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, ইটালী যুদ্ধে যোগদান করুক এটা জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিলো না। ফিল্ড মার্শাল কাইটেলও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন। বস্তুতঃ, ইটালী যদি যুদ্ধে যোগ না দিয়ে অথচ বন্ধুভাবাপন্ন থেকে জার্ম্মানীতে কেবল মাল পাঠাতো তা হলে হিট্‌লারের পক্ষে তা একটা মস্ত বড়ো সহায়তার কারণ হতো। কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ইটালী শীঘ্রই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। সামরিক তৎপরতা অপেক্ষাও রাজনৈতিক লাভালাভের হিসাব হিট্‌লারের চিন্তায় বড়ো হয়ে দেখা দিতো। হিটলার নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছিলো যে যথাযথ মুহূর্ত্তে ইটালীর যুদ্ধপ্রবেশ ফ্রান্সের আকস্মিক পতনের পক্ষে সহায়ক হবে। অধিকন্তু তার আশা ছিলো যে এতে করে ইংলণ্ডকে দমিয়ে দেওয়া যাবে এবং তার পতনকে ত্বরান্বিত করে তোলা যাবে। ব্রিটেনের প্রতিরোধের সঙ্কল্পকে গুঁড়িয়ে দেবার

সম্ভাবনার ওপর হিট্‌লার বড়ো বেশি নির্ভর করেছিলো। সে ভেবেছিলো, ইটালীকে যুদ্ধে নামাতে পারলেই ইংলণ্ডের প্রতি চরম নিষ্ঠুর আঘাত হানা হবে।

১৯৪০-এ ফ্রান্সের পতন ঘটে, কিন্তু সে পতনের প্রক্রিয়া স্থরু হয় ১৯১৪ সালে। অপর্য্যাপ্ত শোণিত ক্ষরণে উর্ব্বর ফ্ল্যাণ্ডার্সের আফিংয়ের ক্ষেত থেকে উদ্ভূত হো'ল অগণিত শান্তিবাদীর দল। জয়ের মরীচিকা উবে গেলো। আমেরিকা ফ্রান্সের নিরাপত্তা স্থরক্ষিত করতে অস্বীকৃতি জানালো। ফরাসীদের মধ্যে কারু কারু মতে, ব্রিটেন জার্ম্মান-ঘেঁসা হ'য়ে উঠেছিলো; অন্ততঃ, তারা বল্‌তে লাগলো যে, ক্ষতিপূরণ ও রুর-দখল সম্পর্কিত ব্যাপারগুলিতে ইংরাজ রাষ্ট্রনায়কগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর পক্ষাবলম্বন করছিলো। ১৯৪০-এর ২১শে জুন হিট্‌লারের সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করতে পেতাঁ গভর্ণমেণ্টের আগ্রহের পেছনে ইংলণ্ডের প্রতি এই অবিশ্বাসের মনোভাব অনেকখানি পোষকতা করেছিলো। ফরাসীদের মধ্যে একদল ভেবেছিলো এবং আরেক দল প্রত্যাশা করেছিলো যে ব্রিটেন অচিরেই আত্মসমর্পণ করবে। তা-ই যদি হয় তো তাড়াতাড়ি কেন আত্মসমর্পণ করি না, এবং এই ক্ষিপ্রতার জন্যে সম্ভব হ'লে কিছু পুরস্কারও কেন অর্জ্জন করি না?

ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহনক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলো। ১৯৩৯-এর ২৩শে আগষ্ট তারিখে নাৎসী ও সোভিয়েট পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি হ'য়েছিলো তা অনেকটা প্রলয়-নিনাদের মতো; কারণ রুশিয়া ও আমেরিকা যদি নিরপেক্ষ থাকে এবং ব্রিটেন অপ্রস্তুত থাকে, তা হ'লে ফ্রান্স জয়লাভ করবে কি ক'রে? এই যখন অবস্থা, ফ্রান্সবাসীরা ভাবলো, তখন যে-জার্ম্মানী আয়তনের দিক দিয়ে বড়ো, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী ও সামরিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত সুসজ্জিত, তার সঙ্গে আদৌ যুদ্ধ ক'রে কি লাভ? ফ্রান্সের পতনের মূল কারণ এখানেই।

জেনারেল চার্লস দ্য গল্ জানতেন যে তাঁর দেশবাসী পৃথিবীর অবশিষ্টাংশের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলো; ১৯৪০-এর ১৮ই জুন লণ্ডন থেকে যে বিখ্যাত বেতার-বক্তৃতা তিনি দেন তাতে এই বিষয়টির উল্লেখ ছিলো। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, "ফ্রান্স একা নয়, একা নয়, একা নয়।" ফরাসী ট্রাজিডির মনস্তাত্ত্বিক মূল এখানেই নিহিত। দ্য গল বলেছিলেন, "ফ্রান্সের নিজের বিরাট সাম্রাজ্য রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গেও সম্মিলিত হ'য়ে যেতে পারে—সমুদ্রের চাবিকাঠিগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাতে এবং সেখান থেকে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সও যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট শিল্পোকরণকে পুরোপূরি কাজে লাগাতে পারে। * * * বর্ত্তমান যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীতে এমন যথেষ্ট সঙ্গতি আছে যার বলে আমরা একদিন না একদিন শত্রুকে গুড়িয়ে দিতে পারবো। যান্ত্রিক শক্তির নিকট আজ আমরা পরাজিত; কিন্তু ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে আমরা জয়লাভ করবোই। পৃথিবীর ভাগ্য এর ওপর নির্ভর করছে।"

যখন রুশিয়া ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধরত হ'লো এবং ব্রিটেন তার অপরিসীম বিমান ক্ষমতার সক্রিয় পরিচয় দিলো, ফরাসীদের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হ'লো এবং হিট্‌লারের বিরুদ্ধে গোপন প্রতিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি পেলো।

ফ্রান্সের বাইরের সমর্থন যেমন দুর্ব্বল ছিলো, তেমনি তার ভেতরকার শক্তিও ছিলো অপ্রতুল। সোশ্যালিষ্ট পার্টির একটি শক্তিশালী অংশ ছিলো শান্তিবাদী, তারা ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তি বলে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভক্তীকরণকে বাহবা জানিয়েছিলো। অপরপক্ষে, বহু শ্রমিকের মনে এই নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিলো যে ফ্রান্সের বুর্জোয়া নেতারা দুর্নীতি-পরায়ণ এবং ফ্যাসিষ্ট-ঘেঁসা—তারা চেকোশ্লোভাকিয়া ও স্পেনকে বিকিয়ে দিয়ে ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতকতা করেছিলো। অগণিত ফ্রান্সবাসী তাদের রাষ্ট্রনেতা ও সেনাপতিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সন্দেহ পোষণ করতো। জাতি সশস্ত্র বাহিনীর গর্ব্ব করতো, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানতো, সৈন্য বাহিনীর যান্ত্রিক সাজসরঞ্জাম কতো পুরোনোই না ছিলো। জার্ম্মান বিমানবাহিনীকে প্রতিরোধ করবার মতো ভালো বিমান ফ্রান্সের হাতে খুব কমই ছিলো। অথচ ফরাসী জাতীয় রাজস্বতহবিলে অকেজো সোনা কিছু অল্প ছিলো না। এই সোনা দিয়ে আমেরিকা থেকে অনায়াসেই বিমান কেনা যেতে পারতো। অর্থবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিদপ্তর টাকা দিতে অস্বীকার করে। পর্য্যবেক্ষকগণ সন্দেহ করেন যে ফরাসী শিল্পপতিরা নিজেদের জন্যে অর্ডারগুলি চেয়েছিলো। যুদ্ধ সুরু হতে বৈমানিকগণ—এদের দেশপ্রেমের আন্তরিকতা দেখলে রীতিমতো কষ্ট হয়—ভাঙ্গাচোরা বিমান নিয়ে যুদ্ধে এগিয়ে এলো। তাদের এই অভিযান যে আত্মহত্যার সমতুল্য, তারা তা জানতো। তদানীন্তন কর্ণেল, চার্লস্ দ্য গল্ ট্যাঙ্ক তৈরীর জন্যে বার বার বলেছিলেন। কিন্তু ১৯৪২ এর মার্চ্চে অনুষ্ঠিত রিয়োম বিচার-কালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ারের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সকয় স্পেনস্থিত গুয়াডালাজারা নামক স্থানে ইতালীয় যান্ত্রিক বাহিনী যে বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো তার থেকে ফরাসী যন্ত্রযুদ্ধ বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলো যে সাঁজোয়া গাড়ীর সাহায্যে যান্ত্রিক যুদ্ধর অচল।” ফরাসী সেনাপতিদের প্রধান ভরসা ছিলো ম্যাজিনো লাইন; ট্যাঙ্ক নয়। ঐ একই রিয়োম বিচারে যুদ্ধসূচনায় ফরাসী বিমান-সচিব গী ল্য চেম্বার কম্যুনিষ্টদের সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ফরাসী বিমান-কারখানায় উৎপাদন কার্য্যে বাধা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি বিমান উৎপাদনকারীদেরও বিমান-উৎপাদনের কার্য্যসূচীকে বিলম্বিত করার দায়ে দোষী করেন। সাক্ষীর মঞ্চ থেকে দালাদিয়ার ঘোষণা করেন যে,

বিমান উৎপাদনের কারখানাগুলিকে জাতীয়করণ করার অবিমৃষ্যকারিতা প্রমাণ করবার মতলবেই উৎপাদনকারীরা ঐরূপ নাশকতামূলক কার্য্যে প্রবৃদ্ধ হ'য়েছিলো। ফলে যা ঘটলো সেটাকে ১৯৪০-এর মার্চ্চ থেকে জুন মাস পর্য্যন্ত ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর গদীতে আসীন পল রেঁনো তাঁর স্মৃতিকথায় এইভাবে প্রকাশ করেছেন: "আমাদের ট্যাঙ্ক-বাহিনীর অভাব ছিলো ; বিমান-বাহিনীও আমাদের ছিলো না।"

এই সকল ঘটনা এবং এই ধরণের আরও সহস্রবিধ ঘটনা থেকে এইটেই প্রমাণ হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে অনেক বৎসর ধ'রে ফ্রান্স তিক্ত গৃহযুদ্ধে নিয়োজিত ছিলো। এই গৃহযুদ্ধ তাকে বিভক্ত, রিক্ত, পরাজিতের মনোভাবযুক্ত ক'রে তোলে।

নৌবাহিনীর সহায়তায় ফ্রান্স আফ্রিকা ও এশিয়ায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু পেতাঁ গণতন্ত্রবাদী কিম্বা ফ্যাসিবিরোধী কোনোটাই ছিলেন না। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার কোনো আন্তরিক প্রয়োজনই সেজন্যে তিনি বোধ করেন নি।

১৯৪২ সালে নববর্ষের প্রারম্ভকালীন বেতার বক্তৃতায় পেতাঁ বললেন, "আমার দেশের জন্যে আমি মার্ক্সবাদও চাই না, উদারপন্থী ধনতন্ত্রও চাই না।" তার মানে আমি ফ্যাসিবাদ চাই। নাৎসী-মনোভাবযুক্ত এইরূপ নেতা যে নাৎসীদের রুখতে পারেন না, সেকথা না বললেও চলে।

আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থা এবং বৈদেশিক সাহায্যের অপ্রতুলতার জন্যেই ফ্রান্সের পতন ঘটলো।

ফ্রান্সের পতনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম রূপ হিসাবে গণতন্ত্রের কতকগুলি মূলগত ত্রুটী উদ্‌ঘাটিত হলো। ফলে বহুলোকের এই ধারণা হলো যে ফরাসীদের আত্মসমর্পণ গণতন্ত্রের চরমমৃত্যুসূচক কোনো ঘটনা না হলেও গণতন্ত্রের মৃত্যুর সূচনা তো বটেই।

১৯৪০, ২২শে জুন তারিখে আমি শার্লটেসভিলে ভার্জ্জিনিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্স্টিট্যুট অব পাবলিক এফেয়ার্স-এর বাৎসরিক গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ফরাসী যুদ্ধবিরতির সংবাদ আমরা তখন সত্ত পেয়েছি। আমি মন্তব্য করি "গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রসমূহ এবং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের সমাধির ওপর পৃথিবীব্যাপী স্বস্তিকা উড্ডীন করতে এখনও ঢের দেরী। * * * যতোক্ষণ পর্য্যন্ত সব কয়টি গণতন্ত্রশাসিত দেশ বিজিত না হচ্ছে, ততোক্ষণ ফ্যাসিবাদ জয়ী হয়েছে, একথা বলা চলে না। ফ্যাসিবাদের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও আমেরিকার পরাজয় ঘটাতে হবে।"

এই নৈরাশ্যজনক সংবাদ সত্ত্বেও আমি আশা ছাড়ি নি।" জার্ম্মানী যদি ইংলণ্ডকে শীঘ্র পরাজিত করতে না পারে, তাহলে এই অধ্যায়ে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং পরিণামে তার থেকে মিত্রশক্তির জয় হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, এখন যদি জার্ম্মানী জয়লাভ করতে না পারে, তাহলে পরে আর সে জয়লাভ করতে পারবে না। অন্যপক্ষে, মিত্রশক্তি এখন জয়লাভ করতে না পারলেও পরে আমেরিকার সহায়তায় সে জয়ী হতে পারবে।"

শান্তির আদর্শগুলিকে আমি এইভাবে রূপ দিলাম। আমি বললাম, "গণতন্ত্র ত্রুটীমুক্ত নয়, কিন্তু আমার জানা যে কোনো একনায়কত্ব থেকে তা ভালো। কোনো একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রই তার জনগণকে স্বাধীনতা দেয় নি। পৃথিবীটা সাদা এবং কালো এইভাবে বিভক্ত নয়। সাদা মোটে নেইই, তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ কালো অনেক আছে। তুমি যদি শুধু নিরবচ্ছিন্ন ভালো চাও এবং আর কিছুই তোমার রুচিকর না হয়, তাহলে অনন্তকাল তোমার শ্বেতশুভ্র গজদন্ত প্রাসাদে বসে অপেক্ষা করলেও সে-বস্তু আসবে না। গণতন্ত্রের ধূসর রঙ এবং স্বৈরতন্ত্রের কালো রঙের মধ্যে তোমাকে একটা বেছে নিতে হবে। সব চাইতে বড়ো শান্তির আদর্শ হলো

কালোকে নির্ব্বাসিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ধূসরকে শুভ্রতর করা।” এইটে আজও আমার কার্য্যসূচী। আরও স্পষ্টভাবে আমি বললাম যে মিত্রশক্তির জয়লাভের পর ইউরোপকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক জাতীয়তার অবসান সূচনা করে। ইতিহাসে এ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জাতিসমূহের একমাত্র নিরাপত্তা আন্তর্জ্জাতিকতায়। ব্যক্তি কিম্বা দেশের একক ভাবে নিরাপদ থাকবার উপায় নেই।

আমার বক্তব্যের শেষাংশে একটি ছোটখাটো রূপকের উল্লেখ ছিলো। কিন্তু আমার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেইটি না বলেই আমাকে পড়া শেষ করতে হয়। আমি লিখেছিলাম, “ক স্বীয় প্রয়োজনে একটি চমৎকার বাড়ী নির্ম্মাণ করলো এবং তার নাম দিলো “গণতন্ত্র”। কিছুদিন পর চ নামধারী এক ব্যক্তি ঐ বাড়ীর পাশের বাড়ীটিতে বাস করার জন্যে আবেদন করলে। বাড়ীর মালিক ক-কে এসে জানালে একথা এবং বললে যে চ হচ্ছে একজন নামজাদা লুঠেরা এবং অনেক লুঠের মামলায় তার সাজা হয়েছে। ক সে কথা আমলই দিলো না, বরং প্রতিবাদ করে বললো যে সে চ-কে ভালো করে জানে এবং তাকে ভদ্রলোক বলে জানে। ফল ঃ মুসোলিনির গৃহপ্রবেশ। শীঘ্রই ছ এসে গণতন্ত্রের উল্টো দিকের বাড়িটি দখল করে বসলো। বোমাতৈরী ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করা ছ-এর কাজ। প্রতিবেশীরা ক-কে সাবধান করতে এসে জানিয়ে গেলো যে “গণতন্ত্রের” বিপদ আসন্ন। কিন্তু ক কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলে এবং বললে যে, ছ যে ল্যাবেরেটরীটি সদ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেই তার খরচ যোগাচ্ছে। একদিন চ ও ছ ক-এর কাছে এসে বললে, তাদের ব্যবসায়ের সহযোগী জ কিছুকালের জন্যে ক-এর বাড়ির ছাদে

সাময়িক বিশ্রাম নিতে চায়, ক-এর এতে আপত্তি আছে কি না। ক বললে, সে বরং জ-এর আগমনে আনন্দিতই হবে। ফল : ফ্রাঙ্কো ক-এর বাড়ির ছাদে আড্ডা গেড়ে বসলে এবং ওপরের জলের ট্যাঙ্কটিকে জলশূন্য করে সে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে সেটা ভরে তুললে। অবশেষে একদিন "গণতন্ত্রে" আগুন লাগলো এবং সেই আগুনে আটকা পড়ে ক তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সবাই পুড়ে মরলো। "গণতন্ত্রের" ভিত কাঁচা ছিলো একথা কেউ বলবে না; লোকে বল্‌বে, ক-এর মূর্খতার জন্যেই এইরূপ ঘটলো।"

ফ্রান্সের পতনে অধিকাংশ আমেরিকানের মনোভাবে পরিবর্তন দেখা দিলো। এদের ভেতর অসংখ্য স্বাতন্ত্র্যবাদীও ছিলো। গড়-পরতা প্রতিটি স্বাতন্ত্র্যবাদীর চোখে বিস্তীর্ণ সমুদ্র ছিলো নিরাপত্তার নিশানা। সেই কারণেই সাগরপারের গোলমালের সঙ্গে নিজেদের জড়াবার কোনো কারণ তারা খুঁজে পায়নি। বস্তুতঃ, সাগরের ব্যবধানটা আসল কথা নয়, আসল কথা হলো সাগরের পরপারে কী ঘটছে সেইটে। যতোদিন ফরাসী সৈন্যবাহিনী ও ব্রিটিশ নৌশক্তি আক্রমণবাদী নাৎসী শক্তিকে ইউরোপের আটলান্টিক উপকূলে ঘাঁটি গাড়তে দেয়নি, ততোদিন সমুদ্র একটি প্রাচীরের মতো কাজ করেছে। কিন্তু ডিয়েপ্পে, ক্যালে ও ব্রেষ্ট বন্দর জার্ম্মানদের করতলগত হওয়ার অর্থ সমুদ্র আর তাদের প্রতিরোধকারী নয়, সমুদ্র তাদের সহায়ক। ফ্রান্সের পতনের পর জার্ম্মানীর সশস্ত্র শক্তি ও গৃহস্থিত আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করছিলো মাত্র ব্রিটিশ নৌবাহিনী। ব্রিটিশ নৌবাহিনী এবং সাধারণভাবে ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে আমেরিকার সাহায্য দানের মূলে এইটেই ছিলো প্রধান যুক্তি।

তদনুসারে প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ব্রিটিশ সৈন্য-বাহিনীর প্রয়োজনে অস্ত্রসরবরাহের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রোৎপাদন

ও দ্রব্যোৎপাদনের কারখানাগুলিকে মেজেঘষে তৈরী হতে নির্দ্দেশ দিলেন। উইনস্টন চার্চিল ১৯৪৫-এর ১৪ই মে জানালেন যে, ১৯৪০-এর জুন এবং ১৯৪১-এর প্রথম বসন্তের মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে "আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ সহ দশ লক্ষ রাইফেল্ ও এক হাজার কামান আটলান্টিক পার করেছি।" জাহাজে করে বিমানও অনেক আনা হয়েছিলো। বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের আত্মরক্ষায় এই উপকরণ যথেষ্ট সহায়তা করেছিলো। কারণ ডানকার্কের বিপর্য্যয়ের পর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের হাতে একটি আস্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীও ছিলো না।

এই সঙ্কটকালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কোন্ ভাব দ্বারা প্রধানতঃ চালিত হয়েছিলেন তিনি তাঁর এক পত্রে সেটা বর্ণনা করেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪০-এর ২০শে ডিসেম্বর পেতাঁচালিত ভিসি গভর্ণমেণ্টের দরবারে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত অ্যাড্মিরাল লীহিকে পত্রখানা লেখেন এবং পত্রটি ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-এর ৭ই অক্টোবর। প্রেসিডেন্ট লিখেছিলেন, "আমেরিকাবাসীর প্রাথমিক স্বার্থ হলো—এই মুহূর্ত্তে যে স্বার্থের নিকট আর সব কিছু নিষ্প্রভ—ব্রিটিশকে জয়যুক্ত হতে দেওয়া।" নিরপেক্ষতার নীতি ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত হয়েছিলো।

পার্ল হারবারের আক্রমণের পূর্ব্বেই যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধরত হয়েছিলো। সরকারীভাবে অবশ্য নয়, তবে কার্য্যতঃ হয়েছিলো। ১৯৪০-এর ৩রা সেপ্টেম্বর ইউরোপ ভূখণ্ডের যুদ্ধের প্রথম বার্ষিকী দিবসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চার্চ্চিলের সঙ্গে এক চুক্তিপত্রের কথা ঘোষণা করলেন। এই চুক্তির বলে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে পঞ্চাশটি "জরাজীর্ণ" ডেষ্ট্রয়ার দিলো আর প্রতিদানে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন থেকে পেলো আটলান্টিক সমুদ্রে সামরিক ও নৌঘাঁটি নির্ম্মাণ করবার অধিকার। ডেষ্ট্রয়ারগুলি যদি পুরোনোই হবে, ব্রিটিশ কেন তা হলে তাদের

চাইলে? আসলে সেগুলি যুদ্ধজাহাজ হিসেবে ভালোই ছিলো এবং সমগ্র যুদ্ধকাল বেশ ভালোই কাজ দিয়েছিলো। ১৯৪১-এর ১১ই মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঋণ-ও-ইজারা আইন স্বাক্ষরিত করেন। এই আইনের বলে চক্রশক্তির সহিত যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলিকে নিযুত ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হলো। হিটলার ও মুসোলিনি একটি নতুন দেশ আক্রমণ করলো কি সেই দেশ ঋণ-ও-ইজারা চুক্তির আওতায় এসে পড়লো। ১৯৪১-এর ৫ই এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র ডেনশাসিত গ্রীনল্যাণ্ডের রক্ষাব্যবস্থার ভার গ্রহণ করে। ১৯৪১-এর ৭ই জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের সহযোগে আইসল্যাণ্ড অধিকারপর্ব্ব সমাপ্ত করে এবং ঐ দ্বীপে মোতায়েন ব্রিটিশ সৈন্যের "পরিপূরক" কিম্বা "পরিবর্ত্ত" সৈন্য সরবরাহের ভার গ্রহণ করে। ১৯৪১ সালে আমেরিকান নৌবাহিনী আটলান্টিক সমুদ্রে জাহাজের বহর প্রহরাধীনে নিয়ে যাবার কাজ করছিলো এবং নাৎসী ডুবোজাহাজ খুঁজে বার করবার কাজে ব্রিটিশের সহিত সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করছিলো। আমেরিকার কূটনীতিও জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছিলো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট ভিসিস্থিত পেতাঁ গভর্ণমেণ্টকে বারম্বার সতর্ক করে দিচ্ছিলো, তাঁরা যেন হিটলারকে ফরাসী নৌবাহিনী ব্যবহার করতে না দেন। সামরিক ও বানিজ্যিক ব্যাপারে চক্রশক্তির পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করবার জন্যে লাটিন আমেরিকায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিলো। অসংখ্য বিবৃতি ও ঘোষণার মারফৎ রুজভেল্ট, রাষ্ট্রসচিব হাল এবং তন্নিম্ন অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁদের চক্রশক্তি-বিরোধী অ-নিরপেক্ষ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

পার্ল হারবারের ঘটনার অনেক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ চক্রশক্তির পরাজয়ে আমেরিকা যাতে অংশগ্রহণ করতে

পারে তদুদ্দেশ্যে এক বিস্তারিত, বাস্তব, সর্ব্বব্যাপী ও কল্পনাঘন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন।

একই সঙ্গে রুজভেল্ট শাসনতন্ত্র স্বাতন্ত্র্যবাদী সিনেটর ও প্রতিনিধিদের ভোটের বিরুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনী ও দেশের অন্যান্য রক্ষা-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলেছিলো।

এই সব বিধিব্যবস্থা ও ইংলণ্ডকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করার চেষ্টার পেছনে আমেরিকান জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের সমর্থন ছিলো। কিন্তু আমেরিকান সৈন্য যুদ্ধে পাঠানোর বিরুদ্ধে সাধারণের আপত্তি তখন পর্য্যন্ত প্রবল ছিলো। ১৯৪০ এর শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট-নির্ব্বাচন-সংক্রান্ত অভিযানে রুজভেল্ট ও ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি উভয়েই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে দেশ আক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো যুবককেই সাগরপারে পাঠানো হবে না। ১৯৪৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান আক্রমণকারীর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে এই সমস্যার সমাধান করে দিলো। জাপানীরা যুদ্ধে বহু 'হারাকিরি' করেছে; ইতিহাস এইটেকে তাদের প্রথম 'হারাকিরি' রূপে গণ্য করতে পারে। পার্ল হারবারের আক্রমণে আমেরিকার বহু জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু জাপানকে তা সুনিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলো।

১৯৩৯, ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে সুরু ক'রে, বিশেষতঃ ফ্রান্সের পতন থেকে পার্ল হারবার আক্রমণ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যবাদী ও যুদ্ধে হস্তক্ষেপ নীতির সমর্থনকারীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিলো এবং তা সমগ্র আমেরিকাকে তোলপাড় করে তুলেছিলো।

লিঙ্কন, নেব্রাস্কা, এণ্ডার্সন, ইণ্ডিয়ানা, ক্যাণ্টন, ওহিও এবং অন্যান্য আরো অনেক সহরের পল্লী অঞ্চলের নির্জ্জন রাস্তাগুলি দিয়ে শান্ত দুপুরে আমি অনেক হেঁটেছি। উদ্যানপেরিবেষ্টিত সাদা মাঠের

বাড়ী, গৃহের প্রবেশ-পথে বারান্দায় ঝুলন্ত দোল্‌না, ছায়াবিছানো গাছ, জানালায় বিন্যস্ত ফুলের টব—এ সমস্তই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, প্রীতিকর আরামপ্রদ জীবনের ছবি তুলে ধর্‌ছিলো। কিন্তু জানালায় সামরিক কার্য্যে যোগদানের চিহ্নস্বরূপ এক বা দুই তারকাবিশিষ্ট পতাকাও ছিলো। কোথাও কোথাও তারকার নীল সোনালী আভায় রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছিলো, যার অর্থ মৃত্যু। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দূরাগত সৈনিকের জননী কিম্বা স্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে ব'সে আরেকটি ভি-মেলের চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছে কিম্বা কোনো পুরনো চিঠি এবার নিয়ে পাঁচবারের মতো পড়্‌ছে আর ভাব্‌ছে : এই চমৎকার জায়গা ছেড়ে কেন আমার বাছাকে (অথবা প্রিয়তমকে) অশ্রুতপূর্ব্ব দেশে চ'লে যেতে হচ্ছে ? তাকে কাদায় শুয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ? হয়তো তাকে গুলী-গোলার মুখে পড়্‌তে হচ্ছে, হয়তো সে মারা যাবে। আপ্পিও, বাষ্টোন, আইয়ো জিমা প্রভৃতি নামগুলি ব্যথাবেদনা, আকাঙ্ক্ষা ও নির্জ্জনতা ছাড়া এই নারীর জীবনে আর কীই বা বোঝায় ?

একবার আমি মিসেস এলিনর রুজভেল্টের নিউইয়র্কস্থিত ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কথাবার্ত্তা শেষ হ'য়ে যাবার পর তিনি আমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দেন। বাইরে বারান্দার মেঝেতে একখানা বৈমানিক খবর-কাগজ প'ড়ে ছিলো। আমি সেটা তাঁর হয়ে তুলে নিই এবং আমরা দুজনে গুয়াদালকানালে নৌ-বাহিনীর প্রথম পদার্পনের সংবাদ সম্পর্কিত বৃহৎ শিরোনামা পড়ি।

মিসেস্ রুজভেল্ট বল্‌লেন, "আমার এক ছেলে এই বাহিনীতে আছে।" এইটি তাঁর ছেলে জেমস্। ছোটো সাদা বাড়ী কিম্বা 'হোয়াইট হাউস'—কোনোটিই সৈন্যসংগ্রহের ব্যাপারে ছাড়া পায় নি।

গুয়াদালকানাল, সিসিলি, ওকিনাওয়া, ক্যাসিনো, নর্ম্যাণ্ডি—এই জায়গাগুলি কান্‌সাস্ থেকে এতো দূর, ইলিনয়েসের কাছে এতো

গুরুত্বহীন্ মনে হয়! সহস্র সহস্র আমেরিকান ঐ সব দূরবর্ত্তী দেশে সমাধির নীচে শুয়ে আছে কিম্বা অনুরূপ সংখ্যক আমেরিকাবাসী ঐ সব অঞ্চলের যুদ্ধে তাদের হৃত চক্ষু কিম্বা হৃত প্রত্যঙ্গের জন্যে রাষ্ট্রের সপ্রশংস স্বীকৃতি ও সহায়তা লাভ করেছে ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে। বাস্তবিকই এটা একটা বিস্ময় এবং কথাটায় যদি আপত্তি না থাকে, বাতুলতাও বটে। এই উন্মত্ত পৃথিবীতে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকেও তার যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে এবং এই ভূমিকা সে পরিহার করতে পারে নি।

"আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক?" যে লোক একথা বলেছিলো সে ছিলো খুনে। পৃথিবী নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আমরা সকলে বাস করি। এক দেশের সমস্যা অবশ্য সাধারণ অবস্থায় অন্যান্য দেশের বিবেচ্য বিষয়ের একতিয়ারে পড়ে না, কিন্তু যদি তার সমাধান খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হলে অবশ্যই পড়ে। আবেল সম্বন্ধে আমরা যদি মাথা না ঘামাই তা হলে কেন্ তাকে বধ করবেই।

কর্ণেল লিণ্ডবার্গ ও "আমেরিকা সর্ব্বপ্রথম" নীতির পরিপোষকগণ বলতে লাগলেন যে, সুরক্ষিত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের অতীত। কাজেই যতোক্ষণ পর্য্যন্ত আমেরিকা সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী থাকবে ততোক্ষণ কোন্ কোন্ বৈদেশিক রাষ্ট্রের পতন ঘটলো তাতে কিছু যায় আসে না। এমতাবস্থায়, যুধ্যমান এক পক্ষকে সাহায্য করা অনাবশ্যক ও সেটা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ। সুতরাং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে স্বাতন্ত্র্যবাদীরা ঋণ-ও-ইজারা এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভোটপ্রদান করেছিলো।

লিণ্ডবার্গ আমেরিকান বিমানবাহিনীর জন্যে দশসহস্র বিমানের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। ১৯৪১ সালের ২৩শে জানুয়ারী ঋণ-ও-ইজারা বিলের ধারা বিবেচনাকালে প্রতিনিধি পরিষদের বৈদেশিক বিষয় কমিটিকে তিনি জানালেন, "উক্ত সংখ্যক বিমান

আমেরিকার নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট; বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলাফল কী হবে এ প্রসঙ্গে সে বিচারের প্রয়োজন নেই। * * * আমাদের বিমান বাহিনীর সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড, কানাডা, আমেরিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিস্, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার কতিপয় অঞ্চল, গালাপাগোস্ দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কায় বিমান ঘাঁটি স্থাপনের কার্য্য চালিয়ে যেতে হবে।"

কিন্তু এই ঘাঁটিগুলি কী জন্যে? লিণ্ডবার্গ হয়তো মনে করেছিলেন, এগুলির দ্বারা শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধ কিম্বা তাদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের উপর শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা আছে যে মুহূর্ত্তে এই সম্ভাবনা কেউ স্বীকার করে নিলো—এবং লিণ্ডবার্গ বিমান ঘাঁটির সপক্ষে ওকালতি করে ঠিক তাই করেছিলেন—তখন মাত্র একটি প্রশ্নই থাকে—সম্ভাবিত শত্রুকে কোন্ উপায়ে সব চাইতে সফলভাবে দমন করা যাবে। আন্তর্জ্জাতিকতা-বাদীরা মনে করতো, শত্রুকে দমন করতে হলে তাকে আগে বাধা দেওয়াই সর্ব্বাধিক যুক্তিযুক্ত; শত্রু-কর্ত্তৃক সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়া ভূখণ্ড অধিকৃত হওয়ার পর তাকে বাধা দিতে যাওয়া বোকামি।

আমেরিকার কাছ থেকে সরবরাহ এবং অধিকতর মার্কিণ সাহায্যের আশ্বাস না পেলে ব্রিটেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো। সেই ক্ষেত্রে হিটলার রুশিয়া আক্রমণ করলে, জার্ম্মানীর উপর ব্রিটিশ বোমাবর্ষণের অনুপস্থিতিতে ও মার্কিণ ঋণ-ও-ইজারা সাহায্যের অভাবে রুশিয়ারও পরাজয় ঘটতো। এই অবস্থায় চীনের ভাগ্যে কী ঘটতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এইভাবে জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার পূর্ণকর্ত্তৃত্ব লাভ করতো। এর ওপর ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেনের সহায়তাপুষ্ট হয়ে তারা ব্যবসা ও প্রচারণাসূত্রে লাটিন আমেরকিায় ঢুকে পড়তো।

এই সম্ভাবনা লক্ষ্য করে প্রত্যেকটি আমেরিকান তার দেশকে পূর্ণমাত্রায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করতে চাইতো। আমেরিকা একটি সৈনিকাবাস সহরের মতো, একটি প্রাচীরবদ্ধ দুর্গের মতো সদাসতর্ক সদাসন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো।

ফাসিষ্ট সামরিক জয়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্বাত্মক নীতির প্রতি আস্থাবান অনেক নূতন বিশ্বাসীর উদ্ভব হতো। লোকে বলতো, "হিটলার পাওয়ার মতো পাওয়া পেয়েছে।" বস্তুতঃ, কেউ কেউ সেকথা বলতে সুরুও করেছিলো।

সেই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে হিটলার, মুসোলিনি ও জাপানের সঙ্গে তাদের সর্ত্তে ব্যবসা করতে হতো, অন্যথায় তাকে একটি পরিত্যক্ত দ্বীপ হয়ে থাকতে হতো। স্বাতন্ত্র্যের নীতি আমেরিকাকে বিপজ্জনক স্বাতন্ত্র্যের মুখে ঠেলে দিতো।

সৌভাগ্যক্রমে, অধিকাংশ আমেরিকান চক্রশক্তির বিপক্ষদলকে সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত করলে। কথাটাকে খোলাখুলি, স্পষ্টাস্পষ্টি এবং নির্ভুলভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, অসহায় ও একক আমেরিকার পক্ষে বিজয়গর্ব্বস্ফীত শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার দিনটি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার চাইতে অন্য দেশের মাটিতে এবং অন্য দেশের সশস্ত্র বাহিনীদের সহযোগিতায় ভবিষ্যৎ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করাই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অধিক যুক্তিযুক্ত ছিলো। আমেরিকান ইস্পাত ও উদ্বৃত্ত আমেরিকান জনবল দিয়ে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার একটি কৌশলপূর্ণ ও ঐতিহাসিক উপায় হলো ঋণ-ও-ইজারা ব্যবস্থা। ব্রিটিশ ও রাশিয়ান কর্ত্তৃক অধিক জার্ম্মান সৈন্য নিহত হওয়ার অর্থ জার্ম্মান সৈন্য কর্ত্তৃক অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক আমেরিকান নিহত হওয়া।

আমেরিকানরা একথার তাৎপর্য্য ভালো করেই বুঝেছিলো এবং

ফ্রান্সের পতনের সময় থেকে ইংলণ্ডকে সাহায্য করবার প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিলো।

"এম্‌গোরিয়া গেজেট-"এর সম্পাদক উইলিয়াম এলেন হোয়াইট ১৯৪০-এর বসন্তকালে মিত্রপক্ষকে সাহায্যের মধ্যে দিয়ে আমেরিকার আত্মরক্ষাকরণ কমিটি (*Committee for American Defense through Aid to the Allies*) সংগঠন করেছিলেন। শত শত আমেরিকান এই কমিটিতে যোগ দেয়। ১৯৪০-এর ২৬শে মে আমাকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করবার অনুরোধ জানিয়ে আমি মিঃ হোয়াইটকে এক 'তার' করি। তিনি আমাকে কতকগুলি টেলীগ্রাম ও পত্র প্রেরণ করেন। ১৩ই জুনের চিঠিতে তিনি লেখেন, "এইটে লক্ষ্য করে আমি আনন্দিত যে আমরা বিমান, কামানবন্দুক ও গুলীগোলা বেশ অধিক সংখ্যায় পাঠাতে পারছি। আমরা বোধ হয় মিত্রপক্ষকে টিকে থাকতে সাহায্য করতে পারবো।" তিনি "পারবো" কথাটার নিচে কালি দিয়ে দাগ কেটে দিয়েছিলেন।

মিসেস ওয়েল্‌স্ ল্যাথাম ১৯৪০এর জানুয়ারীতে "ব্রিটেনের জন্য দ্রব্যমোড়ক" (Bundles for Britain) অভিযান আরম্ভ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে এইটে শুধু যে বস্ত্রদ্রব্যাদি, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য জরুরী দ্রব্যের সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো তাই নয়, বোমার তলায় এককভাবে দণ্ডায়মান একটি সাহসী জাতিকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে উৎসুক আমেরিকার বিভিন্ন সহর ও পল্লীর হাজার হাজার মানুষের উদ্যম ও উদ্দীপনার সংগ্রহশালা হয়েও দাঁড়ালো। ৫,৫০০,০০০ ডলার মুল্যের মোড়ক সাগরপারে পাঠানো হলো।

আমেরিকার লোকদের তৎপরতা কেবলমাত্র নায়কদের নির্দ্দেশ-পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। গ্যালাপ-পোল ইনষ্টিট্যুটের সম্পাদক উইলিয়াম এ লীডগেট ১৯৪১ সালে আমাকে লিখলেন,

"জনসাধারণ তাদের নেতাদের চাইতে অনেক বেশি বিচক্ষণ এবং বেশ কিছুদূর এগিয়ে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গণ-ভোটগ্রহণের ফলে দেখা গেছে যে, (১) আমেরিকানরা স্পেনীয় নিষেধবিধি তুলে দিতে চেয়েছিল; (২) প্যারিস ও লণ্ডনের নেতারা মিউনিক 'শান্তিচুক্তি'র অন্তর্নিহিত মূর্খতা উপলব্ধি করার পূর্ব্বেই তারা চুক্তিটির নিন্দা করেছিলো; (৩) "নিরপেক্ষতা আইন"এর অন্তর্গত অস্ত্রশস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা মূলক বিধিটি কংগ্রেস কর্ত্তৃক সমর্থিত হবার পাঁচ মাস আগেই তারা এই বিধি তুলে দেবার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলো; (৪) সাত বৎসর ধরে (১৯৩৫এর নভেম্বর থেকে সুরু করে) তারা বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী, বৃহত্তর নৌবাহিনী, বিশেষতঃ বৃহত্তর বিমানবাহিনী দাবী করে আসছে'..........."

মিঃ লিডগেট আরও লিখেছিলেন, "জনসাধারণের ভাবধারার প্রতি কেউ তেমন গুরুত্ব না দেওয়াতেই বোধ করি পৃথিবীর এত দুর্গতি।" বোধ করি? 'বোধ করি' নয়, নিশ্চয়ই। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে প্রতিনিধিপরিষদের কোলাহলমুখর 'সংখ্যালঘুদের কথার অধিক' মূল্য দিয়ে এসেছে। কংগ্রেস্রের এ আচরণ গণতন্ত্রবিরোধী।

যে যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ অথচ আমরা এখনও তাতে জড়িত হয়ে পড়িনি সেই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমগ্র জাতি যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের উপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলো।

১৯৪৪ সালের এক সন্ধ্যায় 'ইনসাইড এশিয়া,' 'ইনসাইড ইউরোপ' প্রভৃতি গ্রন্থের জনপ্রিয় লেখক জন গান্থারের বাসগৃহে কয়েকজন বৈদেশিক সংবাদদাতা, হার্পারের প্রেসিডেণ্ট কাস ক্যানফিল্ড, "ফরেন এফেয়াস" ত্রৈমাসিকের সম্পাদক হ্যামিল্টন ফিস আর্ম্মষ্ট্রঙ্গ, "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের" ইরিটা ভ্যান ডোরেন ও ওয়েণ্ডেল এল্

উইলকি বসে আলাপ-আলোচনা ও স্মৃতিচারণ করছিলেন। উইল্‌কি নিম্নের গল্পটি বলেছিলেন :

"১৯৪১সালে, ইংলণ্ড থেকে আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পর, ডুউইট ওয়ালেস ("রীডার্স ডাইজেষ্ট"-এর প্রকাশক) আমাকে টেলীফোন করে জানালেন, ব্রিটেনকে সাহায্যদানের বিরুদ্ধে মতজ্ঞাপন করে ফ্রেডা উটলী যে প্রবন্ধ লিখেছেন আমাকে তার একটি জবাব লিখে দিতে হবে। তিনি আমাকে এর জন্যে পাঁচ হাজার ডলার দক্ষিণা দিতে চাইলেন। আমি তাঁকে বল্‌লাম, আমার কোর্টে একটি মোকদ্দমা আছে; আমার সময় নেই। ওয়ালেস বল্‌লেন, 'বেশী কিছু না, দেড়হাজার শব্দযুক্ত একটি নিবন্ধ হলেই চলবে। আমরা আপনাকে ছ' হাজার ডলার দেব।' আমি তাঁকে পুনরায় বললাম যে আমার দ্বারা হবে না। ওয়ালেস নাছোড়বান্দা, বললেন, 'মিঃ উইলকি, আমি আপনাকে প্রবন্ধটির জন্যে আট হাজার ডলার পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছি।'" তারপর উইলকি একটু হেসে বললেন, "আট হাজার ডলার. বুঝতেই পারছেন। আমি প্রবন্ধটি লিখতে রাজী হয়ে গেলাম।" নিজের সম্পর্কে এইরূপ খোলাখুলি গল্প বলতে পারার ক্ষমতা উইলকির চরিত্রের প্রবল আকর্ষণের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

সেই প্রবন্ধে উইল্‌কি লেখেন : "যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের টিকে থাকার সমস্যা, —সেটা এমন একটা জীবনযাত্রাপ্রণালীর উদ্বর্ত্তনের সমস্যা যা পৃথিবীর আর সব কিছুর চাইতে আমাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ। * * * আমরা ব্রিটেনকে সাহায্য করছি, কেন না সে যে সংগ্রামে লিপ্ত তা "যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের অনুকূলে।" হিটলারের "সর্ব্বাত্মক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দাস ব্যবস্থা স্বতঃসিদ্ধ ও অবধারিত ভাবে স্বাধীনতার পরিপন্থী।"

নূতন দৃষ্টিতে ষ্টালিন ও হিট্‌লার

ফ্রান্সের পতনের ফলে আমেরিকা ইংলণ্ডের আরও কাছে এগিয়ে এলো। সেই সঙ্গে যুদ্ধেরও। ফ্রান্সের পতন রুশিয়া আক্রমণের পর্ব্বটাকেও ত্বরান্বিত করে তুললো। এইরূপ যে ঘটবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেটা দুবৎসর আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ঈ ডেভিস তাঁর 'মিশন টু মস্কো' বইতে লিখেছেন, ১৯৩৯ সনের ১৮ই জুলাই তিনি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত দ্বিপ্রাহরিক ভোজন করেন। ষ্টালিন ও হিটলারের মধ্যে আসন্ন সন্ধির কথা নিয়ে সেই সময়ে কূটনৈতিক মহলে জোর গুজব চলছে। ডেভিস তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন: "প্রেসিডেণ্ট আমাকে বললেন যে, তিনি সোভিয়েট রাজদূত ঔমানস্কিকে মস্কো যাত্রার প্রাক্কালে ষ্টালিনকে এই কথাটি জানাতে বলেছিলেন যে, যদি তাঁর (ষ্টালিনের) গভর্ণমেণ্ট হিটলারের সহিত যোগ দেয়, তা হলে দিনের পর যেমন রাত্রি, তেমনি ভাবে হিটলার ফ্রান্স দখল করা মাত্র রুশিয়ার ওপর নজর দেবে, সুরু হবে সোভিয়েটের পালা। সম্ভব হলে ষ্টালিন ও মলটভকে কথাটা জানাতে তিনি আমাকেও বললেন।"

প্রেসিডেণ্ট এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভৌগোলিক সংস্থিতি, হিটলার ও যুদ্ধের স্বরূপ তিনি খুব ভালো বুঝেছিলেন। তাই এটা তাঁর বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি যে, ফ্রান্স বিজিত হয়েছে অথচ ইংলণ্ড জার্ম্মান বাহিনীর নিকট অনধিগম্য রয়েছে এই অবস্থায় রুশিয়া আক্রমণ করা ছাড়া হিটলারের গত্যন্তর নেই।

১৯৪১ সালে ইউরোপের প্রধান ভূখণ্ড আক্রমণ করবার মতো সামর্থ্য ইংলণ্ডের ছিলো না। পরে অবশ্য আমেরিকার সহায়তায় তার পক্ষে এটা করার সম্ভাবনা ছিলো। এই বিবেচনার ভিত্তিতেই রুশিয়া আক্রমণের তারিখ নির্দ্ধারিত হ'য়েছিলো। আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বেই জার্ম্মানী রুশিয়াকে গুঁড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলো।

দুটি জিনিষ হিটলার পারে নি। ইংলণ্ড আক্রমণ তার সামর্থ্যের বাইরে ছিলো, আবার আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান সাহায্যের জন্য তার পক্ষে চুপ করে থাকাও সম্ভব ছিলো না। দুটি জিনিষ সে করতে পারতো— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনো অঞ্চল আক্রমণ ক'রে সে ইংলণ্ডের উপর আঘাত হান্‌তে পারতো, হয়তো রুশিয়া আক্রমণ করতে পারতো।

ইঙ্গ-মার্কিণ সঙ্ঘবদ্ধতায় ফাটল ধরানোর চাইতে রুশিয়াকে ঘায়েল করা সহজ হবে, হিটলার মনে মনে এইরূপ হিসাব করলে। তার আশা ছিলো, বলশেভিকবাদরূপ ভয়াবহ বিভীষিকার কেন্দ্র রুশিয়া জার্ম্মানী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'লে কৃতজ্ঞ পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি খাতির ক'রে জার্ম্মানীর উপর আর হামলা চালাবে না।

হিটলারের অনুমান পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে।

হিটলার নিশ্চিত ভেবেছিলো যে পোলাণ্ড উপলক্ষে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। "তারা অত্যন্ত ভয়কাতুরে," সেনা-নায়কদের প্রতি এক গোপন বক্তৃতায় হিটলার এইরূপ বলেছিলো। সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তির আসল উদ্দেশ্যই ছিলো—ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে যুদ্ধে নিরুৎসাহ করা। বস্তুতঃ মস্কোর প্রামাণ্য কাগজ "প্রাভ্‌দা" ১৯৪০ সালের ২৩শে আগস্ট রুশ-জার্ম্মান চুক্তির প্রথম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক সম্পাদকীয়তে এইরূপই লিখেছিলো। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হলো, "সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি ছিলো

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সংগঠক ও প্ররোচকদের প্রতি শেষ সাবধান-বাণী কিন্তু এই হুঁশিয়ারীতে কাজ হয় নি। যুদ্ধ ঠেকানো গেলো না।

ন্যুরেমবার্গ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকালে উপস্থাপিত এবং আমেরিকার ১৯৪৫ এর ৭ই ডিসেম্বর তারিখের সংবাদপত্র সমূহে উল্লিখিত আবিষ্কৃত জার্ম্মান সরকারী দলিলসমূহ থেকে দেখা যায়, রুশ-জার্ম্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার আগে পর্য্যন্ত হিটলার জার্ম্মান বাহিনীকে পোলাণ্ড আক্রমণ করবার আদেশ দেয় নি। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পরের দিন, অর্থাৎ ২৪শে আগষ্ট সে এই আদেশ দেয়। হিটলার ভেবেছিলো এই চুক্তির পর আর পশ্চিমী শক্তিগুলি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে সাহস করবে না।

এই প্রাথমিক ভুল করার পর হিটলার ভাবলে পোলাণ্ডের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ থেমে যাবে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে হিটলার কয়েকবারই ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করবার আগ্রহ প্রকাশ করে। বার্লিনের এক শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে গোয়েরিং বলেছিলো, পোল্যাণ্ড অভিযানের কিছুদিন পর—গোয়েরিং-এর হিসাবে চার সপ্তাহ বাদে—"আমরা এক সম্মানজনক সন্ধির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম।" পোল্যাণ্ড গ্রাসের পর নাৎসীরা কিছুদিন বিশ্রাম চেয়েছিলো। বিশ্রামের পর আবার অজগরের শিকার ধরবার মতলব ছিলো।

রুশিয়াও তেমনি পোলাণ্ড বিজয়ের পর যুদ্ধক্ষান্তি করতে চেয়েছিলো। ১৯৪০, ৩০শে নভেম্বর তারিখের "প্রাভদায়" ষ্টালিন অভিযোগ করলেন যে, "ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী জার্ম্মানীর শান্তিপ্রস্তাব এবং যথাসম্ভব শীঘ্র যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রচেষ্টা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।"

হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোন সার্থকতাই খুঁজে পায়নি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট। ১৯৩৯, ৯ই অক্টোবর, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের

সরকারী মুখপাত্র মস্কোর "ইজ্‌ভেস্তিয়া" লিখলে, 'হিটলারবাদকে ধ্বংস' করবার জন্যে যুদ্ধ সুরু করার অর্থ রাজনীতিক্ষেত্রে চূড়ান্ত বোকামির পরিচয় দেওয়া। বৈদেশিক সচিব মলটভ এইজন্যেই ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে "আক্রমণকারী" আখ্যায় অভিহিত করলেন।

সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি থেকেই দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের উদ্ভব। কিন্তু রুশিয়া একটি বড়ো যুদ্ধ চেয়েছিলো, একথা বললে ভুল হবে। মস্কো ভেবেছিলো যে সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তির ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোলাণ্ডের উপর 'মিউনিক চুক্তি'র অনুরূপ এক চুক্তির ভার চাপাবে এবং যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে। বলশেভিকরা জানতো, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিদ্বয় পোলাণ্ডকে সমর্থন না করলে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করবে, পোলাণ্ডকে বিধ্বস্ত করবে, রুশিয়ার সহিত পোলাণ্ড ভাগাভাগি করে নেবে। সুতরাং, ষ্টালিন মনে মনে হিসাব করলেন, ব্রিটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে জার্ম্মানীর সঙ্গে এক অনিচ্ছুক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তার থেকে পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির সঙ্গে জার্ম্মানীর যে বিরোধ দেখা দেবে, রুশিয়া সেই সুযোগে নিজের নিরাপত্তার পথ করে নেবে। ষ্টালিন হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন ঠিক এই কারণে

ষ্টালিন হিসেবে ভুল করেছিলেন।

ষ্টালিনের চোখে এটা ধরা পড়েনি যে শক্তিকামিরা লণ্ডনে কিম্বা প্যারিসে আর আসর জাঁকিয়ে নেই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সন্ধি করবে না, ফ্রান্সের পতন ঘটবে আর ফলে রুশিয়ার ক্ষতি হবে (যে সম্ভাবনা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলেন) এর কোনোটাই ষ্টালিন বুঝতে পারেন নি।

রাষ্ট্রনায়ক এবং গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কর্ম্মচারীরা সময় সময় ঘরে বসে সামরিক জল্পনাকল্পনার খেলায় মাতেন। জনসাধারণের কাছে এই খেলা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমার এবিষয়ে অভিজ্ঞতা

আছে, কেননা আমি নিজে কতিপয় রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে বসে এই খেলা খেলেছি এবং জল্পনা করেছি, "যদি অমুক হয়, তাহলে কী হবে? যদি তমুক হয় তাহলেই বা অবস্থা কী দাঁড়াবে?" সময় সময় এঁরা ঘটনার গতি সঠিক অনুধাবন করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলও করেন, আর এই ভুলের মাশুল গুণতে হয় তাঁদের দেশের লোকদের। সোভিয়েট-নাৎসী "মিউনিক" চুক্তি সাধিত হবার পরবর্ত্তী বাইশমাস-ব্যাপী তোষণমূলক বিরামপর্ব্ব রুশিয়াকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে যে ভাবে মুক্ত রেখেছিলো ১৯৩৮এর সেপ্টেম্বরে মিউনিক চুক্তির পর এগারো মাস ধরে যে তোষণনীতির পর্ব্ব চলেছিলো তা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে ঠিক সেই পরিমাণেই যুদ্ধের বাইরে রেখেছিলো। তোষণনীতির ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে, কমে না।

অঙ্ক ক'ষে এটা দেখিয়ে দেওয়া যায় যে গ্রেট বিটেন ও ফ্রান্স এগারো মাসব্যাপী তোষণনীতির অধ্যায়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার সেনা-বাহিনী অস্ত্র ও অস্ত্রোৎপাদন কারখানাসমূহের ক্ষতির পিঠে উপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্র প্রস্তুত কিম্বা অস্ত্র ক্রয় করেনি। অবশ্য বলা যায়, চেম্বারলেন-দালাদিয়ার-প্রবর্ত্তিত তোষণনীতি সত্ত্বেও তো গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, ফ্রান্স মুক্ত হয়েছে। হয়েছে বটে, কিন্তু এর জন্যে কী অপরিসীম দামই না দিতে হয়েছে!

রুশিয়াও অবশ্য তার আপোষকামিতার অধ্যায়ে অস্ত্রোৎপাদন করেছে, কিন্তু ততোটা করেনি যাতে করে ফ্রান্সের পরাজয় এবং জার্ম্মানী ও তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত দেশসমূহ এই সময়ের মধ্যে যে অস্ত্র প্রস্তুত করেছে—এ দুটি সম্মিলিত ক্ষতির পরিপূরণ হয়। পরিণামে অবশ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কিন্তু এ জন্যে দুই কোটি বিশ লক্ষ সোভিয়েট নাগরিককে যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে। এ সম্পর্কে বিদেশে যে সব নির্ভরযোগ্য হিসাব তৈরী করা হয়েছে, তার কোনটিতেই সামরিক ও বেসামরিক অধিবাসীর মৃত্যুসংখ্যা

দেড় কোটির কম ধরা হয়নি। এ ছাড়া বহু লক্ষ আহত, রুগ্ন, অশক্ত ও অসুস্থ নরনারীশিশু তো আছেই। রুশিয়ার সমৃদ্ধ কৃষি ও শিল্পাঞ্চলের সমূহ ক্ষতিও এইসঙ্গে বিচার করতে হবে। সর্ব্বশেষ জয়ের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী আপোষকামিতার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়না। হিমরক্ত মস্তিষ্ক হয়তো জয়লাভকে নিতান্তই একটি খবরের কাগজের শিরোনামার বেশি কিছু মনে করে না, কিম্বা মনে করে যে তর্কবৈঠকে জেতবার এটা একটা উপায়। কিন্তু যে কোন সভ্য মানুষই এই প্রশ্ন করবে—জয়লাভের জন্যে আমাদের কী পরিমাণ মূল্য দিতে হলো? এবং, অধিকতর দূরদর্শী কূটনৈতিক জ্ঞান দ্বারা কি এই মূল্য কমানো যেতে পারতো?

ক্রেম্‌লিনের বিচারবুদ্ধি যদি প্রবলতর হতো, তা হলে তারা ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ থেকে এবং ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপার থেকে দূরে থাকতো এবং ফ্রান্স যখন বিপন্ন, মাত্র তখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতো। ১৯৪০ সালে রুজভেল্ট বুঝেছিলেন যে আমেরিকার স্বার্থেই ব্রিটেনকে চূড়ান্ত সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন; ষ্টালিনেরও তেমনি বোঝা উচিত ছিলো যে, সোভিয়েটের স্বার্থেই ফ্রান্সকে সাহায্য করা প্রয়োজন।

১৯৪০-এর বসন্তকালে রুশিয়ার পক্ষ থেকে যদি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হতো, তা হলে জার্ম্মান বাহিনী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়তো, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তার ঝটিকা-অভিযানের ধার ভোঁতা হয়ে যেতো, এবং ১৯১৪-র গ্রীষ্মকালে জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে জারের সৈন্যদলের অভিযানের ফলে যেরূপ মার্ন নদীর তীরে ফরাসী বাহিনীর টিঁকে থাকা সম্ভব হয়েছিলো তেমনি এবারও হয়তো ফ্রান্সের পরাজয় ঠেকানো সম্ভব হতো। ১৯৪০-এ ফ্রান্সের যেরূপ দ্রুতগতি পতন ঘটেছে, রুশিয়া সাহায্য না করলে ১৯১৪ সালেও তার সেরূপ দশা হতো।

অবশ্য এইরূপ প্রতিষেধকাত্মক যুদ্ধনীতি অবলম্বনের বিপদও

ছিলো। কারণ রুশ-হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও ফ্রান্সের পতন ঘটতে পারতো এবং সেই ক্ষেত্রে হিটলার বলকান দেশগুলি কুক্ষিগত করার পরই রুশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত হিটলার তাই করলো। তবে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে রুশিয়া যদি জার্ম্মান বাহিনীকে ব্যাপৃত রাখতো, তা হলে হয়তা ফ্রান্সকে বাঁচানো গেলেও যেতে পারতো। ফ্রান্সের পতন এবং তৎপর ইউরোপ ভূখণ্ডে সর্ব্বেসর্ব্বা হিটলারের পাশে একা প'ড়ে থাকা—এইটেই ছিলো ষ্টালিনের পক্ষে সব চাইতে বড়ো বিপদ।

পোলাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারকে আর একবার তোয়াজ করবে, ষ্টালিন এরূপ প্রত্যাশা করেছিলেন। এটা তাঁর প্রথম ভুল। তিনি আবার হিসেবে ভুল করলেন যখন ভাবলেন যে পোলাণ্ডের পতন ঘটবার পর গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ থেকে স'রে দাঁড়াবে। তাঁর তৃতীয় ভুল ফ্রান্সকে সাহায্য না করা।

হিটলারের কেন্দ্রীয় রণকৌশল প্রয়োগের নীতিও ষ্টালিন ভুল বুঝেছিলেন। এ সম্পর্কে প্রাক্তন সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব ম্যাক্সিম লিট্‌ভিনভের এক উক্তি থেকে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে ম্যাক্সিম লিট্‌ভিনভের ধারণা অন্য যে কোনো রাষ্ট্রধুরন্ধর অপেক্ষা অধিক সঙ্গতিপূর্ণ ও অভ্রান্ত ছিলো। ১৯৪১, ১৩ই ডিসেম্বর, ওয়াশিংটনে সংবাদদাতাদের নিকট এক বিবৃতিতে লিট্‌ভিনভ বলেছিলেন, "সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে হিট্‌লারের বদ-মতলব আছে আমার গভর্ণমেণ্ট সেটা জান্‌তে পেরেছিলো, কিন্তু আমার গভর্ণমেণ্ট তাকে বিশেষ আমল দেয় নি। তার মানে এ নয় যে আমার গভর্ণমেণ্ট হিটলারের স্বাক্ষরের পবিত্রতায় বিশ্বাসবান ছিলো, কিম্বা ভেবেছিলো হিটলার চুক্তিতে সই ক'রে চুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে না বা যে সব গুরু গম্ভীর প্রতিশ্রুতি তার মুখে ঘন-ঘন শোনা গেছে তাদের সে খেলাপ করতে পারে না। তবে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ধারণা

ছিলো, পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ শেষ করার আগে পূব দিকে আমাদের দেশের ন্যায় এমন একটা শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হিটলারের পক্ষে উন্মত্ততার তুল্য কার্য্য হবে।

সত্যি সেটা উন্মত্ততার তুল্য কার্য্য ব'লে প্রতিপন্ন হ'লো। কিন্তু হিটলারের এ ছাড়া পথ ছিলো না, ষ্টালিন কি তা জানতেন না? ষ্টালিন আশা করেছিলেন, সুতরাং বিশ্বাসও করেছিলেন যে, ফ্রান্সের সংগ্রামের পর জার্ম্মানী ইংলণ্ডের সঙ্গে এক জীবন-মরণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং শেষ পর্য্যন্ত দুটি দেশের একটি নেতিয়ে পড়বে। যে দেশ জয়ী হবে সে তখন এতো শ্রান্ত যে রুশিয়াকে ঘাঁটাতে আসবে না। ষ্টালিন এটা দেখলেন না যে, ১৯৪০ ও ১৯৪১-এ ব্রিটেনের শক্তি পরীক্ষার পর হিটলার যখন দেখলো যে, ব্রিটেনের ভিত নড়ানো সহজ কথা নয়, তখন তার পক্ষে ব্রিটেনের ওপর থেকে মুষ্টি শিথিল ক'রে রুশিয়া অভিযান করাই একমাত্র পথ ছিলো।

ষ্টালিন হিটলারকে ভুল বুঝেছিলেন, বিশ্বপরিস্থিতিও ভুল বুঝেছিলেন। এই ভুল বোঝার জন্যেই হিটলারের সঙ্গে তাঁর চুক্তি।

সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি ও তার আনুষঙ্গিক অন্যান্য চুক্তিগুলি দরকষাকষির মনোভাব থেকে করা হয়েছিলো লাভের আশায়। আর এই লাভও ছিলো কতক বাস্তব, কতক মন-গড়া।

১৯৪০, ২৩শে আগষ্ট "প্রভ্‌দা" লিখলে, সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তির ফলে "জার্ম্মানীর আর পূব দিক সম্বন্ধে ভাববার রইলোনা; তার পূর্ব্ব-প্রান্তের নিরাপত্তা সুরক্ষিত।" কথাটা সত্য, আর এর অর্থ ই হ'লো পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের জয়।

চুক্তিবলে মোটাপরিমাণ বীচালি, শস্যকণা, শন, পেট্রোলিয়ম, (একমাত্র ১৯৪০ সনেই সাত লক্ষ টন তেল পাঠানো হ'য়েছিলো) ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রুশিয়া থেকে, এবং রুশিয়ার মারফৎ জাপান থেকে, জার্ম্মানীতে যেতে লাগ্‌লো।

ইউরোপের ও পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট দলগুলি সহসা যেন শান্তি, আপোষ ও স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষক হ'য়ে উঠ্‌লো; তাদের রাগটা জার্ম্মানীর উপর পড়লো না, পড়লো জার্ম্মানীর শত্রুদের উপর। সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তির পর এটা অপরিহার্য্য ছিলো। মস্কোর সংবাদপত্রগুলি হিটলারের ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ সমর্থন করতে লাগলো। ১৯৪০, ৩০শে নভেম্বর তারিখের "প্রাভ্‌দায়" ষ্টালিন লিখ্‌লেন, "জার্ম্মানী ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে আক্রমণ করে নি; ফ্রান্স ও ইংলণ্ডই জার্ম্মানীকে আক্রমণ করেছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধের দায়িত্বও এই দুই শক্তির।" ষ্টালিন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডকে যুদ্ধের জন্যে দায়ী করার পর গণতন্ত্রশাসিত দেশগুলির কম্যুনিষ্টরা কেমন ক'রে ফরাসী বা ব্রিটিশ নীতির সমর্থক থাক্‌তে পারে? সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি বলবৎ থাকাকালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বত্র ফ্যাসীবিরোধী ও জার্ম্মানবিরোধী প্রচার বন্ধ হ'য়ে গেলো। ফ্রেড্‌রিক উল্‌ফের "প্রফেসর ম্যামলক" ও আইসেনষ্টাইনের "আলেক্‌জাণ্ডার নেভ্‌স্কি"র ন্যায় নাৎসী ও জার্ম্মান-বিরোধী ছবিগুলি পর্দ্দার গা থেকে অপসারিত হ'লো। কিন্তু আইসেনষ্টাইন যখন হ্বাগ্‌নারের "ডাই হ্বালফিউর" মঞ্চস্থ করলেন, মস্কোর উচ্চতন নাৎসী কর্ম্মচারীরা করমর্দ্দন ক'রে তাঁকে অভিনন্দন জানালে। ইহুদীর করমর্দ্দনে কারও আপত্তি হ'লো না। সোভিয়েট পতাকাদণ্ডে হাতুড়ি ও কাস্তে চিহ্নিত লাল পতাকা ও স্বস্তিকা একত্র মিলিত হবার পর এসব অবধারিত ছিলো। ১৯৩৯, ৯ই অক্টোবর "ইজ্‌ভেস্তিয়া" অযাচিত নির্লিপ্ততার সহিত লিখেছিলো, "যে কোনো নীতির প্রতি প্রত্যেক মানুষেরই তার মনোভাব জ্ঞাপনের স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছা করলে সে নীতিবিশেষকে সমর্থন করতে পারে। নীতিবিশেষকে বর্জ্জন করতে পারে।......হিটলারবাদ অথবা যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদকেই শ্রদ্ধা কিম্বা ঘৃণা করা সম্ভব। এটা মূলতঃ রুচির কথা। মস্কোই যখন ফ্যাসীবিরোধিতা বর্জ্জন

আর নাৎসীদের প্রতি সহিষ্ণু আচরণের পোষকতা করতে লাগলো তখন বাইরের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি কি করে নাৎসীবিরোধী মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে? সেই সময়ে কার্য্যতঃ নাৎসীবিরোধী ও যুদ্ধ-সমর্থক হওয়ার অর্থ ছিলো ষ্টালিনবিরোধী হওয়া। কাজেই গণতন্ত্রশাসিত দেশগুলির কম্যুনিষ্টরা দেশরক্ষার উৎপাদনের কারখানাগুলিতে ধর্ম্মঘটের প্ররোচনা দিতে লাগলো। আমেরিকার কম্যুনিষ্ট দল জার্ম্মানীর প্রস্তুত দ্রব্যের উপর 'বয়কট' প্রত্যাহার করলে। হোয়াইট হাউসে নিযুক্ত এই দলের পিকেটরা হিটলারের রুশিয়া অভিযানের দিনটি পর্য্যন্ত রুজভেল্টের নাৎসীবিরোধিতার নিন্দাসূচক প্ল্যাকার্ড বহন করে বেড়িয়েছে। ইংলণ্ডের উপর ভয়াবহ বিমান আক্রমণের অধ্যায়েও ব্রিটিশ কম্যুনিষ্টরা যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধা জন্মাতে চেয়েছে। ফরাসী কম্যুনিষ্টরা স্বদেশের পরাজয় ত্বরান্বিত করবার জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। রুশিয়াকে শক্তিশালী করবার জন্যে দম নেওয়াই যদি হিটলারের সঙ্গে ষ্টালিনের চুক্তির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে কম্যুনিষ্টরা কেন হিটলারের সহিত সংগ্রামরত দেশগুলির যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে হিটলারকে সাহায্য এবং প্রকারান্তরে রুশিয়ার ক্ষতিসাধন করেছিলো?

সর্ব্বশেষে যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এক কালে ফ্যাসীবিরোধী শক্তিগুলির সর্ব্বাগ্রগণ্য এবং সম্মিলিত নিরাপত্তা নীতির সর্ব্বাধিক পরিপোষক ছিলো, তারাই যখন কম্যুনিষ্টবিরোধী, ইহুদীবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী অত্যাচারের নায়ক জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি করতে পারলো, পারলো জার্ম্মানীর জাতিবিদ্বেষস্ফীত, লুণ্ঠনতৎপর, বর্ব্বর ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে হাত মেলাতে (এই হাত মেলাবার সপক্ষে অন্য পক্ষের তাড়না অথবা অকর্ষণ যাই থাকনা কেন), তখন এর ফলে আদর্শবাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা শিথিল হবে এবং রাজনৈতিক নিষ্ঠাহীনতা বৃদ্ধি পাবে, সে তো জানা কথা। এই রাজনৈতিক

দুর্নীতিই হিটলারের নিকট পের্তাঁর আত্মসমর্পনকে ত্বরান্বিত ক'রেছিলো। আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠাহীনতার এই অভিশাপ আজও আমাদের মধ্যে টিঁকে রয়েছে। সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি অনেক আদর্শনিষ্ঠাহীন চিন্তা ও চেষ্টার জনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। সাধারণ দেশের কাজে যে কোনো প্রকার শালীনতা-চ্যুতি হিটলারের পক্ষে লাভজনক ছিলো। এখন সেটা সর্ব্বাত্মক নীতির (totalitarianism) খোরাক জোটাচ্ছে।

সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তির ফলে এইগুলি হ'লো হিটলারের লাভ।

রুশিয়ার কী কী লাভ হয়েছি'লা ?

রুশিয়া অনেক নূতন স্থান দখল করেছিলো। প্রথমতঃ, রুশিয়া রিবেনট্রপ-মলটভ লাইন (পরে যা কার্জ্জন লাইন নামে পরিচিত হয়) পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পোলাণ্ড দখল করেছিলো। ১৯৩৯, ২৪শে অক্টোবর, ড'নজিগে এক বক্তৃতাকালে রিবেনট্রপ জানিয়েছিলেন যে, পোলাণ্ডের যুদ্ধ স্বুরু হওয়ার কিছুদিন পর, "রুশ-বাহিনী সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়, এবং রুশিয়ান ও আমাদের মধ্যে অগ্রিম আলোচনাক্রমে যে সীমারেখা স্থির হয় সেই সীমারেখা পর্য্যন্ত তারা পোলাণ্ডের ভূভাগ দখল করে।"

রিবেনট্রপের কথা আমি গ্রাহ্য করতাম না যদি না পরবর্ত্তী ঘটনায় সেটা সত্য প্রতিপন্ন হ'তো। প্রকৃত তথ্য হ'লো এই যে—পোলিশ বাহিনীর পিছনে ধাওয়া করতে করতে জার্ম্মান বাহিনী রিবেনট্রপ-মলটভ লাইন ছাড়িয়ে চ'লে এসেছিলো। এবং যেখানেই এটা ঘটেছে, সেখানেই লালফৌজ উপস্থিত হওয়ামাত্র জার্ম্মান বাহিনী অবিলম্বে তার সৈন্য সরিয়ে এনেছে। নাৎসী গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে রিবেনট্রপ-মলটভ লাইনকে সোভিয়েট ও জার্ম্মান এলাকার মধ্যবর্ত্তী স্বীকৃত সীমারেখা হিসাবে মেনে নেবার পূর্ব্বতন কোনো নির্দ্দেশ না থাকলে, বিজয়ী জার্ম্মান বাহিনী এইরূপ আচরণ করতে পারতো না।

হিটলার যখন ওয়ারশ'কে ভয় দেখাবার এবং বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করাবার মতলবে পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচার-যুদ্ধ আরম্ভ করলে, পররাষ্ট্রসচিব লিটভিনভ ১৯৩৮এর ২৭শে নভেম্বর মস্কোস্থিত পোল রাষ্ট্রদূতকে নূতন করে জানালেন, পোলাণ্ডের সঙ্গে রুশিয়ার যে অনাক্রমণ-চুক্তি আছে তার কোনোরূপ ব্যত্যয় হবে না। পোলরা যাতে দৃঢ়পদে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে তদুদ্দেশ্যেই এই উৎসাহ দেওয়া হয়েছিলো। ১৯৩৯, ২৯শে জুন মলটভ—তিনি ইতিমধ্যে পররাষ্ট্রসচিব পদে বৃত হয়েছিলেন—সরকারীভাবে মস্কোস্থিত পোল দূতাবাসকে আশ্বাস দিলেন যে পোলাণ্ড আক্রান্ত হ'লে তাকে সোভিয়েট থেকে অর্থসাহায্য এবং সোভিয়েট এলাকার মধ্য দিয়ে মুরমান্স্ক বন্দর থেকে পোলাণ্ডে যাবার রাস্তা দেওয়া হবে। উচ্চপদস্থ কম্যুনিষ্ট বাণিজ্যসচিব মিকোয়ান, পোল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উল্লিখিত প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি করলেন। পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে মীমাংসার সম্ভাবনা যতোদিন পর্য্যন্ত ছিলো ততোদিন ক্রেমলিন পোলাণ্ডের এলাকার মধ্যে দিয়ে লালফৌজের যাতায়াতের (খুব সম্ভবতঃ জার্ম্মানদের সহিত লড়াইয়ের জন্যে) অধিকারের প্রশ্ন তোলে নি, কারণ প্রতিটি সোভিয়েট কর্ম্মচারী জানতো,—১৯৩৮ সালে মিউনিক সঙ্কটের সময় লিটভিনভ বারম্বার আমাকে সেকথা বলেছেন—কোন পোল গভর্ণমেণ্টই রুশ সৈন্যদের পোলাণ্ডের এলাকায় প্রবেশ করবার অনুমতি দিতে পারেন না। মস্কোতে রুশিয়া, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই ত্রিশক্তির মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয় তাতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট লালফৌজের পোলাণ্ড-প্রবেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। ১৫ই আগষ্টের পরে অবশ্য তাঁরা এই প্রসঙ্গ তুলেছেন, কিন্তু ততোদিনে ১৯৩৯এর ২৩শে আগষ্ট তারিখে নিষ্পন্ন সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তির মুসাবিদা হ'য়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে এটাও স্থির হয়ে গেছে যে রুশিয়া পোলাণ্ডকে সাহায্য করবে না। মস্কো আলোচনা

ভেঙ্গে দেবার কারণ স্বরূপ তখন এই প্রশ্নটিকেই খাড়া করা হয়েছিলো।

ষ্টালিন জান্‌তেন যে ওয়ারশ'র সঙ্গে সরাসরি আলোচনার দ্বারা কিম্বা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়ে তিনি পোলাণ্ডের এক-খণ্ড জমিও পাবেন না। কিন্তু হিটলারের সঙ্গে রফা করে তিনি সত্যই পোলাণ্ডের এক অংশ পেলেন। বল্‌টিক্‌ রাজ্যগুলি সম্পর্কেও এই কথা খাটে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত আলোচনাকালে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বল্‌টিক্‌ রাজ্যগুলিতে বিশেষ অধিকার দাবী করলেন। ইংরেজ ও ফরাসী নায়কগণ বল্‌টিক্‌ দেশগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলেই জান্‌তেন, সুতরাং তাঁরা সেসব দেশের সামরিক ঘাঁটীগুলি ষ্টালিনকে ব্যবহার করতে দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু হিটলার রাজী হলো।

যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে ষ্টালিন এই সুবিধা আদায় করলেন সেটা তাঁরই উপযুক্ত। তিনি যা চেয়েছিলেন সেটা তিনি প্রথমে একভাবে পেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে ওভাবে পাওয়ার পথ রুদ্ধ, তিনি অপেক্ষা করে থাক্‌লেন, দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে দিলেন, এবং ঐ একই জিনিষকে আর একভাবে পেতে চেষ্টা করলেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি এটা প্রায়ই করতেন: বৈদেশিক নীতির বেলায়ও তিনি এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলেন। ষ্টালিন আঁকাবাঁকা পথে সোজা এগিয়ে চলেন। ব্রিটিশ ও ফরাসী নায়কদের আপত্তির চড়ায় ঠোকর খাওয়ার পর ষ্টালিন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সূত্র ছিন্ন করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন, যার ফলে রুশিয়া পোলাণ্ডের ভূভাগ দখল করলো এবং ক্ষুদ্র বল্‌টিক্‌ রাজ্যগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার পেলো। পরে বল্‌টিক্‌ রাজ্যগুলিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হলো।

১৯৪১ সনের ২২শে জুন রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা কালে হিটলার ঘোষণা করলে যে সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি সম্পাদিত হবার প্রাক্কালীন আলোচনায় একটি বিশেষ চুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, "ব্রিটেন যদি পোলাণ্ডকে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত হতে প্ররোচনা দিতে সক্ষম হয়, তা হলেই এই চুক্তি বলবৎ হবে এইরূপ কথা ছিলো।" পোলাণ্ড যদি যুদ্ধ না করে, রুশিয়াকে পোলাণ্ডের একটি অংশ ছেড়ে দেওয়া হবে। আর পোলাণ্ড যদি যুদ্ধ করে, সেই ক্ষেত্রে বিশেষ চুক্তিনামায় রুশিয়ার জন্যে বল্‌টিক্ রাজ্যসমূহে অতিরিক্ত সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। হিটলার বললেঃ "জার্ম্মানীর প্রতিনিধি মস্কোতে সুস্পষ্টভাবেই এটা জানিয়েছিলো যে এস্থোনিয়া, লাটভিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও বেসার্বিয়া (কিন্তু লিথুয়ানিয়া নয়) জার্ম্মানীর রাজনৈতিক প্রভাবের সম্পূর্ণ বাহিরে।" জার্ম্মানী এই অঞ্চলগুলিকে সোভিয়েট প্রভাবাধীন অঞ্চল বলেই গণ্য করেছিলো।

বিখ্যাত নুরেমবার্গ-বিচারে যে সমস্ত দলিল উপস্থিত করা হয় তাতে হিটলারের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর দ্বারাও এই তথ্য সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। ১৯৩৯, ২৮শে সেপ্টেম্বর এস্থোনিয়া মস্কোর চাপে মস্কোর সহিত একটি পারস্পরিক-সাহায্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে রুশিয়াকে বল্টিক সমুদ্রে নৌ-ঘাঁটী দেবার ব্যবস্থা করা হয়। ৫ই অক্টোবর লাটভিয়া রুশিয়ার সঙ্গে অনুরূপ এক চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ৩০শে নভেম্বর, রুশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে। লিথুনিয়া অধিকারের পর্ব্ব বাদে (ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর হিটলার তা মেনে নিয়েছিলো) আর সব ক'টি ঘটনাই ১৯৩৯এর আগষ্ট মাসের সোভিয়েট-নাৎসী সমঝোতা অনুযায়ী কার্য্যকরী করা হয়। এবং এই বোঝাপড়ার সর্ত্ত পালন করবার জন্যেই হিটলার বল্‌টিক্ রাজ্যসমূহের বহু বৎসরের স্থায়ী

জার্ম্মান বাসিন্দাদের জার্ম্মানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দেয়। লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান এই নির্দ্দেশ পালন করে।

১৯৪০এর ২৭শে জুন সোভিয়েট সম্প্রসারণনীতির পরবর্ত্তী অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই অধ্যায়ে রুশ সৈন্যবাহিনী রুমানিয়ায় প্রবেশ এবং বেসার্ব্বিয়া ও বুকোভিনার উত্তরাংশ দখল করে। ২১শে জুলাই লিথুয়ানিয়া লাটভিয়া এবং এস্থোনিয়াকে নিঃশেষে সোভিয়েট ইউনিয়নের কুক্ষিগত করা হয়। হিটলার সে সময়ে প্রথমে ফ্রান্স, পরে ব্রিটেনের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। জার্ম্মান বাহিনীর মুখ ছিল পশ্চিম দিকে। ষ্টালিন এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

নাৎসী পররাষ্ট্রসচিব ফন রিবেনট্রপ ১৯৪১, ২২শে জুন তারিখে বলেছিলেন, রুশিয়া কর্ত্তৃক বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলির বলশেভীকরণ ও দখলপর্ব্ব মস্কোর প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির বিপরীত আচরণ। মলটভের কথায় এর সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেছিলেন, "এস্থোনিয়া, লাটভিয়া, ও লিথুয়ানিয়ার সহিত রুশিয়ার নূতন সন্ধি-সমূহে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের সার্ব্বভৌমত্ব এবং অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি সম্পূর্ণ স্বীকৃত।" তিনি জোরের সঙ্গে এটাও জানিয়েছিলেন, "বল্‌টিক্ দেশগুলিকে বলশেভীকৃত করার যে আওয়াজ তোলা হয়েছে তা শুধু আমাদের সাধারণ শত্রু এবং সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারকদের পক্ষেই লাভজনক হতে পারে।" ১৯৩৯-এর ৩১শে অক্টোবর মলটভ এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাতে ১৯৪০-এর ২১শে জুলাই-এ বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিকে কুক্ষিগত ও বলশেভীকৃত করার পথে মলটভের গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র আটকায় নি। কিম্বা এই ঘটনা সত্ত্বেও মলটভের বলতে বাধে নি যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এসেছে।

জার্ম্মানীর পোলাণ্ড অভিযানের ফলে রুশিয়া পোলাণ্ড ও বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিতে অনেক সুবিধা আদায় করেছিলো। পশ্চিম ইউরোপে জার্ম্মান অভিযানের ফলে রুশিয়া রুমানিয়া ও বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিতে আরও সুবিধা আদায় করে। মস্কো নাৎসীদের সঙ্গে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলো কালক্ষেপণ করবার উদ্দেশ্যে নয় ভূভাগ দখল করবার উদ্দেশ্যে। লিটভিনভের পদচ্যুতি এবং ১৯৩৯-এর সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি সম্পাদিত হবার পর থেকে রুশিয়া তার সম্প্রসারণের নীতি কার্য্যকরী করতে সুরু করে। এই প্রক্রিয়া এখনও চল্‌ছে।

১৯৩৬-এর জুনে ষ্টালিন বলেছিলেন, "আমরা এক ফুট বিদেশী জমিও অধিকার করতে চাই না, তেমনি আমাদের নিজ জমি এক ইঞ্চিও আমরা ছেড়ে দিতে রাজী নই।" সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির এইটেই ছিলো মূল কথা। ষ্টালিন এমন কথা বলেন নি যে, "আমরা এক ফুট বিদেশী জমিও নেবো না, কেবল পূর্ব্ব পোলাণ্ড, বল্‌টিক্ রাষ্ট্র অথবা ফিনল্যাণ্ডের একাংশের কথা আলাদা।" তিনি মাত্র বলেছিলেন, "আমরা এক ফুট বিদেশী জমিও চাই না।" ষ্টালিনের সমর্থকদের এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করতে হবে ষ্টালিন সত্যি এই নীতিতে আস্থাবান ছিলেন, না আক্রমণে অপারগ ও দুর্ব্বল বলেই ১৯৩৬ সালে তিনি এই মত প্রচার করেছিলেন, যে মত তিনি ১৯৩৯ সালে বিসর্জ্জন দেন রুশিয়া পরের জমি দখল করার শক্তি অর্জ্জন করার পর থেকে।

বিপ্লবের পর যদিও রুশিয়া পূর্ব্ব পোলাণ্ড, বল্‌টিক্ রাষ্ট্রমণ্ডলী, ফিনল্যাণ্ড ও বেসারাবিয়া হারিয়েছিলো, ১৯২০এর পর সে আক্রান্ত হয়নি। রুশিয়া যখন উক্ত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করলে, তখনই মাত্র অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে সে আক্রান্ত হয়। যার সাহায্যে সে এই অঞ্চলগুলি পুনর্দখল করে সেই জার্ম্মানীই তাকে আক্রমণ করে।

জাগতিক ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত একটি স্বাভাবিক নিয়ম—বস্তুতঃ আজকের দিনে সম্ভবতঃ এইটেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম—এই যে, সম্প্রসারণের ক্ষুধা সম্প্রসারণের সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়। সম্প্রসারণ অধিকতর সম্প্রসারণের জন্ম দেয়। ১৯৪০-এর গ্রীষ্মকালের মধ্যে রুশিয়া এককালীন জারসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ স্থানই পুনরুদ্ধার করে। সেই সঙ্গে সে পূর্ব্ব গ্যালিসিয়া ও উত্তর বেসার্বিয়াও দখল করে। এই অঞ্চলগুলি কোনোকালেই রুশিয়ার অন্তর্গত ছিলো না। তা সত্ত্বেও দেশরক্ষাসচিব টিমোশেঙ্কো ১৯৪০-এর ৭ই নভেম্বর মস্কো থেকে ঘোষণা করলেন যে, "সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সীমান্তরেখা সম্প্রসারিত করেছে; কিন্তু যা আমরা অধিকার করেছি শুধু তাই নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারিনা।" এই নীতি অনুযায়ী রুশিয়া বলকান অঞ্চলে আরও অধিক অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে।

১৯৪০এর সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্স হিটলারের কালো বুটের গোড়ালির তলায় নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু ব্রিটেনের উপর বিদ্যুদ্গতি বিমানযুদ্ধ ভয়ঙ্কর ভাবে চলতে থাকল। আটলান্টিক সমুদ্রে ইউ-বোটের উৎপাত একটা গভীর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। ষ্টালিনের চোখে এই অবস্থাটা একটা মহাসুযোগের ক্ষণরূপে প্রতিভাত হলো। তবে জার্ম্মানী পশ্চিমে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও পূব দিক সম্পর্কেও অবহিত ছিলো। অনেক দিনের নাৎসীবিরোধী সাংবাদিক লীল্যাণ্ড ষ্টো বুখারেষ্ট থেকে ১৯৪০এর ২০শে সেপ্টেম্বর "নিউ ইয়র্ক পোষ্ট"কে এক তারে জানালেন: "রুশ গভর্ণমেণ্টের রুমানিয়ার অভ্যন্তরে আরও অধিক দূর সীমানা বিস্তারের সাম্প্রতিক মতলব বার্লিন সাফল্যের সহিত খণ্ডিত করেছে। * * * সেপ্টেম্বর মাসে বুলগেরিয়া এবং সম্ভবতঃ বুলগেরিয়ার লাগোয়া কৃষ্ণসাগরের একাংশ দখল করবার জন্যে ক্রেমলিনের আশা যে এর ফলে বিধ্বস্ত

হয়ে গিয়েছিলো তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। * * * এতে অবশ্য একথা বোঝায় না যে মস্কো বল্কান অঞ্চলে তার সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছিলো।" ১৯৪০, ১৪ই অক্টোবর তারিখে বুডাপেস্ট থেকে প্রেরিত আরেকটি তারলিপিতে ষ্টো তাঁর বুখারেস্টের মন্তব্যসমূহের সমর্থনমূলক বার্ত্তা পাঠান। তিনি লিখলেন: "ষ্টালিনের লাল ফৌজ এক্ষণে শীতাধিক্যবশতঃ বলকান থেকে সরে পড়েছে।"

এই রক্তশূন্য রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়লাভের পর হিটলার রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মলটভকে বার্লিনে আমন্ত্রণ করেন। মলটভ ১২ই নভেম্বর বার্লিনে গিয়ে উপস্থিত হন। রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁর আগমন উপলক্ষ করে যে নিউজ-রীল তোলা হয় তাতে দেখা যায়, মলটভ তাঁর গমনপথের উপর অবস্থিত প্রত্যেকটি নাৎসী অফিসারকে উদ্দেশ করে তাঁর টুপি নাড়ছেন। কিন্তু তাঁর চ্যাপ্টা মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। হিটলারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালাবার জন্যে তিনি এসেছিলেন।

সে সময়ে মুখে মুখে একটি গল্প চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, মলটভ যে কৌচে বসে হিটলারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালিয়েছিলেন নাৎসী গোয়েন্দারা তার তলায় মাইক্রোফোন বসিয়ে রেখেছিলো। গুজব, পরবর্ত্তীকালে হিটলার তুর্কী ও অন্যান্য দেশের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের ঐ মাইক্রোফোন রেকর্ডগুলি বাজিয়ে শোনায়। রুশিয়ার বিরুদ্ধে সেই সেই দেশের স্বার্থ হিটলার কিভাবে রক্ষা করেছিলো সেটা প্রতিপন্ন করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। এই রটনা হয়তো সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু নাৎসীদের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

হিটলার-মলটভ সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে হিটলার ও রিবেনট্রপ ১৯৪১এর ২২শে জুন তারিখে যে বর্ণনা দেয় তার বেশি

কিছু আমরা জানি না। হিটলার বলেছিলো : "সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব তারপর নিম্নলিখিত চারটি প্রশ্নে আমরা যে সম্মতি দিয়েছি তার যথাযথ অর্থ জানতে চাইলেন :—

"প্রথমতঃ মলটভ জিজ্ঞাসা করলেন, সোভিয়েট রুশিয়া যদি রুমানিয়া আক্রমণ করে তবে রুমানিয়াকে রক্ষা করবার যে প্রতিশ্রুতি জার্ম্মানী দিয়েছে তা কি সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হবে ?"

"আমি উত্তর দিয়েছিলাম : রুমানিয়া সম্পর্কে জার্ম্মানীর প্রতিশ্রুতি সাধারণ ভাবেই দেওয়া হয়েছিলো। সুতরাং আমাদের পক্ষে সেটা সর্ত্তহীন ভাবে পালনীয়। রুশিয়া অবশ্য কখনও আমাদের নিকট বলেনি যে বেসার্ব্বিয়া ছাড়া রুমানিয়ায় তার আরও স্বার্থ আছে।" অর্থাৎ হিটলার বলেছিলো যে রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানী রুমানিয়াকে রক্ষা করবে।

হিটলার তারপর বলছে : "মলটভের দ্বিতীয় প্রশ্ন : ফিন্‌ল্যাণ্ডের দিক থেকে পুনরায় রুশিয়ার বিপদ দেখা দিয়েছে।—ফিন্‌ল্যাণ্ডকে কোনরূপ সাহায্য না দিতে জার্ম্মানী প্রস্তুত আছে কি ?"

"আমার উত্তর : ফিন্‌ল্যাণ্ডে জার্ম্মানীর কোন প্রকার রাজনৈতিক স্বার্থ আদৌ নেই। পূর্ব্বেও ছিল না। তবে ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশিয়ার পুনরায় অস্ত্রধারণকে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট আর সহনীয় মনে করতে পারে না। বিশেষ যখন রুশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড কর্ত্তৃক বিপদাপন্ন হতে পারে একথা কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

"মলটভের তৃতীয় প্রশ্ন : রুশিয়া বুলগেরিয়ার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি এতদুদ্দেশ্যে বুলগেরিয়ায় রুশ সৈন্য প্রেরণ করে তবে জার্ম্মানী কি তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছে ? বুলগেরিয়ার রাজাকে গদীচ্যুত করার কোন অভিপ্রায়ই যে সোভিয়েটের নেই সে সম্পর্কে মলটভ স্পষ্ট কথা দিতে রাজী আছেন।

"আমার উত্তর: বুলগেরিয়া একটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র। রুমানিয়া জার্ম্মানীর কাছ থেকে যে ধরণের প্রতিশ্রুতি চেয়েছে, বুলগেরিয়াও যে রুশিয়ার কাছ থেকে সেই ধরণের কোনো প্রতিশ্রুতি চায় তা আমার জানা ছিল না।............

"মলটভের চতুর্থ প্রশ্ন: ডার্ডানেলিসের মধ্য দিয়ে সর্ব্বাবস্থায় রুশিয়া অবাধ চলাচল চায় এবং এ'বিষয়ে নিরাপত্তার জন্যে ডার্ডানেলিস ও বস্‌ফোরাস প্রণালীর উপর কতকগুলি ঘাঁটী তার চাই। জার্ম্মানীর এতে মত আছে কি নেই?

"আমার উত্তর: কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহের অনুকূলে মনরোচুক্তিনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলির সীমারেখা পরিবর্ত্তন জার্ম্মানী সব সময়েই অনুমোদন করতে রাজী। তবে রুশিয়া কর্ত্তৃক উক্ত প্রণালী-দ্বয়ের তীরবর্ত্তী ঘাঁটী অধিকারের প্রস্তাব জার্ম্মানী মেনে নিতে রাজী নয়।"

হিটলারের নির্দ্দোষ সাজ্‌বার চেষ্টা এবং তার বল্‌কান রাষ্ট্রমণ্ডলী ও ফিনল্যাণ্ডের ত্রাণকর্ত্তার ভঙ্গি কাউকেই বিভ্রান্ত করবে না। বলকানের সম্পর্কে হিটলারের নিজেরও মতলব ছিল; সুতরাং রুশিয়ার হস্তক্ষেপ তার মনঃপূত হয় নি। তবে মলটভ ও হিটলার দু'জনেই একসঙ্গে ব'সে বলকানের সমস্যা আলোচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ, হিটলারের মুখে মলটভের দাবীদাওয়াগুলির বর্ণনা লালফৌজের ১৯৪৪এর মহান বিজয়ের পর রুশিয়ার অনুসৃত নীতির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

মলটভ ১৬ই নভেম্বর মস্কোতে ফিরে আসেন। হিটলার অবিলম্বে শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী এবং রুমানিয়ার প্রতিনিধিদের তার সঙ্গে দেখা করতে এবং চক্রশক্তির পক্ষাবলম্বন করতে নির্দ্দেশ দেন। তাঁরা এই নির্দ্দেশ মান্য করেন। হাঙ্গেরী যখন আদেশ মেনে নেয়, সরকারী সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "টাস" ২২শে নভেম্বর ঘোষণা

করলে যে হাঙ্গেরী মস্কোর অনুমোদন ছাড়াই এ কাজ করেছে। মস্কোর অপছন্দটা "টাস" এ ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু হিটলার গ্রাহ্য করলে না। মুসোলিনির সপ্রশংস অভিনন্দনের (যদিও ইটালীর কাছ থেকে সামান্য সাহায্যই পাওয়া গিয়েছিল) মধ্য দিয়ে জার্ম্মানী বলকান দেশগুলিকে প্রাকারের ন্যায় গ'ড়ে তুলছিল। কিন্তু কেন?

খুব বড় একটা কিছু আসন্ন হ'য়ে উঠেছিল। এবার হিটলার ধীরে ধীরে প্রস্তুত হ'ল। ১৯৪১এর মার্চ্চের আগে পর্য্যন্ত সে বুলগেরিয়া দখল করল না। ৩রা মার্চ্চ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বুলগেরিয়া দখলকে সরকারীভাবে নিন্দা করল। মলটভের বার্লিন সফরের পর থেকে রুশিয়া ও জার্ম্মানীর মধ্যে সম্পর্কের স্পষ্টই অবনতি ঘটেছিল। এখন সে সম্পর্ক রীতিমত খারাপ হ'য়ে দাঁড়াল।

রুশিয়ার সম্মুখদ্বার বিপর্য্যস্ত করার আগে হিটলার বলকানের খিড়কি দরজায় কুলুপ লাগাচ্ছিল। কিন্তু তখনও যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস দখল করা বাকী ছিল। জার্ম্মানীর পক্ষে যুগোশ্লাভিয়া গ্রীসে যাবার সড়কস্বরূপ ছিল। এই গ্রীসে ১৯৪১এর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে নামমাত্র অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত গ্রীকবাহিনীকর্ত্তৃক মুসোলিনির সৈন্যদল লাঞ্ছিত ও পুর্য্যদস্ত হচ্ছিল।

১৯৪১এর মার্চ্চের শেষাশেষি হিটলার তার সুপরিচিত পেষণ-ও-ভীতিপ্রদর্শনের প্রক্রিয়া প্রয়োগ ক'রে যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টকে চক্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করল। বেলগ্রেডের প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজকীয় দল এতে আপত্তি করল না। কিন্তু জনগণ আপত্তি জানাল। সামরিক মহলও আপত্তি করল। দু'দলে মিলে তারা বিদ্রোহ করল এবং মন্ত্রিসভাকে আসনচ্যুত করল। এই মন্ত্রিসভাই হিটলারের চুক্তিপত্রে অন্ধভাবে সই করেছিল। সরকারী মার্কিণ ভাষ্য অনুসারে, এই আকস্মিক নাটকীয় ঘটনার পেছনে ব্রিটিশের হাত ছিল। নাৎসীরা বললে, সোভিয়েটই এটা করিয়েছে। ব্রিটেন ও রুশিয়া

যুগোশ্লাভিয়াকে জার্ম্মানীর পক্ষে একটা মস্তবড় প্রতিবন্ধকরূপে খাড়া করে তুলতে চেয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্কটের সাহায্যে ব্রিটিশ সুয়েজ খাল ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করছিল ; আর রুশিরা রক্ষা করছিল মস্কোকে।

২৭শে মার্চ্চ জেনারেল ডুসান সিমোভিচ্-পরিচালিত এক নূতন চক্রশক্তিবিরোধী গভর্ণমেণ্ট যুগোশ্লাভিয়ায় ক্ষমতা কারায়ত্ত করল এবং জার্ম্মান বাহিনীর সঙ্গে লড়াই সুরু করল। ৫ই এপ্রিল সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই নূতন যুগোশ্লাভ মন্ত্রিসভার সঙ্গে এক মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করলে। এটা হিটলারের প্রকাশ্য বিরুদ্ধতার সমতুল্য কাজ।

৯ই এপ্রিল তারিখে রুশিয়ার সৈন্যবাহিনীর কাগজ "রেড ষ্টার" যুগোশ্লাভিয়ায় জার্ম্মান সৈন্যদলের অসুবিধার কথা বর্ণনা ক'রে সেই সঙ্গে যুগোশ্লাভদের সনাতন সামরিক গুণাবলীর উল্লেখ করলে। কাগজটি আরও লিখলে, "জেনারেল স্যার অর্চিবল্ড ওয়াভেল পরিচালিত ব্রিটিশ সামরিক বিভাগ মিত্রপক্ষকে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে।"

ক্রেমলিন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভ ও গ্রীক প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা এবং এই উভয় দেশের প্রতি ব্রিটেনের সহায়তা আশা করছিল।

যুদ্ধ অথবা শান্তি—এই ছিল রুশিয়ার পক্ষে বলকানের লড়াইএর অর্থ। গ্রীসের প্রতিরোধ চূর্ণ করে জার্ম্মান বাহিনী একই অভিমুখে অগ্রসর হ'য়ে ক্রীট, মিশর, সীরিয়া, ইরাক এবং ভারতে অভিযান করবে এইরূপ সম্ভাবনা ছিল। জার্ম্মান সেনাপতিদের মধ্যে অনেকেই এই রণনীতির পোষকতা করেছিল। রুশিয়া সেইক্ষেত্রে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হ'তো।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে রসিদ আলি ইরাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তার পরের মাসে ভিসি কর্তৃপক্ষ সীরিয়াস্থিত ফরাসী

বিমান ঘাঁটীগুলি জার্ম্মানদের ব্যবহার করবার অনুমতি দিলেন। আলেপ্পোর একটি বিমানঘাঁটী নাৎসীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সীরিয়া থেকে জার্ম্মানরা রসিদ আলিকে জোগান দিতে লাগল। ইতিমধ্যে ইটালী ও জার্ম্মানীর সম্মিলিত বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিল।

হিটলার কি ভারতবর্ষে অভিযান করবে, জাপানীদের সঙ্গে মিলিত হবে? ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর সরাসরি আক্রমণে ব্যর্থ হ'লে হিটলার কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানতে চেষ্টা করবে? জার্ম্মানীর মনোযোগ সোভিয়েট অঞ্চল থেকে কি অন্যত্র সরে যাবে?

রুশদের এ সব প্রত্যাশা কার্য্যকরী হলো না। হিটলার যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল এবং এপ্রিলের শেষাশেষি এই উভয় দেশই জয় করল। শীঘ্রই বলকান থেকে রুশ-সীমান্তে জার্ম্মান সৈন্য স্থানান্তরকরণের সংবাদে ও গুজবে ইউরোপের আকাশবাতাস ভরে উঠ্ল। জার্ম্মান বাহিনী ফিন্ল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হ'ল।

মস্কো শঙ্কিত হ'ল। ষ্টালিন তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ক্ষিপ্রতা ও উদ্যমের সহিত ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হ'লেন। এই দুটি গুণই তাঁর শক্তি ও প্রাধান্যের উৎস। ৬ই মে তিনি মলটভকে অপসারিত ক'রে নিজে Council of People's Commissarsএর সভাপতি অর্থাৎ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার বা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন। ষ্টালিনের বয়স তখন বাষট্টি।

১৯৪১, ৮ই মে তারিখে এক পত্রে সরকারী পররাষ্ট্রসচিব সাম্নার ওয়েল্স্কে আমি লিখি, "হিটলার যদি রুশিয়া আক্রমণ করে, অথবা জার্ম্মানীর যুদ্ধপরিচালনার উদ্দেশ্যে অধিকতর পণ্যের যোগান দেবার জন্যে রুশিয়ার উপর নাৎসীরা চাপ দেয়, তা হ'লে তার দ্বারা ১৯৩৯এর ২৩শে আগষ্টের চুক্তিগত তোষণনীতির নিঃশেষ ব্যর্থতাই প্রমাণিত

হবে। যুদ্ধ যদি বাধে, কিম্বা ঘটনার দ্বারা সোভিয়েটের সাম্প্রতিক কূটনীতির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রে ষ্টালিন নিজ হস্তে সমস্ত ক্ষমতা ও সরকারী পদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অভিলাষী হবেন। অন্য কারও হাতে এই ক্ষমতা থাকে এটা তিনি চাইবেন না।" সঙ্কটকালে গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ আসনে মলটভের ন্যায় একজন ক্রীড়নক অধিষ্ঠিত থাকলে বিপদ দেখা দিতে পারে। সেইজন্য ষ্টালিন নিজেই সেই আসনের ভার গ্রহণ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ষ্টালিন তাঁর সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু তিনি তখনও হিটলারতোষণের এবং হিটলারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার গতি ব্রিটিশ অধিকৃত প্রাচ্য অঞ্চলের দিকে ফেরাবার আশা ত্যাগ করেন নি। ক্রেমলিনের মনোভাব অকস্মাৎ বিরুদ্ধাচরণ থেকে আপোষকরণে রূপান্তরিত হ'লো। ৯ই মে তারিখে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নরওয়ে ও বেলজিয়ম গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করল এবং মস্কোয় এই দুই দেশের যে কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিল তাদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হরণ করল। নরওয়ে ও বেলজিয়ম বৎসরকাল যাবৎ হিটলারের কুক্ষিগত হ'য়ে ছিল। তা সত্ত্বেও ক্রেমলিন তাদের রাষ্ট্রদূতদের স্বীকার ক'রে আস্‌ছিল। এক্ষণে সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হ'লো। শুধু তাই নয়, যে যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টের সহিত মাত্র একমাস পূর্ব্বে সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল সেই যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টকেও সে স্বীকৃতি দানে বিরত হ'লো। তা' ছাড়া, হিটলারের মনোরঞ্জনের বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সোভিয়েট ইরাকে ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহী রসিদ আলীকে স্বীকার করলো।

ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

চমকপ্রদ সংবাদের আতিশয্যে বিহ্বল পৃথিবী আর একটি অভাবনীয় চাঞ্চল্যকর সংবাদে সহসা চমকিত হ'য়ে উঠ্‌ল। হিটলারের সহকারী রুডলফ হেস্‌ বিমানযোগে স্কটল্যাণ্ডে গিয়েছিলো। ১০ই মে

সে প্যারাসুটযোগে ডিউক অব্ হ্যামিল্টনের বিরাট জমিদারীর সন্নিকটস্থ এক জায়গায় অবতরণ করলে। এক স্কট চাষী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। পরে সে তার কাস্তে ঘুরিয়ে দুই নম্বর নাৎসীপ্রধানকে গ্রেপ্তার করলে।

কয়েক মাস পরে লণ্ডনে পররাষ্ট্রসচিব এন্থনী ইডেন, স্বরাষ্ট্রসচিব হার্ব্বার্ট মরিসন, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেণ্ট এট্লী, শ্রমিক নায়ক ও গ্রন্থকার অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমি হেসরহস্য নিয়ে আলোচনা করি। নিম্নে ইডেনের সহিত আমার আলোচনার প্রতিলিপি দেওয়া হ'লো :—

ইডেন—"আমরা প্রত্যাসন্ন জার্ম্মান অভিযান ঘট্বার তিন সপ্তাহ আগেই রুশদের সেকথা জানিয়েছিলাম।"

আমি : "নিশ্চয়ই তারা সেখবর তারও আগে জান্ত। হেস যখন বিমানযোগে স্কটল্যাণ্ডে আসে, তখনই তারা জার্ম্মান আক্রমণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছিল।"

ইডেন : "কেন একথা বল্ছেন ?"

আমি : "হেস ১০ই মে স্কটল্যাণ্ডে যায়। ২২শে জুনের অভিযানের প্রস্তুতি ততদিনে নিশ্চয়ই আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছিল। ছয় সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে এইরূপ আয়োজন কেউ করতে পারে না।"

ইডেন : "আপনি কি মনে করেন হেস রুশিয়া অভিযানের বিরোধী ছিল ?"

আমি : "না, আমি তা' মনে করি না। তবে সে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধপ্রত্যাহার আশা করেছিল।"

এ'কথার পর ইডেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বুঝ্লাম, ঠিক জায়গাতেই পেরেক ঠুকেছি।

যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি তাতে সংশয় প্রকাশের কোন অবকাশই আর নেই। হেস্ সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর

আসন্ন অভিযানের খবর জানত। হিট্‌লারের আত্মচরিত—যা লিখতে হেস্ হিটলারকে সাহায্য করেছিল—মোটেই ব্রিটিশবিরোধী নয়। এ'বইতে হিটলার জার্ম্মানীর ইউক্রেণ দখলের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছে এবং যাতে সেই সম্পদশালী অঞ্চল জার্ম্মানীর করায়ত্ব হয় তদুদ্দেশ্যে ব্রিটেনের সঙ্গে একটা আপোষরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছে। জার্ম্মানী যখন রুশিয়া আক্রমণ করতে উদ্যত, সেই সময় নাৎসীরা ব্রিটেনের সঙ্গে একটা সন্ধি-ব্যবস্থা বলবৎ করতে অগ্রসর হবে, তৎকালে এর চাইতে স্বাভাবিক কার্য্যক্রম আর কী হতে পারতো?

হেসের স্বভাবে আবেগের তাড়না প্রবল। সে ভেবেছিল, ব্রিটেনের জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ঢের হয়েছে; ব্রিটেন আর যুদ্ধ করতে চাইবে না। কিন্তু একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রের কোন লোকই গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া বুঝতে পারে না। আপোষকামী যে সকল ব্রিটিশ লর্ড যুদ্ধের পূর্ব্বে হেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, হেস এখনও তাঁদের কথা মনে করে রেখেছিল। তার ধারণা ছিল, উক্ত লর্ডদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। হেস জানতো না যে জার্ম্মানীর সহিত আপোষের আগ্রহ যুদ্ধকালে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, ইংরাজদের আসন্ন রুশবিরোধী অভিযোগের কথা বলে সে আপোষকামিতার মনোভাবকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে। কিন্তু তার হিসেবে ভুল হয়েছিলো। চার্চ্চিল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি তখুনি ষ্টালিনের কাছে পৌঁছে দিলেন। আর হেস ব্রিটিশ জেলে পচতে লাগলো।

চার্চ্চিলের টেলীগ্রাম ছাড়াও নাৎসী-অভিযান সম্পর্কে অন্যান্য জলজ্যান্ত অগ্রিম প্রমাণ ষ্টালিনের হাতে ছিল। ২১শে এপ্রিল থেকে ২১শে জুনের মধ্যে জার্ম্মানে বিমানবহর মোট ১৮১ বার সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করে এবং কোন কোন বিমান প্রায় ৪০০ মাইল ভিতরে ঢুকে ফোটো গ্রহণ করে। সহকারী পররাষ্ট্রসচিব সোলোমন

এ লোজোভ্‌স্কি ২৮শে জুন মস্কোর সংবাদদাতাদের এ সংবাদ জানান। এত সব সত্বেও রুশিয়া নাৎসী আক্রমণের জন্যে মনের দিক থেকে প্রস্তুত ছিল না।

আমেরিকার নবনিযুক্ত সোভিয়েট রাজদূত ম্যাক্সিম লিটভিনভ্‌ ওয়াশিংটনে তাঁর কার্য্যভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমানভ্রমণকালে হনলুলুতে অবতরণ করেন। সেটা ছিল পার্ল হার্ব্বারের উপর জাপ আক্রমণের আগের আগের দিন। মার্কিণ স্থল ও নৌবিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদের প্রদত্ত ভোজসভায় তিনি তাঁদের কাছে রুশিয়ায় নাৎসী-আক্রমণের অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ কোন দেশ সহসা বিশ্বাস করতে পারে না যে সে শীঘ্র আক্রান্ত হতে পারে, কাজেই আক্রমণকালে তার অপ্রস্তুত ভাব থেকেই যায়। ঠিক তার পরই তিনি বলেন যে, হয়তো জাপানীরাও যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের মতলব আঁটছে: তারা হয়তো প্রথমে হনলুলুতে আঘাত হান্‌বে। লিটভিনভ্‌ মার্কিণ কর্ম্মচারীদের দিবারাত্র সতর্ক থাকবার পরামর্শ দিলেন। রুশিয়ার "পার্ল হার্ব্বার" থেকে তিনি এই জ্ঞানই লাভ করেছিলেন।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন ভোর চারটায় নাৎসীরা কোনরূপ পূর্ব্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রুশিয়ার প্রতি আঘাত হেনেছিল। প্রথম দিনেই সোভিয়েটের এক হাজার বিমান নষ্ট হয়। তাদের অধিকাংশই ভূমিসংলগ্ন ছিল। ১৯৪১এর ডিসেম্বরে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিশেষ দূত হিসাবে রুশিয়া-পরিভ্রমণের পর হ্যারি হপ্‌কিন্স "আমেরিকান ম্যাগাজিনে" লিখেছিলেন যে, রুশিয়া আক্রমণকালে হিটলার ষ্টালিনকে কোন খবরই দেয়নি, এমন কি একটি ইঙ্গিত পর্য্যন্ত না।

হিটলার রুশিয়ার উপর কোন দাবীদাওয়া জানায়নি। দাবী-দাওয়াকে সতর্কতার ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করা যেতে পারতো। হিটলার রুশিয়ার কাছ থেকে কোন কিছু চায়নি। সে রুশিয়াকেই চেয়েছিল।

হপকিন্স লিখলেন, "মস্কোয় ক্রেমলিন প্রাসাদে এই আকস্মিক আক্রমণ হিটলারের বিরুদ্ধে এমন একটা ঘৃণার তরঙ্গ সৃষ্টি করলো, জার্ম্মাণ চ্যান্সেলরের মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায়েই যাকে প্রশমিত করা যাবে না। * * মস্কোর চেয়ে এই আক্রমণ তার এককালীন সহযোগীর বিশ্বাসঘাতকতারূপে প্রতিভাত হলো। সহযোগী অকস্মাৎ ঘৃণ্য সারমেয়ের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো।"

"অকস্মাৎ"ই বটে।

হপ্‌কিন্স হিটলার সম্পর্কে ষ্টালিনের নৈরাশ্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ষ্টালিন হপ্‌কিন্সকে বলেন, "আমরা একদা এই লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম।" হপ্‌কিন্স তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন, "ষ্টালিন আমাকে বলেন যে জার্ম্মানীর সহিত সম্পর্কের প্রশ্নে তিনি সহজ পথ অনুসরণ করতেই চেয়েছিলেন, কোন বাঁকা পথের আশ্রয় লওয়ার মতলব তাঁর ছিল না।" সোভিয়েট কখনও জার্ম্মানীকে আক্রমণ করতো না।

ষ্টালিন শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন যে হিটলার নাৎসী-সোভিয়েট চুক্তির সর্ত্তাবলীর প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ থাক্‌বে, সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে চাইবে। এই কারণেই তিনি হিটলারের পোষকতা করার নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, হিটলার তাঁর আত্মচরিত "Mein Kampf" এবং হেসের নীতির প্রতিই অনুরক্ত এবং রুশিয়াকে ধ্বংস করাই তার অভিপ্রায়।

ভবিষ্যদ্বাণী

সত্ত অতীতের ঘটনাবলীর ধারা অনুধাবন করতে আমার ভারী অদ্ভুত লাগে। একই ঘটনা সময়ের ব্যবধানে কেমন অন্যরকম মনে হয়। ৮ই ডিসেম্বরের সকালে পার্ল হার্ব্বারের ঘটনা ছিল এক জিনিষ। তখন প্রত্যেক আমেরিকাবাসীরই মনে হয়েছিল, সে হঠাৎ পা হড়কে প'ড়ে গেছে, প'ড়ে গিয়ে শক্ত বাঁধানো রাস্তার শানে তার মাথা ফেটে গেছে। কিন্তু কয়েক বৎসরের ব্যবধানে পার্ল হার্ব্বারকে মনে করলেই অন্য অনুভূতি জাগে—সে অনুভূতি গর্ব্বের। পার্ল হার্ব্বারের পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর জন্যে গর্ব্ব।

মলটভ, হিটলার, লিণ্ডবার্গ, ষ্টালিন, রুজভেল্ট এবং অন্যান্যদের বক্তৃতা প'ড়ে কয়েক বৎসর আগে আমার মনে এক রকমের ধারণা হয়েছিল। সেই একই বক্তৃতা আজকে প'ড়ে দেখছি, আমার ধারণা বদ্‌লেছে। কারণ, যাঁরা এইসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বক্তৃতাকালে বক্তৃতাগুলির তাৎপর্য্য, তাঁদের যতদূর বুঝতে পারবার কথা, আজকে আমি তার চাইতেও সেসব ভালো বুঝছি। তাঁদের কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করবার মতো অজস্র ঘটনার উপকরণ এই কয় বৎসরে আমার হাতে জমেছে।

ইতিহাস বরাবরই আমাদের পরিপ্রেক্ষণ বা দৃষ্টিক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের ইতিহাস এমন সব ঘটনায় কেন্দ্রায়িত যারা ফুরিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে, যদিও তাদের প্রভাব এখনও আমাদের জীবন থেকে মিলিয়ে যায়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার যুদ্ধ, অথবা প্রেসিডেণ্ট ক্লীভল্যাণ্ডের শাসনকালের উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। এই দুটি ঘটনার বৃত্ত পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু দু'তিন বৎসর আগে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাদের পরিক্রমণ

এখনও শেষ হয়নি। যথা, V-E দিবস (বিজয় দিবস) সত্বেও ইউরোপের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। এর রাজনৈতিক ফলাফল আমাদের অজ্ঞাত। হিটলার চ'লে গেছে, কিন্তু জার্ম্মানী কোন্‌দিকে যাচ্ছে ? অতীতের তাৎপর্য্য কি ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হবে না ?

নীতিনির্দ্ধারণকালে প্রায়ই রাজনীতিক তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের ক্ষমতার উপরে মূলতঃ নির্ভর করেন। কতকগুলি ঘটনা এইভাবে ঘট্‌বে কি ঘটবে না তিনি অনুমান ক'রে নেন এবং ধ'রে নেন যে, যে সমস্ত ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করতে যাচ্ছেন তাতে সেইসব ঘটনার যথাযথ প্রতিকার হবে। লোকে বলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কিছুই জোর করে বলার উপায় নেই শুধু তার অনৈশ্চিত্য ছাড়া। কিন্তু সময়ে সময়ে ভবিষ্যতের গতিও নিশ্চিত অনুমান করা যায়। ১৯৪০-এ ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্টের পক্ষে ব্রিটেনের ভাগ্য অনুমান করা সম্ভব ছিল না বটে, কিন্তু এবিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে মার্কিণ সাহায্যেব ফলে ব্রিটেনের ভাগ্য—এবং সেই সঙ্গে আমেরিকারও ভাগ্য, উন্নততর হবে। এই যেখানে অবস্থা সেখানে রাষ্ট্রের নীতি-নির্ণায়কের পক্ষে নীতি নির্ণয় কবা এমন কিছু অসম্ভব কার্য্য নয়, যদি তাঁর পেছনে গণসমর্থন থাকে।

ভবিষ্যতের গর্ভে অতীত সর্ব্বদাই কিয়ৎপরিমাণে প্রচ্ছন্ন থাকে। এই ভবিষ্যৎকালীন অতীতেব উপর নির্ভর করেই ভবিষ্যতের গতি অনুমান করা হয়, নীতি স্থির করা হয়। যে ভবিষ্যদ্বাণীর সবটাই আন্দাজ, সবটাই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া—যেমন মামুলী ভবিষ্যদ্বাণী—সৃজনধর্ম্মী নয় বলে সেটা মূল্যহীন। যে ভবিষ্যদ্বাণী অজ্ঞাতকে অনুমান করবার জন্যে জ্ঞাত বস্তু বা ঘটনার বিশ্লেষণ করতে হয় সেইটেই আদত জিনিষ। এইরূপ ভবিষ্যৎকথনের বেলায় অতীতের সমস্ত জ্ঞাত ।তথ্যকে একত্র সন্নিবেশ করা হয়। এর থেকেই অজ্ঞাত রহস্যের আকার ক্রমপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শুধু যে মোটামুটি আকারটাই

ধরা পড়ে তাই নয়, এই অদৃশ্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অনুধাবন করে এমন কথাও আপনার পক্ষে বলা অসম্ভব নয় যে, পোষাকটার শূন্য অংশে এখানে একটা বোতাম হবে, ওখানে একটা লাল আস্তিন চাই। অর্থাৎ গোটা পোষাকটার চেহারাই আপনার চোখে ভাস্‌বে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাজধানীতে রাজনীতিক ও সাংবাদিকরা রাজনৈতিক ধাঁধাঁসমূহের সমাধানে সতত নিয়োজিত।

যুদ্ধের সময় সবারই মুখে ছিল এক কথা ঃ যুদ্ধ কবে শেষ হবে ? আনাড়ী অথবা বোকাই কেবলমাত্র এই প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করত। কারণ অজস্র অজ্ঞাত সম্ভাবনা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত থাকায় উত্তর দেওয়া সহজ ছিল না। অনেকগুলি রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই অস্বচ্ছ ছিল যে তাদের ভিত্তিতে ঘটনার বিশ্লেষণ কিম্বা যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কয়েকটি ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণী করবার মতো।

আমরা সবাই ভবিষ্যদ্বাণী করি। হয় সেসব ভাবীকথন নিজেরা নিজেদের শুনাই, নয়তো অপরকে শুনাই। এর ভিতরে যেগুলি সত্য প্রতিপন্ন হয় তাদের নিয়ে আমরা জাঁক করি, আর যেগুলি মিথ্যে হয় তাদের আমরা ভুলে যাই।

১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে রহস্যময় জাপান ও রুশিয়া মার্কিণ পর্য্যবেক্ষকদের সচকিত করে তুলেছিল। টোকিও ও মস্কোর ভবিষ্যৎ নীতি কোন আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হচ্ছে ওয়াশিংটনের পক্ষে তার হদিস জানা দরকার হয়ে পড়েছিল। ষ্টালিনকে হিটলারের কাছ থেকে বিশ্লিষ্ট করবার আশায় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট সঙ্গতভাবেই রুশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতিসাধন করতে চেয়েছিল। ফিনিস সহরগুলির উপর সোভিয়েট বিমান আক্রমণের দরুণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৯৩৯ সনের ২রা ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে নীতিগত বাধা আরোপ করেছিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসরেরও অধিককাল পরে, ১৯৪১এর

২১শে জানুয়ারী, সহকারী পররাষ্ট্রসচিব সাম্‌নার ওয়েল্‌স্ সোভিয়েট রাজদূত কনষ্টাইণ্টাইন ঔমানস্কিকে জানালেন যে, উক্ত নিষেধবাধা তুলে নেওয়া হয়েছে। এটাকে আপতদৃষ্টিতে একটা সামান্য ব্যবস্থা বলে মনে হতে পারে, কেননা এই ব্যবস্থার ফলে কতিপয় মার্কিণ ব্যবসায়ীর সোভিয়েট ইউনিয়নে রপ্তানীর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, কাজটা হয়তো ঠিক হলো না। এ সম্পর্কে কয়েকটি কাগজের মন্তব্য পড়ে আমি বুঝেছি, এর তাৎপর্য্য তারা ঠিক ধরতে পারেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৪১ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখের "নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্"-এ আর্থার ক্রক্ লিখলেন যে, "এই ব্যাপারে নতুন করে প্রমাণ হলো যে ওয়াশিংটন সরকার ব্রিটেনকে সাহায্যদানের সর্ব্বাত্মক নীতি কার্য্যকরী করতে গিয়ে যেমন আটলান্টিক রণাঙ্গণের কথা ভাবছে, তেমনি দূর প্রাচ্যের পশ্চাদ্ভাগের দিকেও চোখ রাখছে। বাস্তববাদী মাত্রই এই ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানাবে...।" আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, এই ব্যবস্থার দ্বারা ওয়াশিংটন তার দূরপ্রাচ্যের অবস্থাকে ভীষণ বিপদের মধ্যে নিয়ে ফেলছে। সুতরাং সামনার ওয়েল্‌স্‌কে আমি আমার মতামত জানাবো স্থির করলাম। সামনার ওয়েল্‌স্‌কে আমি কখনও দেখিনি বা তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করিনি। এই চিঠি পেয়ে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে তা আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তবু লিখে দেখতে দোষ কি?

তদনুযায়ী আমি নিম্নলিখিত চিঠিখানা তাঁকে লিখলাম—

মিঃ সামনার ওয়েল্‌স্
সহকারী রাষ্ট্রসচিব, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪১
ওয়াশিংটন

প্রিয় মিঃ ওয়েলস্,

আমি একজন মার্কিণ সাংবাদিক, চৌদ্দ বৎসর মস্কোয় ছিলাম।

সোভিয়েট বৈদেশিক সম্পর্কের ইতিহাসের উপর লেখা আমার একটি বই আছে। বইটি দুইখণ্ডে সমাপ্ত। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নে কয়েকটি পণ্যের রপ্তানীর উপর থেকে নৈতিক নিষেধবাধা প্রত্যাহার করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে সে সম্পর্কে এই চিঠিতে আমি কিছু বলতে চাই।

আমার মনে হয় উক্ত সিদ্ধান্ত অনুচিত হয়েছে। কেন না এর ফল আমেরিকার স্বার্থের পক্ষে হানিকর হতে পারে। এতে রুশ-জাপান সম্পর্কের উন্নতি সহজেই সংঘটিত হওয়া সম্ভব।

আমার এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ—পশ্চিম সীমান্তে জার্ম্মানীর চাপ ও পূর্ব্ব সীমান্তে যুগপৎ জাপানের চাপের দরুণই রুশিয়ার বর্ত্তমান বিপত্তি দেখা দিয়েছে। তার আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্কটও এই জন্য। রুশিয়ার জার্ম্মানীর সঙ্গে পেরে ওঠবার মতো কিম্বা জার্ম্মানীর সঙ্গে শত্রুতাসাধন করবার মতো সামর্থ্যের একান্ত অভাব। কিন্তু যদি সে জাপানকে দুর্ব্বল করতে কি তার মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে পারে তাহলে তার অবস্থার উন্নতি হবে। তদনুপাতে জার্ম্মানীর ভয়ও তার অনেকটা কমে আসবে।

চীনের সশস্ত্র প্রতিরোধকে সাহায্য করে রুশিয়া জাপানকে হীনবল করতে পারে। সে তা করেওছে। কিন্তু তাতে অনেক খরচ।

রুশিয়ার উপর জাপানের চাপ লঘু করবার এর চাইতেও সহজ পথ আছে। সে পথ হচ্ছে, মস্কোর পক্ষে জাপানী সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টাকে দক্ষিণ দিকে শ্যাম এবং ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখী করবার চেষ্টা করা। এতে জার্ম্মানীরও লাভ হবে। চীনের যুদ্ধে জাপান বড়ো রকমের জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু তাতে হিটলারের আশু কোন উপকার হবে না। কিন্তু চীনযুদ্ধের সমাপ্তি হিটলারের সহায়ক হবে। কেননা সেইক্ষেত্রে জাপান তার দক্ষিণে সেই সমস্ত অঞ্চলের দিকে মনোযোগ দিতে পারবে যেখান থেকে

আমরা এবং ইংরেজরা অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে থাকি। বলশেভিকরা আশা করবে, দক্ষিণ সমুদ্রে তৎপরতার ফলে জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, ফলে জাপানের শক্তি ক্ষয় হবে।

রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তি টৌকিওর নিকট গুরুত্বপূর্ণ আরও এইজন্য যে আমরা চিয়াংকে সাহায্য করছি। আমেরিকা ও রুশিয়া কর্ত্তৃক চিয়াংকে সাহায্য জাপানের বিপর্য্যয়ের কারণ হতে পারে। রুশিয়া যদি চিয়াংকে অধিকতর সাহায্যদানে বিরত থাকে, তা হলে আমাদের প্রদত্ত সাহায্য খুব বেশি ফলপ্রদ হবে না। তেমনি, যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়ার মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির আভাস জাপান ও রুশিয়ার মধ্যে বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে। আমাদের সঙ্গে রুশিয়ার মৈত্রীর সম্ভাবনায় জাপান রুশিয়াকে প্রসন্ন করতে অধিকতর চেষ্টিত হবে। আমরা যদি হিটলারের সহিত রুশিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ করাতে পারতাম, তা হলে কোন কিছুই বল্‌বার থাক্‌তো না। কিন্তু বহিশক্তি-কর্ত্তৃক রুশিয়ার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এত বেশি এবং প্রকাশ্য ও সক্রিয় হিট্‌লারবিরোধী যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সে রুশিয়া এতই সন্দিগ্ধ যে তাকে দিয়ে ঐ পথ গ্রহণ করানো অসম্ভব কাজেই, মস্কোর প্রতি আমাদের অধিক বন্ধুতাপূর্ণ মনোভাবের ফল শুধু এই হতে পারে যে তাতে করে জাপান ভীতিগ্রস্ত হয়ে রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে প্রণোদিত হবে।

ঔমান্‌স্কিকে আমি দশ বৎসর ধরে ভালো করে জানি। আমেরিকা কর্ত্তৃক রুশিয়ার উপর থেকে নীতিগত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঔমান্‌স্কির পক্ষে চরম বিজয়স্বরূপ। এই কারণেই সম্ভবতঃ তিনি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সপক্ষে এতো জোর ওকালতি করেছেন। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে লণ্ডন ও প্যারিস রুশিয়ার প্রতি যে সকল সদিচ্ছা ও সুযোগদানের মনোভাব প্রদর্শন করেছিল রুশরা কি

ভাবে তাদের প্রত্যেকটিকে হিট্‌লারের সঙ্গে দর কষাকষির অনুকূলে প্রয়োগ করেছিল, আপনার অবশ্যই সেকথা স্মরণ আছে। আমাদের ও মস্কোর মধ্যে সমঝোতার সাম্প্রতিক চেষ্টার বিরুদ্ধে আমার আসল আপত্তির কারণ এইখানে। মস্কো এই সমঝোতার নজীর দেখিয়ে অতি সহজেই জাপানকে তাদের সঙ্গে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য করাতে পারে, যার ফলে জাপানী অভিযানের গতি দক্ষিণ অভিমুখে প্রণালীবদ্ধ হবে, চিয়াংএর অবস্থা খারাপ হবে এবং চীনে রুশিয়ার অনুকূলে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত অঞ্চল সৃষ্টি হবে। এর দ্বারা ঠিক পোল্যাণ্ডের ধরণে চীন বিভক্ত হবে—তবে হিট্‌লারের কবল তখনও ষ্টালিনকে মুক্ত করা যাবে না এই যা'।

যাক্ পত্র ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। সুতরাং এইখানেই ইতি দেওয়া দরকার। আশা করি আমি আপনাকে আমার মনোগত ভাব বোঝাতে পেরেছি।

আপনার সঙ্গে এ সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করতে পারলে আমি সুখী হবো। অবশ্য সেজন্যে আমি এই চিঠি লিখি নি। তবে শীঘ্রই ভ্রমণকালীন বক্তৃতাদানের উপলক্ষে আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হবে। সেই সুযোগে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। অবশ্য সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে আলোচিত বিষয় আমি কাগজে ছাপবো না বা তার কোন অংশ প্রকাশ করবো না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সফরতালিকা অনুযায়ী আমার হাতে মাত্র ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখটি আছে, তাও মাত্র সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বেলা ১১-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত। এই সময়ে আপনার পক্ষে দেখা করা কি সম্ভব হবে? তা যদি না হয় আমি সফরকার্য্য স্থগিত রেখে ১১ই ফেব্রুয়ারী ওয়াশিংটন পৌঁছুতে পারি। কিন্তু ৩রা ফেব্রুয়ারীই আমার পক্ষে সুবিধে। আশা করি প্রার্থিত দিনক্ষণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করতে পারবো।

*

আমার বলবার পক্ষে বলতে যদি বাধা না থাকে, তা হলে বলবো আমি চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। আমি যখন চিঠিটি লিখি, রুশ-জাপান চুক্তির কোন কথাই তখন ওঠেনি। ব্রিটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর জাপানের আক্রমণ সম্ভাবনাও তখন অত্যন্ত দূরবর্ত্তী ছিল। ১৯৪১, ১৩ই এপ্রিল সোভিয়েট ও জাপান গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ বৎসরের জন্য এক পক্ষ অপরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে এক সুদূরপ্রসারী চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো। তার থেকেই সিঙ্গাপুর, মালয় ও হাওয়াইয়ের উপর জাপানের আক্রমণের সূত্রপাত।

সাম্‌নার ওয়েল্‌স্ ৩০শে জানুয়ারী আমার চিঠির উত্তর দিলেন এবং লিখলেন আমি ৩রা অথবা ১১ই যে কোন তারিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি। ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁর সঙ্গে আলোচনায় অধিক সময় পাওয়া যাবে মনে করে আমি ৯ তারিখে দেখা করবো স্থির করলাম। হোয়াইট হাউসের অনতিদূরে রাস্তার ওপাশে রাষ্ট্রীয় ভবনে তাঁর স্বীয় দপ্তরখানায় তিনি আমাকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

সাম্‌নার ওয়েল্‌স্ বেশ দীর্ঘাকৃতি ও ঋজুদেহ। ছিপের মতো সোজা তাঁর দেহের গড়ন। তাঁর কাঁধ চওড়া, শরীর মজবুত। পোষাকে কোন খুঁত নেই। তাঁর মাথা লম্বা ধরণের, তাতে বৈশিষ্ট্য আছে। নিবিড়-গম্ভীর গলায় তিনি কথা বলেন। কূটনীতিগত বাক্‌সংযমের প্রয়োজনে তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোটখাটো কথা তিনি একেবারেই বলতে অপটু দেখা গেলো, কিন্তু মননপ্রধান আলোচনা তিনি ভালোবাসেন এবং যখন এ-সম্পর্কিত কোন কথা বলেন, তখন সমস্যার আমূল বিচারের আগ্রহে তিনি তাঁর

স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যকেও ছাড়িয়ে ওঠেন। তিনি যদি বোঝেন যে তাঁর মনোভাব কেউ হৃদয়ঙ্গম করছে, তা হলে তিনি খুব খোলাখুলি আলোচনা করতে পারেন। তাঁর মস্তিষ্কে চিন্তাধারা একটুও জট পাকায় না; আর তার স্মৃতিশক্তি তো অসাধারণ। তাঁর আচরণ ঔদ্ধত্যহীন, যদিও তাঁর প্রতি সহানুভূতিশূন্য মানুষের চোখে তিনি ভিন্নরূপ মনে হতে পারেন। নিজের রচনা সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত বিনয়।

তাঁর সঙ্গে এই সর্ব্বপ্রথম আলোচনার জন্য আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকলাম, একটি পরিচ্ছন্ন, চওড়া ডেস্কের ওপাশ থেকে তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং জানালার পাশে আমাকে বসতে বললেন, তিনি আমাকে বেশ কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে নিলেন, তারপরেই একটা সিগারেট বার করে সোনার সিগারেট কেসটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। সাম্‌নার ওয়েল্‌স্ বললেন, "মিঃ ফিসার, আমি অত্যন্ত উৎসুক চিত্তে আপনার চিঠিখানা পড়েছি।" তারপরই প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিঠির বিষয়বস্তুর একেবারে মর্ম্মমূলে গিয়ে পৌঁছলেন। স্টেট ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমার হোটেলে পৌঁছেই আমি আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে ফেললাম। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গে আলোচিত বিষয় ডায়েরীর আকারে লিপিবদ্ধ করে রাখার আমার একটা অভ্যাস জন্মে গেছে। সাধারণতঃ আমি সাক্ষাৎকারের দিনেই এগুলি লিখে রাখি এবং আমার বিশ্বাস কথাবার্ত্তার আমূল প্রতিলিপিই আমার নোটে থাকে।

ওয়েল্‌স্ সুরু করলেন, "সুদূর প্রাচ্যে রুশিয়া কি অভিপ্রায় সাধন করতে চায়, আপনার ধারণা?"

আমি জবাব দিতে খানিকক্ষণ সময় নিলাম, পরে বললাম, "জাপানকে হীনবল করাই রুশিয়ার লক্ষ্য।"

"আর রুশিয়ার দীর্ঘ-মেয়াদী অভিপ্রায় কি?" তিনি শুধোলেন।

"চীনের উপর আধিপত্যস্থাপন।"—আমার উত্তর।

ওয়েল্‌স্‌ প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মনে করেন, রুশিয়া সমগ্র চীনের উপর আধিপত্যবিস্তারপ্রয়াস? না কি চীনকে দ্বিধাবিভক্ত করার দিকেই সে ঝুঁকবে।"

এই কোন-কিছু-গোপন-না-করা মনোভাব, এই জেরা আমার ভালো লাগছিলো। তাঁর মনে কী আছে সেটা তাঁর প্রশ্নে স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। পরে আমার মনে হলো, আমিও তো তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করতে পারি।

আমি ওয়েল্‌স্‌কে বললাম, "মস্কো প্রথমে সোভিয়েট ইউনিয়নের সন্নিকটস্থ কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত প্রদেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার আশা করেছিলো। তাতে অবশ্য চীনের অন্যান্য অংশে রুশপ্রভাববিস্তারে কোনো বাধা ছিলো না।"

"আমার মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন," ওয়েলস্‌ বললেন।

তিনি থামলেন, থেমে সিগারেটে একটি টান দিয়ে পরে ফের সুরু করলেন, "আপনার কি মনে হয়, সুদূর প্রাচ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেওয়ার কোনো মতলব রুশিয়ার আছে?"

আমি বললাম, "আছে। আর সেটা জাপানকে দুর্ব্বল করার জন্যে।"

ওয়েলস্‌ আমার মতের সঙ্গে সায় দিলেন।

আমি বললাম, "বলশেভিকরা বৈদেশিক ব্যাপারে সাধারণতঃ দূরপ্রসারী নীতি অনুসরণ করে এসেছে; কিন্তু তাদের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপ দেখে তা আর মনে হয় না। হিটলারের সঙ্গে চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ হবার পর থেকে তারা হ্রস্ব-মেয়াদী পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করছে। আমার মনে হয় না যে তারা বর্ত্তমানে দূর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু করছে।" ওয়েলস্‌ আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

তিনি বিরামহীন ধূমপায়ী। আমি বললাম, "রুশিয়ার উপর থেকে নৈতিক নিষেধবাধা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে রুশিয়া আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের নজীর দেখিয়ে জাপানকে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বাধ্য করতে পারে।"

ওয়েলস: "এইরূপ ঘটবেই।"

লুই ফিসার: "স্টালিন টৌকিওর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করছেন আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন?"

ওয়েলস: "মস্কো—দক্ষিণ শাখালিন এবং যেসব চীনপ্রদেশের উল্লেখ আপনি করলেন তাদের দাবী করেছে।"

লু. ফি: "আপনার কি মনে হয়, জাপান সোভিয়েটের উপর মাঞ্চুরিয়ায় হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করবে?"

ওয়েলস্: "বিশ্বাসের কথা যদি বলেন, বিশ্বাসের মধ্যে অনেকগুলি উপাদান মিশে আছে। যেমন জাপানের বিশ্বাস যে জার্ম্মানরা রুশিয়াকে ইউরোপে আবদ্ধ রেখে এশিয়াখণ্ডে সোভিয়েট তৎপরতা ঘটতে দেবে না। তা ছাড়া, এ কথাও সত্যি যে গত দু'মাসে রুশিয়া চিয়াংকাইশেককে যত অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছে, দু বছরের মধ্যে কখনও তত অস্ত্র সে পাঠায়নি।"

লু. ফি: "আপনি কি মনে করেন, মস্কোর সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যেই জাপানের উপর এই চাল দেওয়া হয়েছে?"

ওয়েলস্: "আমি তো তাই মনে করি। জাপানের নৌবিভাগ এই বোঝাপড়া আদৌ চায় না, কেন না সে ক্ষেত্রে তাদের দক্ষিণ অভিমুখে অভিযানের গতি ফেরাতে হবে। কিন্তু জাপানের রাজনীতিক্ষেত্রে স্থলবাহিনীই অধিক প্রভাবশালী।"

লু. ফি: "নৌবিভাগের অনিচ্ছার হেতু?"

ওয়েলস্: "যদি রেখেঢেকে না বলতে হয়, তা'হলে আমি বলবো, সাধারণতঃ নৌসেনাধ্যক্ষরা রাজনীতিবিদ্যায় অধিক সুশিক্ষিত এবং

বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিক ওয়াকিবহাল ব'লেই তাঁদের এই অনিচ্ছা।"

লু. ফি: "আমার মনে হয় কাজের সুযোগ দ্বারাই আজকাল নীতি নির্দ্ধারিত হয় সব চাইতে বেশি। শ্যামের ঘটনাবলী এবং ইন্দোচীনে ফরাসী শাসকশক্তির বিপর্য্যয়ের ফলে জাপানের সম্মুখে মহা সুযোগ উপস্থিত হয়েছিলো। এই সমস্ত সুযোগই জাপানের নীতিনিয়ন্ত্রণে সব চাইতে বেশি কার্য্যকরী হয়েছে; টোকিও বৈঠকের সলাপরামর্শ নয়।"

ওয়েল্‌স্ (কথাটা তিনি জোর দিয়ে বল্‌লেন): "আপনি ঠিকই বল্‌ছেন।"

এরপর চীন ও ভারতবাসীদের প্রতি মার্কিণ ও ব্রিটিশ মনোভাবের বিষয়ে আলোচনা হলো। প্রসঙ্গতঃ ভারতের জাতীয় নেতা জওহরলাল নেহরুর কথা উঠ্‌লো।

ওয়েল্‌স্: "পণ্ডিত নেহরুকে আমরা জানি এবং তাঁকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। জাপান যদি ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তা হ'লে নেহরু সে-ঘটনাকে কী ভাবে গ্রহণ করবেন?"

লু. ফি: "আমার মনে হয় নেহরু অত্যন্ত জাপানবিরোধী হ'য়ে উঠ্‌বেন। অবশ্য এটা হবে তাঁর হৃদয়গত প্রতিক্রিয়া। ব্রিটিশ কোন্ কার্য্যক্রম গ্রহণ করে, তার ভিত্তিতেই তাঁর নীতি নির্দ্ধারিত হবে। ব্রিটিশ জাতি স্বগৃহে গণতন্ত্রানুরাগী হ'তে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে তারা অত্যন্ত মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্ব্বশেষ ঘাঁটী হ'লো ভারতবর্ষ, এবং আমার মনে হয় রক্ষণশীলরা যতদিন সম্ভব তাকে ধ'রে রাখ্‌তে চাইবে।"

ওয়েল্‌স্: "ভারতের প্রতি উদার মনোভাবমূলক আচরণের

প্রতি এখানে যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে। আপনি নেহরুকে শেষ দেখেছেন কবে ?"

লু. ফি : "১৯৩৮এর সেপ্টেম্বর মাসে, জেনেভায়। তার আগে প্যারিসে ও লণ্ডনে।"

কোনরূপ বিরতি ছাড়াই ওয়েল্‌স্ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "রুশিয়ার পরিস্থিতি আপনার কিরূপ মনে হয় ? লাল ফৌজের শক্তি সম্পর্কেই বা আপনার কী ধারণা ?"

লু. ফি : "লাল ফৌজ ও লাল বিমানবাহিনীর শক্তিকে তুচ্ছ মনে করলে ভুল করা হবে। কিন্তু জার্ম্মানরা ইচ্ছা করলে উক্রেণ এবং ক'কেশাসের কতকাংশ হয়তো দখল করতে পারে।"

ওয়েল্‌স্ : "কিন্তু কেন তারা সেটা করতে চাইবে ?"

লু. ফি : "ব্রিটেন-আক্রমণ সম্ভব না হলে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে এইরূপই হিট্‌লার ভাব্‌বে। সেই ক্ষেত্রে সে প্রথমে রুশিয়া-সমস্যার একটা ফয়সালা করতে চাইবে।"

ওয়েল্‌স্ : "তাতে কি জর্ম্মানীকে দুই সীমান্তে যুদ্ধ করবার ঝুঁকি নিতে হবে না ?"

লু. ফি : "না। হিট্‌লারের ধারণা, যদিও ইংলণ্ডকে আপাতত জুৎ মতো আক্রমণ করা যাচ্ছে না, ইংলণ্ডও যে আগামী একবৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় প্রধান ভূখণ্ড আক্রমণ করতে পারবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। রুশিয়া যাতে অধিকৃত ইউরোপে ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ আক্রমণকালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে রুশিয়াকে পিছু হটিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই হিট্‌লারের রুশিয়া আক্রমণ পরিকল্পনা।"

ওয়েল্‌স্ : "কিন্তু তাতেই কি সমস্যার সমাধান হবে ?"

লু. ফিঃ "তা হয়তো হবে না, কিন্তু এতে হিট্‌লার অসুবিধাগুলি কিছুকাল অন্ততঃ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।"

ওয়েল্‌স্ঃ "জার্ম্মানী যদি ইংলণ্ড আক্রমণের চেষ্টা করে, তাতে কি জাপানের উপর অধিক চাপ দিতে রুশিয়ার সুবিধা হবে না ?"

লু. ফি ঃ "বিপরীত ফলও হ'তে পারে। কেন না, জার্ম্মানী যদি ইংলণ্ড আক্রমণে ব্যর্থ হয়, হিট্‌লার সেইক্ষেত্রে রুশিয়ার উপর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারবে। ফলে জার্ম্মানের আরও সুবিধে হবে।"

ওয়েল্‌স্ঃ "অবশ্য এ সবই অনুমানের ব্যাপার। আগামী কয়েক মাসের ঘটনাতেই বোঝা যাবে কার কথা সত্য।"

লু. ফি ঃ "এ সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ও ভাব্‌বার আছে। জার্ম্মানী যদি বুলগেরিয়া জয় করতে পারে, তাতেও অনুরূপ ভাবে রুশিয়া দুর্ব্বল হবে। সেটাও জাপানের পক্ষে লাভজনক।"

ওয়েল্‌স্ঃ "তা অবশ্য ঠিক। জার্ম্মানীর বুলগেরিয়া দখল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে রুশিয়া কিছু করবে, আমার তা মনে হয় না।"

লু. ফি ঃ ঠিক এই কথাটাই আমি আমার বক্তৃতায় ব'লে বেড়াচ্ছি। কিন্তু বুলগেরিয়ার ব্যাপারে তুরস্কের প্রশ্ন কি স্বভাবতঃই এসে পড়ে না ? রুশিয়া ও জার্ম্মানী মিলে হয়তো তুরস্ককে বিভক্ত করবার সিদ্ধান্ত করতে পারে।"

ওয়েল্‌স্ঃ "গত অক্টোবরে জার্ম্মানী মস্কোর নিকট এই প্রস্তাবই করেছিল।"

লু. ফি ঃ "কোথায় যে ঠিক বিভাগের সীমারেখা টানা হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। আসল জায়গা হ'লো ইস্তাম্বুল। সেটা কে পাবে ?"

ওয়েল্‌স্ঃ "বল্‌তে পার্‌ছি না সে কথা।"

লু. ফি ঃ "সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে একদা আমি একটি ইতিহাসপুস্তক লিখেছিলাম……"

ওয়েল্‌স্ঃ "খুব চমৎকার বই……"

লু. ফি ঃ "লণ্ডন ও প্যারিসের এককালীন সোভিয়েট রাজদূত রকোভ্স্কি (ক্রিশ্চিয়ান জি রকোভ্স্কি) আমাকে কিছু তথ্য প্রদান করেছিলেন কিন্তু পাছে এই তথ্যপ্রকাশের ফলে ষ্টালিনের কাছে রকোভ্স্কিকে বিব্রত হ'তে হয়, সেইজন্মে আমি আমার বইতে সে-সব তথ্য প্রকাশ করি নি। তুরস্ক ও পারস্য সম্পর্কে ষ্টালিনের আগ্রহাতিশয্যের কথা রকোভ্স্কি আমাকে বলেছিলেন। রুশিয়ার বৈদেশিক নীতি নির্দ্ধারণে বল্‌শেভিক নীতিনিষ্ঠ ষ্টালিন তাঁর জন্মস্থান জর্জ্জিয়ার ভৌগোলিক সংস্থান দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন, এটা লক্ষ্য করবার মতো বিষয় বটে! ১৯১৯ সালের পর থেকে বল্‌শেভিক মাত্রই তুরস্কের সমর্থক, যেহেতু কামাল পাশা ছিলেন সাম্রাজ্যবিরোধী, যাজকশক্তি-বিরোধী। কিন্তু জর্জ্জিয়ার বল্‌শেভিকদের সন্দেহ ঘোচে নি। ১৯২১এর মার্চ্চ মাসে তুর্করা জর্জ্জিয়ার বাটুম বন্দরটি বলপূর্ব্বক অধিকার করেছিলো সেটা তারা ভুলে যায় নি। কাজেই জর্জ্জীয় কম্যুনিষ্টরা তুরস্ক সীমান্তকে আরও সম্প্রসারিত করতে চায়। ষ্টালিন উত্তর পারস্য সম্পর্কেও কৌতূহলী, কেননা অঞ্চলটি জর্জ্জিয়ার লাগোয়া।"

ওয়েল্‌স্ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়্‌লেন। তিনি আর আমাকে কতক্ষণ কথা বল্‌তে দেবেন বুঝ্‌তে না পারায় আমি নীতিগত নিষেধাজ্ঞার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। আমি বল্‌লাম, "ষ্টালিনের হিট্‌লারের সহিত একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা থাকায় এবং যেহেতু রুশিয়ার প্রতি আমাদের বন্ধু মনোভাব প্রদর্শনের ফলে রুশ-জাপান বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত হ'তে পারে, সেইহেতু নৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আমি কোনো সার্থকতা দেখি নে।"

ওয়েল্‌স্ ঃ "১৯৪০ জুলাইয়ের পূর্ব্বে ছত্রিশমাস যাবৎ মস্কোর সহিত আলাপ-আলোচনা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। সংযোগস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি এবং এখনও বিশ্বাস করি সংযোগ-স্থাপন বাঞ্ছনীয়।"

লু. ফি : "আমার মনে হয় ঔমান্স্কি খুব খুসী হয়েছেন। নিতান্তই সাধারণ ব্যক্তি তিনি।"

ওয়েল্‌স্ : "ঔমান্স্কি সামান্য ব্যক্তি হ'তে পারেন, কিন্তু বিচক্ষণ। তিনি ভালো ক'রেই জানেন যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে আসল দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে কোনো ইতরবিশেষ ঘট্‌বে না।"

লু. ফি : "ঔমান্স্কি সত্যি বিচক্ষণ। আপনার মনে আছে নিশ্চয় যে আমার চিঠিতে রুশিয়া নূতন পরিস্থিতিতে কী কী জিনিষ লাভ করবে তার কোনো উল্লেখ ছিল না। আমার মনে হয় না যে রুশিয়া খুব বেশি জিনিষ পাবে। কিন্তু আমার ধারণা, রুশিয়া আমাদের বন্ধু-মনোভাবকে নজীরস্বরূপ খাড়া ক'রে জাপানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে চাইবে।"

ওয়েল্‌স্ : "আপনি বল্‌ছিলেন যে জার্ম্মানী যদি ইংলণ্ড আক্রমণ করতে না পারে, তা হ'লে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। আপনি আরও বলেছিলেন যে ইংলণ্ড ইউরোপীয় প্রধান ভূভাগ আক্রমণ করতে পারবে না। কেন, ইংলণ্ড তো ইটালীর মধ্যে দিয়ে আক্রমণ করতে পারে?"

চম্‌কে উঠ্‌লাম। তবে কি তিনি কোনো গোপন তথ্য উদ্‌ঘাটন কর্‌ছেন? আমি বল্‌লাম, "সেই ক্ষেত্রে হিট্‌লার মুসোলিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং সম্মিলিতভাবে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করবে।"

ওয়েল্‌স্ : "কিন্তু সমগ্র উপকূলভাগ প্রহরা দেওয়া তো নেহাৎ সোজা কথা নয়।"

ওয়েল্‌স্ তাঁর চেয়ারের হাতলে হাতদুটি বিন্যস্ত ক'রে জিজ্ঞেস করলেন আমি ওয়াশিংটনে নিয়মিত আসি কি না। আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লাম। ওয়েল্‌স্ বল্‌লেন : "আবার যখন ওয়াশিংটন আস্‌বেন, আমাকে চিঠি লিখ্‌বেন। আমি আপনার সঙ্গে পুনরায় আলাপ করতে পারলে সুখী হবো।"

সাম্‌নার ওয়েল্‌স্‌ সরকারী পদে আসীন থাকা কালে এবং সরকারী দায়িত্ব ত্যাগ করার পর তাঁর সঙ্গে আমি অনেকবারই আলাপ করেছি। সে সব আলোচনা প্রত্যেকটিই খুব কৌতূহলপ্রদ ও শিক্ষনীয়। উপরের আলোচনাটি তাদের মধ্যে প্রথম।

ব্রিটেন যখন ইউরোপে যুদ্ধরত, জাপান দেখ্‌লে যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'য়ে ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ সাম্রাজবাদী এলাকাগুলিতে অভিযান চালাবার এই সুবর্ণসুযোগ। কাজেই টোকিও রুশিয়ার সঙ্গে বোঝা-পড়ার জন্যে আগ্রহব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। এই বোঝাপড়া হ'লে উত্তরে জাপানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত।

জার্ম্মানী জাপানের গতি দক্ষিণাভিমুখী করতে চেয়েছিলো, কারণ তাতে ক'রে কিছু ব্রিটিশ শক্তি এবং কিছু মার্কিণ সাহায্য ইউরোপ থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া যেতো। জার্ম্মানী তাই রুশ-জাপান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে টোকিওকে সাহায্য করেছিলো। এই চুক্তির ফলে ঘটিত রুশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির জন্যে হিট্‌লার বিশেষ ভাবিত হয় নি। রুশিয়াকে সে একাই আগ্‌লাতে পারবে এই ছিল তার ধারণা।

রুশিয়া যাতে শেষ পর্য্যন্ত চক্রশক্তির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, সেই আশাতেই মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র রুশিয়ার সহিত সম্পর্কের উন্নতিসাধন করতে চেয়েছিল। তদনুযায়ী নৈতিক বাণিজ্যবাধা অপসারিত করে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার প্রতি সদিচ্ছার মনোভাব প্রদর্শন করেছিল।

আমেরিকার সহিত রুশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি, আপচ জাপানের দক্ষিণাভিমুখী প্রবণতা, অপিচ জাপানকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে দেখতে জার্ম্মানীর আগ্রহ—এই সমস্তই ষ্টালিন নিজের অনুকূলে প্রয়োগ করেছিলেন এবং তার দ্বারা জাপানের সহিত অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনে সফলকাম হয়েছিলেন। ষ্টালিন এই চুক্তি চেয়েছিলেন,

কারণ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের শক্তি নিয়োজিত হওয়ার ফলে রুশিয়ার নিরাপত্তার পক্ষে আর একটি মাত্র সক্রিয় বিপদের কারণ অবশিষ্ট ছিল—জার্ম্মানী।

১৯৪১ এপ্রিলের রুশ-জাপান চুক্তির অন্তর্গত সীমান্ত সম্পর্কিত মীমাংসার সর্ত্তমতে মস্কো জাপানের মাঞ্চুরিয়া-গ্রাস স্বীকার করলো। পূর্ব্বে অবশ্য রুশিয়া জাপানের মাঞ্চুরিয়া-গ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। আর জাপান বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রুশিয়ার অভিভাবকত্বের অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়েছিলো। বহির্মঙ্গোলিয়া একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল—অঞ্চলটিকে চীন নিজের ব'লে দাবী করছিল, যদিও বহুবৎসর যাবৎ বহির্মঙ্গোলিয়া চীনের আধিপত্যের আওতার বাইরে চ'লে গিয়েছিল। ভাষান্তরে এই নূতন চুক্তিকে বলা যায় চীনের ক্ষতির বিনিময়ে দুইটি সচল সাম্রাজ্যের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার নিশানা।

জাপানের পররাষ্ট্রসচিব মাৎসুকা চুক্তি-সম্পাদনের পর মস্কো থেকে যখন বিদায় নিলেন, ষ্টালিন তাঁকে রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। ষ্টালিনের জীবনে এইরূপ আচরণ এই প্রথম। তাঁর প্রত্যেকটি কার্য্যই ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পিত। এসোসিয়েটেড প্রেসের হেন্‌রী সি-ক্যাসিডি—যিনি ষ্টেশনে ছিলেন—লিখেছেন যে ষ্টালিন মাৎসুকাকে সচুম্বন বিদায়-অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়েছিলেন নাৎসী সহকারী সামরিক দূত কর্ণেল হ্যান্স ক্রেব্‌স্। মাৎসুকাকে বিদায় দেওয়ার পর ষ্টালিন তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে বল্‌লেন: "আমরা পরস্পর বন্ধু হবো।"

১৯৪১, ২৬শে মার্চ্চ, সাম্‌নার ওয়েল্‌স্‌-এর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার কালে আমরা পুনরায় রুশিয়ার উপর নাৎসী আক্রমণ সম্ভাবনার বিষয়

আলোচনা করেছিলাম। প্রশান্ত সাগরের পরিস্থিতি সম্পর্কেও পুনরায় গভীর আলোচনা চল্‌লো। ১৯শে মে পুনরায় যখন তাঁর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম, ততদিনে রুশ-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'য়েছে, হেস্‌ স্কটল্যাণ্ডে ধরা পড়েছে, ইউরোপের প্রতি রাজধানী থেকেই রুশ-সীমান্তের উভয় দিকে সামরিক প্রস্তুতির খবরাখবর ভেসে আস্‌ছে। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ সুরু হওয়ার ছয়দিন পর রাষ্ট্রীয় দপ্তরে সাম্‌নার ওয়েল্‌সের সহিত পুনরায় আমার একঘণ্টা আলাপ হয়। পরিবর্ত্তিত বিশ্বপরিস্থিতির অনেক দিক দিয়েই আমরা আলোচনা করি। বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বে যাতে গ্রেট ব্রিটেনে আমার যাওয়ার সুবিধা হয় তার ব্যবস্থা করতে তাঁকে আমি অনুরোধ করি।

লিট্‌ভিনভ ও জোসেফ ঈ ডেভিস

লণ্ডনে ১৯৩৯-এর অক্টোবরে মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আলাপপ্রসঙ্গে রুশিয়াকে কিভাবে ব্রিটিশ-পক্ষে আনা যায় সে সম্পর্কে আমরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল আলোচনা করি। অবশ্য, রুশিয়াকে মিত্রপক্ষের শিবিরভুক্ত করা কোনো নাৎসী-বিরোধীর দ্বারাই হ'য়ে উঠলো না; এই কৃতিত্ব হিট্‌লারের।

সোভিয়েট-নাৎসী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার মুখে ষ্টালিন ও লিটভিনভের মধ্যে এক প্রস্থ বাক্‌যুদ্ধ হ'য়ে গেলো। বিপ্লববাদী যারা, তারা সাধারণতঃ বিদ্রোহী ও নিয়মবিরোধী হয়, এ-ই লোকে জানে। অথচ প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারে সোভিয়েট অধিবাসীরা পৃথিবীর আর সবাইকে টেক্কা দিতে পারে। একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রে হয় তোমাকে নিয়ম মেনে চল্‌তে হবে, নয়তো একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রে কেউ গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করতে পারে না। কিম্বা বলা যায়, কেউ গভর্ণমেণ্টের দু'বার সমালোচনা করতে পারে না। ম্যাক্সিম লিট্‌ভিনভের ক্ষেত্রে এই দুটি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

লিট্‌ভিনভ একটি প্রতীকস্বরূপ এবং ষ্টালিন এই প্রতীকচিহ্নের মূল্য ভালো ক'রেই জানেন। লিট্‌ভিনভের নামে এই কটি জিনিষ বোঝায়—সম্মিলিত নিরাপত্তা, আপোষবিরোধিতা, আক্রমণবিমুখতা। হিটলারের সঙ্গে মস্কোর মিতালির সম্ভাবনা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতেই মস্কো গভর্ণমেণ্ট প্রচণ্ডতম হিটলারবিরোধী লিটভিনভকে আপাততঃ বাতিল করলে। তারপর হিটলার যখন রুশিয়া আক্রমণ করলো, ষ্টালিন লিটভিনভকে তাক থেকে নামিয়ে এনে ঝেড়েঝুড়ে ইংলণ্ডের উদ্দেশে কিছু বলবার জন্যে—তাঁর অননুকরণীয় ইংরিজিতে কিছু বলবার জন্যে—

তখুনি বেতারবক্তৃতায় লাগিয়ে দিলেন। পরে তাঁকে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত ক'রে পাঠানো হ'লো।

নাৎসীরা যখন রুশিয়া আক্রমণ করে, দুই বৎসর যাবৎ বেকার লিটভিনভ মস্কো সহরের নিকটে এক বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী আইভির সঙ্গে তাস খেল্‌ছিলেন। জার্ম্মানীর বর্ব্বর আক্রমণের ফলে যদিও তিনি তাঁর চাকুরী ফিরে পেলেন, তা হ'লেও লিটভিনভ সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমালোচনা থেকে বিরত রইলেন। বাক্যে অথবা ইঙ্গিতে তিনি হিটলারের সঙ্গে ষ্টালিনের সন্ধিচুক্তি কখনও অনুমোদন করেন নি। বস্তুতঃ, ১৯৪১ সালে সার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ যখন মস্কোয় ব্রিটিশ রাষ্ট্র-দূত রূপে নিযুক্ত, লিটভিনভ তাঁকে বলেছিলেন, জার্ম্মানীর সহিত সন্ধিচুক্তি করতে গিয়ে "আমরা মাটি খেয়েছি"। ১৯৩১, ৮ই জুলাই মস্কো রেডিওর এক বক্তৃতায় লিটভিনভ ষ্টালিনকে সূক্ষ্মভাবে তিরস্কার করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, "বোঝাপড়া অথবা চুক্তি, হিটলার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দ্বারা স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতিপত্র, তাদের তরফ থেকে কোনো প্রতিজ্ঞা অথবা আশ্বাসবাক্য, নিরপেক্ষতার ঘোষণা, জার্ম্মানীর সহিত রুশিয়ার ঘনিষ্টতম সম্পর্ক—এর কোনোটিকেই আকস্মিক ও অকারণ আক্রমণ সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিষেধাত্মক ব্যবস্থা ব'লে মনে করা যেতে পারে না।"

লিটভিনভ আরও বলেছিলেন, "বিশ্বআধিপত্যের স্বপ্ন চরিতার্থ করবার মতলবে অন্যান্য দেশ আক্রমণ করবার যে শয়তানী পরিকল্পনা হিটলার করেছে, তার মূল কথাই হ'লো প্রথমে ভেদসৃষ্টি, পরে আক্রমণ। হিটলারের আচরণ এই নীতির দ্বারাই বরাবর শাসিত। আসন্ন আক্রমণের স্থলে কোনো দেশ যাতে সঙ্ঘবদ্ধ সাধারণ প্রতিরোধ আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে না পারে, হিটলার তার জন্যে অত্যন্ত কৌশলী সব উপায় প্রয়োগ করে। শক্তিমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যাতে দুই রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে না হয় তার জন্যেও তার চেষ্টার অবধি

ছিল না। হিটলারের রণনীতির মূলকথা হ'লো শিকারগুলিকে আগে চিহ্নিত করা, তার পর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা মতো যখন যেটির দরকার, একটির পর একটিকে আঘাত হানা।" রুশিয়া সম্পর্কে হিটলারের কর্ম্মপন্থার এই যথাযথ বর্ণনা ষ্টালিনের পরোক্ষ সমালোচনা, যেহেতু ষ্টালিন হিটলারের নীতি কার্য্যকরী করতে সহায়তা করে-ছিলেন।

লিটভিনভ আরও বললেন, হিটলার প্রথমে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির একটা ফয়সালা করতে চেয়েছিলেন, কেননা তাতে ক'রে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার পথে তার আর কোনো প্রতিবন্ধক থাক্‌তো না। যাঁরা বলেন যে, ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ড বিজয়ের পর জার্ম্মানী কর্ত্তৃক রুশিয়ার আক্রমণ সম্ভাবনা নিবারণের উদ্দেশ্যেই ষ্টালিন হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই সব বৈঠকবিহারী কূটনীতিকদের মুখের মতো জবাব সোভিয়েট বৈদেশিক সচিবের এই কথার মধ্যে রয়েছে। লিটভিনভ স্পষ্ট ক'রেই তাঁদের জানালেন যে তাঁরা ভ্রান্ত। প্রথমে পশ্চিমমুখে অভিযান করাই ছিল হিটলারের মতলব। সেই সময়ে যাঁদের চোখে এটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল, রুজভেল্ট তাঁদের অন্যতম।

কিন্তু, লিটভিনভ বললেন, "কোথায় যেন মুস্কিল বাধলো। ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়ার শিক্ষা অর্জ্জন করতে হিটলারের এখনও বাকী।" জার্ম্মান বাহিনী ইংলণ্ড আক্রমণে অসমর্থ হ'লো। "কাজেই আরেকটি মতলব তার মাথায় এলো। হিটলার নিজেকে এই ব'লে বোঝালো যে পশ্চিমে সে বাস্তবতঃ সন্ধির অবস্থা ঘনিয়ে তুলেছে, কাজেই এক্ষণে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে ঝটিকাযুদ্ধ, বিদ্যুদ্গতি যুদ্ধ চালাতে তার আর বাধা নেই। এখানকার কাজ শেষ হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিগুণ উদ্যমে গ্রেটব্রিটেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যাবে এবং তাকে খতম করা যাবে।"

লিট্‌ভিনভ ঘটনাবলীর তাৎপর্য্য নিঃশেষে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ৩রা জুলাই বেতারযোগে সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তির সমর্থনে ষ্টালিন তাঁর জর্জ্জীয় উচ্চারণবিশিষ্ট রুশ ভাষায় যে কথা বলেছিলেন, লিট্‌ভিনভের ৮ই জুলাই তারিখের বেতার বক্তৃতা তার প্রতিবাদস্বরূপ। অন্য যে কোনো সোভিয়েট প্রতিবাদকারী অথবা রাষ্ট্রনীতিবিরোধীকে এই ক্ষেত্রে গুলি করা হ'ত কি নির্ব্বাসনে পাঠানো হ'ত। কিন্তু বিদেশে লিট্‌ভিনভের স্থান পূরণ করার মতো আর কেউ ছিল না, যদিও রুশিয়ার অভ্যন্তরে তাঁর প্রভাব যৎসামান্যই ছিল। হিট্‌লার কর্তৃক রুশিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যখন ষ্টালিনের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন দাঁড়ালো, লিট্‌ভিনভ তাঁর অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এলেন। রুশিয়ার সামরিক বিষয়গুলির ফলে যখন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের উপর ষ্টালিনকে আর ততোখানি নির্ভর করতে হল না, লিট্‌ভিনভ পুনরায় অর্দ্ধ নির্ব্বাসন বেছে নিলেন। তিনি নিষ্ক্রিয় রইলেন, তবে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনকে রুশিয়ার সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে পুনরায় যদি আশ্বস্ত করবার প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে যাতে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায় সেই বিবেচনায় হাতের কাছেই রইলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বরাবরই এই ধারণা ছিল যে ষ্টালিন লিট্‌ভিনভকে অপছন্দ করেন। এর কারণ বোধ করি এই যে কার্য্যক্ষেত্রে লিট্‌ভিনভকে ছাড়া ষ্টালিনের চলে না।

নাৎসী জার্ম্মানী কর্তৃক রুশিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টকে কয়েকটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'লো। পয়লা নম্বর সমস্যা—সোভিয়েট ইউনিয়নকে অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দেওয়া; দ্বিতীয় সমস্যাটি আরও কঠিন—মার্কিন জনগণের মধ্যে রুশিয়ার অনুকূল মনোভাব জাগ্রত ক'রে তোলা। শেষোক্ত উদ্দেশ্য পূরণের

জন্য ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট মস্কোর প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ঈ ডেভিসকে সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রণয়ন করতে উৎসাহিত করলেন। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করলেন—এর ভেতর ডেভিসকে কতকগুলি গোপন কূটনৈতিক চিঠিপত্র প্রকাশের অনুমতি দান অন্যতম। গভর্ণমেণ্ট সমূহকে প্রায়ই জনমতকে নিজের অনুকূলে আনবার জন্যে চেষ্টা করতে দেখা যায়। যুদ্ধকালে এই চেষ্টা আরও প্রবল হয়।

জোসেফ ডেভিসের লেখা বই বাজারে খুব কাট্‌তে লাগলো।

একদিন রাষ্ট্রদূত তাঁর সুন্দরী, বিত্তশালিনী স্ত্রীকে নিয়ে মস্কোর রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে কয়েকটি ফুলের দোকান পড়লো। তার থেকে ডেভিসের মনে দার্শনিক চিন্তার উদয় হ'লো। বিদেশাগত উইসকন্সবাসী ভাবতে সুরু করলেন, "সোভিয়েট যুবকরা জৈবিক প্রেরণাবশে তাদের নিজ নিজ প্রেমিকার কাছে প্রমাণ করতে চায় যে প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে তার অর্থ সঙ্গতি ও সামর্থ্য অনেক বেশি। যতো ভালো ও যতো বড়ো ফুলের তোড়া সে তার দয়িতাকে উপহার দিতে পারবে, সেই অনুপাতে দয়িতার চোখে তার বাঞ্ছনীয়তা ততো বেশি প্রমাণিত হবে। কাজেই তার যথেষ্ট পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করা দরকার। মুনাফার প্রবৃত্তিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ না করলে সে টাকা রোজগার করতে পারে না, অথচ মুনাফা-পরায়ণতা খাঁটী সাম্যবাদের পরিপন্থী। তা'ছাড়া, সাম্যবাদের গোড়ার কথাই হ'লো শ্রেণীহীন সমাজ। কিন্তু মুনাফার তাগিদে কিছু করার মধ্য দিয়ে শ্রেণীবৈষম্যের ভিত্তিতে সমাজ-প্রতিষ্ঠারই পোষকতা করা হচ্ছে..........।" কাজেই ডেভিসের মতে, এটা হ'লো ভালোবাসা বনাম সাম্যবাদের প্রশ্ন। ফুলের তোড়ার আকার-আয়তন যতো বড়ো হবে, সুন্দরী স্ত্রী লাভের সম্ভাবনাও ততো বেশি। কিন্তু মিঃ ডেভিস একথা জানেন না যে রাশিয়ানরা ফুল দিয়ে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে না। রাশিয়ানরা অবশ্য গৃহকর্ত্রী-

দের উপহার দেবার জন্যে প্রায়ই ফুল কিম্বা ফুলের পাত্র নিয়ে যায়। তবে মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে কোনো সোভিয়েট মেয়েই বৃহত্তর পুষ্পস্তবকের নিকট আত্মসমর্পণ করে না। সোভিয়েট ইউনিয়নে যদি নূতন আকারে শ্রেণী বা সম্প্রদায় সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তার কারণ পূর্ব্বরাগের প্রয়োজনে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রকরণের আশ্রয় অবশ্যই নয়।

মিঃ ডেভিস প্রায়ই মস্কোকে আনন্দের খোরাক জোটাতেন। লিট্‌ভিনভের রসবোধ খুব প্রবল, বিশেষ করে তিনি ডেভিসের রসিকতায় অত্যন্ত আমোদ পেতেন। ১৯৩৭-এর জুনে লালফৌজের প্রধান প্রধান সেনাপতিদের গুলি করে মারার পর ডেভিস লিটভিনভের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। ডেভিস তাঁর বইয়ে লিখেছেন, "আমি তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করি, গভর্ণমেণ্ট লাল ফৌজের সমর্থন ও আনুগত্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিনা।" লিটভিনভ তার কী উত্তর দিলেন বলে আপনাদের মনে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট লালফৌজের আনুগত্যের উপর নির্ভর করতে পারে। সেনাবাহিনী গভর্ণমেণ্টের প্রতি আনুগত্যহীন ডেভিস কি লিটভিনভের কাছে একথাই প্রত্যাশা করেছিলেন?

বলশেভিক নায়করা ডেভিসকে পছন্দ করতেন। তিনি রুশিয়ার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজনীতার উপর আস্থাশীল ছিলেন, এবং রাষ্ট্রদূতের কার্য্যে সাফল্যের এইটেই হলো আসল বুনিয়াদ। ক্রেমলিন স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসের ন্যায় বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর চাইতে ডেভিসের ন্যায় ধনতন্ত্রের আদর্শে গভীর আস্থাশীল ব্যবসায়ী কিম্বা চাকুরীজীবি-দেরই সমধিক পছন্দ করে। রুশিয়া অবশ্য পুঁজিবাদী ডেভিসকে সমাজতান্ত্রিক ডেভিসে রূপান্তরিত করে নি। তাঁর "Mission to Moscow" একটি সোভিয়েট-বিরোধী বই। এতে ডেভিস এক জায়গায় লিখেছেন—"প্রকৃত বিচারে, গভর্ণমেণ্ট বলতে বাস্তবতঃ

একজনকেই বোঝায়। তিনি 'শক্তিশালী মানুষ' ষ্টালিন, যিনি সংঘর্ষকে অতিক্রম করে আজও টিঁকে আছেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেছেন এবং যিনি আজ অবিসম্বাদী সর্ব্বকর্তৃত্বময় পুরুষ।"

ডেভিস সঙ্কেতলিপির সাহায্যে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টকে 'তার' করে জানিয়েছিলেন, "এখানকার মানুষের মনে ত্রাসভাব একটা ভয়াবহ বাস্তব সত্য। এই মস্কো সহরে এমন সব সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে যার থেকে একথা বলা চলে সম্প্রদায়ের সকল অংশের জনগণের মধ্যেই ভয় পরিব্যাপ্ত ; প্রত্যেকেই ভয়তাড়িত। এমন কোনো গৃহ নেই, তা সে যতো সামান্য বাড়ীই হোক, গোয়েন্দা পুলিশের নৈশ আবির্ভাবকে যার ভয় নেই। (সাধারণতঃ রাত্রি একটা থেকে তিনটার মধ্যে এই আবির্ভাব ঘটে থাকে)। একবার যদি কাউকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে মাসের পর মাস তার আর কোনো খবর পাওয়া যায় না— অনেক সময় একেবারেই আর খবর পাওয়া যায়না। গোয়েন্দা পুলিশের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সাধারণ অভিযোগ এই যে শ্রমিকশাসিত এক-নায়কত্বের এই অঙ্গটির পদ্ধতি-প্রকরণ পুরাতন জারতন্ত্রের আমলের পুলিশের আচরণের চাইতে কোনো অংশে কম পীড়নমূলক, কোনো অংশে কম নিষ্ঠুর নয়।"

ডেভিস তাঁর বইতে লিখেছেন, "সাম্যবাদ কার্য্যকরী হবে না। এখানে তা কার্য্যকরী হয়নি।"

সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের সমালোচনা করে মিঃ ডেভিস আরও বলেন যে, পার্টির প্রতি কর্ত্তব্যের বিপরীতে সম্মান কিম্বা আনুগত্যের প্রশ্ন মোটেই বিচার্য্য নয়। ফলে সদস্যদের নিজেদের মধ্যে এবং নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যয় অত্যন্ত শিথিল। একে অপরকে বিশ্বাস করে না। এটা একটা মস্ত বড়ো মূলগত দুর্ব্বলতা।" তাছাড়া, ডেভিস লিখেছেন যে সোভিয়েট অর্থনীতি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক শিল্প

পরিচালনার জন্যে নয়, শিল্পপরিচালনা সত্ত্বেই। 'জন্যে' এবং 'সত্ত্বে' কথা দুটির উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন।

তাহলে কম্যুনিষ্ট ও রুশিয়ার সমর্থকদের দ্বারা "Mission to Moscow" বইটি এতো সমাদৃত হলো কেন ? সোভিয়েট নীতিপদ্ধতির সমালোচনা সত্ত্বেও যে তারা বইটিকে স্বাগত জানিয়েছে তাতে করে বর্ত্তমান সোভিয়েটসমর্থক চিন্তাধারার গতি অনুধাবন করার পক্ষে বইটি একটি মূল্যবান চাবিকাঠিস্বরূপ হয়েছে। ডেভিসের বইতে ষ্টালিনের একনায়কত্বের নিন্দা আছে, কিন্তু ষ্টালিনের প্রশংসা রয়েছে। বইটি শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে রুশিয়ার কীর্ত্তিমহিমা কীর্ত্তন এবং ষ্টালিনের বৈদেশিক নীতি সমর্থন করেছে। অধিকন্তু, বইটি লেখার পর থেকে ডেভিস মস্কো বিচারের যৌক্তিকতা প্রচারের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর Mission to Miscow বইটিকে এমন একটি সিনেমাছবিতে রূপান্তরিত হতে দিয়েছেন যাতে অভিযুক্তদের দোষী প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এইজন্যেই ষ্টালিনপন্থীদের নিকট ডেভিসের কদর।

মস্কো-বিচার সমূহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৬, '৩৭ ও '৩৮ সালে। সোভিয়েট ইতিহাসে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং এর সবটুকু কৃতিত্ব ষ্টালিনের। কাজেই ক্রেমলিনের অদ্যাবধি আশা, বিশ্বের জনমত মস্কো বিচারকে সাজানো ব্যাপার মনে না করে একটা সত্যি-কারের ব্যাপার বলে মনে করবে। এইজন্যেই বিচার এবং বিচারদণ্ড-গুলি সম্পর্কে বিতর্কের শেষ নাই।

সোভিয়েট গোয়েন্দা পুলিশ এক্ষণে প্রধান সারির সোভিয়েট নেতাদের উপর কড়া নজর রাখছে। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের গতিবিধি টেলিফোন বার্ত্তা এবং ডাকের উপর এদের খরদৃষ্টি। অথচ মস্কো বিচারের সময় গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তাঁদের অভিযোগের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হয়নি। নিছক বলপ্রয়োগের

সাহায্যে আদায়ীকৃত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই দণ্ডাজ্ঞাগুলি প্রদত্ত হয়েছিলো।

বিচারটি যে প্রক্রিয়ায় চালানো হয়েছিলো সেইটে যদি একটু মনোযোগের সহিত অনুধাবন করা যায়, মস্কোবিচারের স্বীকারোক্তিগুলির রহস্য অচিরেই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। ইংরাজীতে বিচারের ধারার পূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে। তাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত এই দুই পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। বিবাদীরা ঠিক সেইসব কথাই বলে যা গভর্ণমেণ্ট তাদের দিয়ে বলাতে চেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েট নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই ষ্টালিনের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ষ্টালিন বিপ্লবমহিমাকে নষ্ট করছেন, রুশিয়াকে আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রে পরিণত না করে জাতীয়তাবাদী বানিয়ে তুলেছেন, প্রগতিশীল না করে প্রতিক্রিয়াশীল করছেন—এই তাঁদের ধারণা হয়েছিলো। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে ষ্টালিনকে মনে করা হয় অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘনীয় যেহেতু তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন না, সেই হেতু তিনি ভুল করেছেন একথা কারও বলার যো নেই। বিচারে অভিযুক্ত বিবাদীগণ তাদের স্বীকারোক্তিতে এই নিয়ম অনুসরণ করেছিলো। যদিও সোভিয়েট বিচারপ্রণালীতে যে কোন বিবাদী তার মনের কথা অবাধে খুলে বলতে পারে, মস্কোবিচারের আসামীরা ষ্টালিন সম্পর্কে তাদের মনোগত ভাব প্রকাশ করেনি। আদর্শের প্রতি তাদের ন্যায়নিষ্ঠা যদি প্রবল হতো, তা হলে ষ্টালিনকে তারা নস্যাৎ করতো কিন্তু তা না করে সরকারী সোভিয়েট মুখপাত্রদের পদ্ধতির অনুকরণে তারা ষ্টালিনকে মহিমান্বিত করে তুলেছিলো।

বিবাদীদের কয়েদখানায় পূরে রাখার অনেক মাস—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় দশ মাস পর তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তিগুলি আদায় করা হয়েছিলো। কয়েদখানায় থাকা কালে তারা স্বীকারোক্তি করতে

অস্বীকার করে। যতদিন তাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল, ততোদিন তারা স্বীকারোক্তি করেনি। পরে তাদের এই মনোবল ভেঙ্গে যায়, শেষ পর্য্যন্ত কয়েদী ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়। বিচারাধীন ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ডের অথবা দীর্ঘকাল ব্যাপী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে কিন্তু যেহেতু প্রকাশ্য আদালতে তারা সঙ্গত আচরণ করেছে সেইহেতু তাদের দয়া প্রদর্শন ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমার নিজের ধারণা, আসামীদের এবং তাদের পরিবারস্থ লোকদের হত্যা করা হবে না, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। সত্যিই তাদের প্রাণরক্ষা হয়েছিলো কিনা আমি বলতে পারি না; সোভিয়েট পুলিশ যে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে সে বিষয়ে বোধকরি তারা নিজেরাও নিঃসংশয় ছিল না। এইটুকু মাত্র জানা গেছে যে আসামী-দের কিছুসংখ্যক সন্তান বেঁচে ছিলো। যাই হোক, কেউ যদি বোঝে যে ঠিক ঠিক ভাবে না চললে তার এবং তার প্রিয়জনদের আশু মৃত্যু সুনিশ্চিত, তা হলে অদৃষ্টের উপর নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে প্রাণ বাঁচাবার শেষ চেষ্টা সে করবে, এটা স্বাভাবিক।

প্রায়ই এ প্রশ্ন করা হয় যে মস্কো-বিচারের আসামীরা কেন মৃত্যুর পথ বেছে নিলো না? জারশাসনের আমলে এবং নাৎসী জার্ম্মানীতে অধিকাংশ বিপ্লবী তো এই অবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করে নিতো। যে বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠায় বলশেভিক কর্ম্মী নিজে সক্রিয়-ভাবে সহায়তা করেছে এবং যে গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রতি বিরোধিতা সত্ত্বেও সে তার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থার চাইতে শ্রেয় মনে করে, সেই গভর্ণমেণ্টকে অমান্য করা জার-পুলিশকে অমান্য করার চাইতেও কঠিন কাজ। উক্ত গভর্ণমেণ্ট যখন মিথ্যা জেনেও কোন স্বীকারোক্তিতে তাকে স্বাক্ষর করতে বলে, তখন সে নিরাশাবাদী হয়ে পড়ে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়্‌বার প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। এই হ'লো এক ব্যাখ্যা। তাছাড়া, এটাও স্মরণ রাখা দরকার, যেসব-

আসামী বিচারকালে স্বীকারোক্তি করে, তার চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক আসামী বিচারহীন অবস্থায়ই ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেয়। যারা স্বীকারোক্তি করেছিলো, কেবলমাত্র তাদেরই বিচার হয়। এইরূপ বিচারাধীন আসামীর সংখ্যা মস্কোবিচারে পঞ্চাশেরও কম ছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপরাধ কবুল করতে অস্বীকার করার ফলে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেয়।

স্বীকারোক্তিগুলিতে সোভিয়েট ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট সোভিয়েটী ধারার অনুস্মৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতিরচিত প্রত্যেকটি সোভিয়েট ইতিহাসপুস্তকে এবং সোভিয়েট বিশ্বকোষের নূতন সংস্করণের প্রত্যেকটি খণ্ডে ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে। পুরাতন সংস্করণের অনেক উল্লেখযোগ্য সত্য ঘটনা গোপন অথবা বহু নূতন অপ্রামাণ্য কাল্পনিক ঘটনা যোজনা করে এটা করা হয়েছে। প্রত্যেক একনায়কত্ব-শাসিত রাষ্ট্রেই প্রচণ্ড মিথ্যা সযত্নলালিত অস্ত্রগুলির অন্যতম। পুস্তকে, সংবাদপত্রে, কূটনীতির ক্ষেত্রে এবং বিচারকালে এই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

বেসামরিক বলশেভিক নেতাদের প্রকাশ্য বিচার ছাড়াও, ১৯৩৭ সালের ১১ই জুন লালফৌজের অধিনায়ক মার্শাল টুকাচেভ্‌স্কি এবং অন্য সাতজন মার্শাল সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হন। বিচার-পর্ব্ব গোপনে অনুষ্ঠিত হয়—মস্কো বিচারগুলির মধ্যে এইটেই হলো সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিচার। এই বিচারে কী ঘটেছিলো বাইরের কেউ তা জানে না। নয়জন সেনানায়ক আটজন মার্শাল উপাধিক সেনানায়কের বিচার করেন; তাঁরাও সকলে মার্শাল। এক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ বিচারকও ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেয়। বিচারের ধারা সম্পর্কে কোনো তথ্যই জানা যায় না। বস্তুতঃ, এমনও বলা হয়েছে—রুশিয়ায় এই ধরণের খবরাখবর সঠিক কেউ বলতে পারে

না—যে, আদপে কোনো বিচারই হয়নি। এ সম্পর্কে সামান্য যে সংবাদ আমাদের চোখে পড়েছে তা হচ্ছে সোভিয়েট সংবাদপত্রসমূহের প্রচারিত এই বুলেটিন যে, আসামীদের বিচার হয়েছে, বিচারে তারা স্বমুখে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং তাদের মৃতুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত বিচারের পর লালফৌজের হাজার হাজার অফিসারকে "অপসারিত" করা হয়।

১৯৩৭, ২৭শে জুলাই, ডেভিস ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টকে 'তার' করে জানান, "জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সক্রিয় ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ এই সব সেনানায়কদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সে সম্পর্কে এখানকার সাধারণ জনমত এই যে অভিযোগটি বাস্তব প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। ...বর্ত্তমানে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না, আগামী বহুকাল তথ্য পাওয়া যাবে কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ আছে। কাজেই কী ঘটেছিলো, এবং লালফৌজের এই সকল অফিসারদের অপরাধই বা কী ছিলো তা নির্ণয় করবার উপায় নেই। জানিত ঘটনার ভিত্তিতে যে-সিদ্ধান্ত—একমাত্র তাকে কেন্দ্র করেই মতপ্রকাশ করা চলে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরিচিত ঘটনার সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প।"

"আমেরিকান ম্যাগাজিন"-এর ১৯৪১এর ডিসেম্বর সংখ্যার এক প্রবন্ধে মিঃ ডেভিস স্বেচ্ছায় এক স্বীকারোক্তি করেন। তিনি বলেন যে তিনি মস্কোবিচারে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আসামীদের যে কী অপরাধ তা ধরতে পারেন নি। ডেভিসের এই স্বীকারোক্তির ভিত্তি কী? নিশ্চয়ই নূতন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নয়। কেননা, নূতন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ কেউ দাখিল করে নি।

লালফৌজের নায়কগণ—যাঁদের ভিতর দু'জন ইহুদীও ছিলেন—স্বদেশের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্ম্মানী কিম্বা জাপানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন এর সমর্থনে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কিম্বা তার সমর্থকগণ আজ পর্য্যন্ত কোনো প্রমাণই উপস্থিত করতে পারেন

নি। প্রমাণ তো দূরের কথা, ঘটনাটি সম্পর্কে সামান্য তথ্য পর্য্যন্ত অনুপস্থিত। স্বীকারোক্তিকারী বেসরকারী নেতাদেরই বা কী অপরাধ সে সম্পর্কেও বিশ্ববাসীকে আজ পর্য্যন্ত কোনো তথ্যই সরবরাহ করতে পারে নি—ক্রেম্‌লিনের ভিতরের কিম্বা বাইরের কোনো লোক। বিচারপর্ব্ব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যে কয়বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে একবারও মস্কো গভর্ণমেণ্ট স্বীকারোক্তিগুলির সমর্থনসূচক কোনো প্রমাণ জনসমক্ষে উপস্থাপিত করেন নি। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়!

মস্কো বিচারকালে আসামীরা এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেয় যে লিয়ঁ ট্রট্‌স্কি হিট্‌লারের ডেপুটি রুডল্‌ফ্‌ হেসের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করেন এবং সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পতনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। হেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এটা। নুরেমবার্গে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকালে হেসের বিরুদ্ধে যে চার্জ্জ উপস্থিত করা হয়, এই অভিযোগটিকে কেন তার অন্তর্ভুক্ত করা হল না? বিচারে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে একজন প্রসিকিউটর তো ছিলেন। ট্রট্‌স্কির সঙ্গে উক্ত আলাপের বিষয়ে তিনি কেন হেস্‌কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না? ব্যাপারটি আদৌ ঘটেনি বলেই কি তিনি এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন?

হিট্‌লারের পরাজয়ের পর অনেক গুপ্ত নাৎসী দলিল প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট অসংখ্য জার্ম্মান সরকারী কাগজপত্র প্রকাশ করেছেন। এসব কাগজপত্র প্রকাশ হওয়ার ফলে এযাবৎ অজ্ঞাত ও অত্যন্ত গোপনীয় সব বিষয়ের উপর গভীর আলোকপাত হয়েছে। লালফৌজ জার্ম্মানীর অর্দ্ধাংশ অধিকার করে; জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন এরা দখল করে। টুকাচেভ্‌স্কি ও তাঁর সেনানায়কগণ রুশিয়াকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে নাৎসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হয়েছিলো—এই ঘটনার প্রমাণমূলক কোনো দলিলই কি লালফৌজ সেখানে আবিষ্কার করতে পারে নি? এটা কি কৌতুকপ্রদ নয় যে মস্কো গভর্ণমেণ্ট আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ কিম্বা তাদের স্বীকারোক্তির সমর্থনসূচক একটি দলিলও এতাবৎ উপস্থিত করে নি?

তা হলে "আমেরিকান ম্যাগাজিন"-এ ডেভিসের স্বীকারোক্তির কারণ কি? রুশিয়ায় কোনো "পঞ্চম বাহিনী" নাই এই অবস্থাই নাকি তাঁকে স্বীকারোক্তি করতে প্রণোদিত করেছে, তিনি বল্‌ছেন। পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর আলোকে মিঃ ডেভিস নিশ্চয়ই তাঁর মত বদ্‌লাতে পারেন, সে অধিকার তাঁর আছে, কিন্তু রুশিয়ায় "পঞ্চম বাহিনী" নাই একথাই যদি সত্য হয় তা হলে যাদের গুলী করে মারা হয়েছে তারা "পঞ্চম বাহিনীর" লোক সেটা কী করে প্রমাণ হয়? গণতন্ত্র কিম্বা একনায়কত্বশাসিত অন্য অনেক দেশেই পঞ্চম বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। সম্ভবতঃ রুশিয়ায়ও 'শোধনপর্ব্বের' আগে কোনো পঞ্চম-বাহিনী ছিল না। মাত্র বিচারকালেই তাদের উদ্ভব হয়!

কোনো কোনো ভাষ্যকার মস্কোবিচার ও অপরাধীনিধনপর্ব্বের এই বলে ব্যাখ্যা করতে চান যে জার্ম্মান বাহিনীর উপর লালফৌজের বিজয়ের জন্যেই এটা ঘটেছে। তাঁদের যুক্তি কতকটা এইরূপ—রুশিয়ায় নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। রুশিয়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে চমৎকার যুদ্ধ করে। কাজেই যেহেতু রুশিয়ায় নিধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেইহেতু রুশিয়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে চমৎকার লড়াই করে। এই নজীরে এটাও তা হলে বলা যায়—রুশিয়ায় দুর্ভিক্ষ হয়; রুশিয়া নাৎসীদের বিরুদ্ধে চমৎকার যুদ্ধ করে। কাজেই যেহেতু রুশিয়ায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো সেইহেতু সে যুদ্ধকুশলতার পরিচয় দেয়।

আসল কথা এই যে সামরিক নিধনপর্ব্বের জন্য রুশিয়াকে ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয়েছিলো। ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যাণ্ড লালফৌজের অগ্রগতি

বহুকাল প্রতিরোধ করেছিলো তার কী কারণ? সোভিয়েট বাহিনীর এত প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সে কী করে সাধন করলো? ক্রেম্‌লিন ভেবেছিলো, ফিন্‌ল্যাণ্ড সামান্য আঘাতেই কাবু হয়ে পড়বে। ঘাতক-নিহত টুকাচেভস্কির অন্ততঃ এই মরীচিকার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত ছিলো না যে ফিন্‌ল্যাণ্ডে বিপ্লব দেখা দেওয়া মাত্র আক্রমণকারী রুশদের নিকট ফিন্‌ল্যাণ্ডের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে পড়বে।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে লালফৌজ-প্রদর্শিত দুর্ব্বলতা হিট্‌লারকে রুশিয়া আক্রমণে উৎসাহিত করে এবং ফিল্ড মার্শাল ওয়ালথার ফন্ ব্রাউশিচ সহ যে সকল সেনানায়ক এই কার্য্যের বিরোধিতা করেন তাঁদের আপত্তিখণ্ডনে তাকে সহায়তা করে।

বলা অনাবশ্যক যে লালফৌজ জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে আশ্চর্য্য সমরকুশলতার পরিচয় দেয়। তবে প্রথম কয়েক মাসে লালফৌজ মোটেই সুবিধা করতে পারে নি—বিরাটপরিমাণ ভূখণ্ড তার হাতছাড়া হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ লোক হতাহত ও ধৃত হওয়ায় তার জনবল কমে যায়। বস্তুতঃ, রুশিয়া যুদ্ধে প্রায় হেরে যেতে বসেছিল। মস্কোর পরিত্রাতা, বার্লিনজয়কারী মার্শাল গ্রেগরী কে জুকভ ১৯৪৫এর ২৪শে জুন মস্কোর রেড স্কোয়ারে বক্তৃতাদান কালে বলেন, "এমন এক একটা সময় আসে যখন পরিস্থিতি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক হয়ে ওঠে।" ১৯৪৫এর ২৪শে আগস্ট স্টালিন একই ভাষা ব্যবহার করেন। ক্রেমলিনে সেনাবাহিনীর অফিসারদের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি বলেন, "১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে এক একটা সময় গেছে যখন অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক হয়ে ওঠে।"

১৯৪১ এর ডিসেম্বরে নাৎসীরা মস্কোর উপান্তে খিম্‌কি নামক স্থানে এসে পৌঁছয়। ক্রেম্‌লিন থেকে 'বাসে' কিছুক্ষণের পথ খিম্‌কি। শত্রুকে হটিয়ে দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। স্টালিনগ্রাডেও প্রতিরোধ-কারীদের প্রচণ্ড কঠোরতার সম্মুখীন হ'তে হয়। রাজনৈতিক বিতর্ক-

কারীরা কেবলমাত্র চূড়ান্ত জয়টাকেই বিচার করে। কিন্তু সোভিয়েটের জনগণ এবং সোভিয়েট সামরিক বিভাগ জানে যুদ্ধটা কোনকালেই খুব মসৃণ গতিতে চলে নি। টুকাচেভ্স্কির নিধনপর্ব্বের ধাক্কা সাম্‌লাতে লাল ফৌজের পাঁচ বৎসর লেগেছিল।

সোভিয়েট জনগণকে রক্তের দ্বারা নিধন পর্ব্বের মূল্য দিতে হয়।

রুশিয়া সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে সব চাইতে বড়ো কথা হ'লো তার জনগণ, তার উনিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ অধিবাসী। শত শত বৎসর খারাপ ভাবে থাকার ফলে তাদের উদ্যম সীমাহীন। তারা কঠোর। প্রকৃতি কিম্বা ইতিহাস—এ দুটির কোনটি থেকেই তারা প্রশ্রয় পায় নি। স্বাস্থ্য তাদের উদ্দাম, প্রজনন শক্তিও প্রচুর। কিছুই তাদের দমাতে পারে না। যুদ্ধ, মারী বুভুক্ষা, নায়কদের কৃত ভুল প্রত্যেকটি ভয়াবহ ঘটনাকেই তারা সহজে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে। চৌদ্দ বৎসর আমি এদের ভিতর বাস করেছি, এরা আমার প্রিয়। এরা এম্‌নিতে নিরীহ ও বাধ্য। কষ্টের কপাল তাদের। বিচার ও নিধনপর্ব্বের মূল্য তাদের ভালো ভাবেই দিতে হয়েছে।

মানুষের, বিশেষত যুবসম্প্রদায়ের, মনকে প্রভাবিত করবার উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে স্বাধীনতা ও সর্ব্বাত্মক নীতির মধ্যে যে সংগ্রাম চল্‌ছে তার সঙ্গে ষ্টালিন-নিয়ন্ত্রিত নিধনযজ্ঞের গভীর যোগ আছে। একজন একনায়কের নিধনযজ্ঞের প্রশংসা করে জোসেফ ঈ ডেভিস গণতন্ত্রের সমূহ ক্ষতি করেছেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাগুলির পক্ষ সমর্থন সর্ব্বাত্মক নীতির অনুকূলে প্রচার কার্য্যেরই সামিল। এই প্রচারকার্য্য সফল হ'লে গণতন্ত্রের ক্ষতি হবে।

মিঃ ডেভিস্ এই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন নি যে মস্কো-বিচার ও নিধনযজ্ঞের ফলে দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি বিকল্পকে গ্রহণ করা

ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।—হয় দণ্ডপ্রাপ্তরা সবাই নির্দ্দোষ ছিল। সেক্ষেত্রে নিধনগুলিকে বিরুদ্ধবাদী ও অসুবিধাসমূহের অপসারণ কল্পে সজ্ঞানে পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নয়তো দণ্ডপ্রাপ্তরা প্রকৃতই দোষী ছিল, যার অর্থ সোভিয়েট সর্ব্বাত্মক ব্যবস্থার কোনো একটি দিক সোভিয়েট বিপ্লব সফলকারী যাবতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের (কেবল ষ্টালিন ছাড়া) দেশ ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছিল। বিকল্পদ্বয়ের কোনটাই সোভিয়েট ব্যবস্থার পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

ব্রিটিশ জনগণ ও চার্চ্চিলের ইংলণ্ড

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে, হিটলার কর্ত্তৃক রুশিয়া আক্রমণের দু'সপ্তাহ বাদে, আমি বিমানযোগে ইংলণ্ডে যাই। যে বিমানখানায় আমি উড়ে যাই নিউ ইয়র্ক থেকে বার্মুডা যেতে তার পাঁচ ঘণ্টা, বার্মুডা থেকে পর্ত্তুগীজ আজোরেস দ্বীপমালার অন্তর্গত হর্ত্তা দ্বীপে যেতে চৌদ্দ ঘণ্টা, এবং সেখান থেকে লিস্‌বনে যেতে সাত ঘণ্টা লেগেছিল।

সমুদ্রের আট হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া কতোই না আরামদায়ক, প্রীতিপ্রদ ও স্বচ্ছন্দ। যেন বর্ণখচিত একটি 'পুলম্যান'-এ চ'ড়ে বেড়াচ্ছি। ঝোল, মাংস, শাকসব্জি, রুটি, মাখন, আইসক্রীম ও কফি সহযোগে আমি দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাধা করলাম। তারপর কিছুক্ষণ বিমানের লম্বা 'করিডরে' পায়চারি করলাম। আজোরেস দ্বীপপুঞ্জকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো এক দেবতা সমুদ্রে ইতস্তত কতকগুলি পাথর ছড়িয়ে রেখেছেন। দু' দিকে পাহাড়, মেঘমালায় তাদের শিরগুলি কর্ত্তিত। আমাদের বিমান পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নিম্নাভিমুখে অগ্রসর হ'ল, তারপর কতিপয় ঝাঁকুনি সহযোগে সমুদ্রে অবতরণ করল। অনধিকৃত ফ্রান্সের জন্য রেডক্রশ সংগৃহীত খাদ্য বহনকারী মর্চ্চে-ধরা 'আইল দ্য রে' জাহাজখানা নোঙর-করা অবস্থায় পাশেই ছিল। আমরা হর্ত্তায় যখন উপনীত হলাম, দ্বিতীয় একখানা মালবোঝাই জাহাজ উজ্জ্বল লোহিতকৃষ্ণ স্বস্তিকা পতাকা উড়িয়ে চল্‌ছিল।

গ্রীনল্যাণ্ডের উপর কতকাংশ জুড়ে বায়ুমণ্ডলের চাপ যখন লঘুতর হয়, পশ্চিম আফ্রিকা থেকে সে বাতাস টেনে নেয় এবং তার ফলে আজোরেসের চারদিককার জল আলোড়িত হয় এবং জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট তারই জাজ্জ্বল্যমান

প্রমাণ জলস্তম্ভের দরুণ হর্ত্তায় আমরা চব্বিশ ঘণ্টাকাল আটকে ছিলাম।

ফুলমার উপাধিক এক আমেরিকান দম্পতি-চালিত এক হোটেলে আমরা ছিলাম। বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছিল। আমাদের বিমানের ক্যাপ্টেন উইনষ্টনের সঙ্গে ব'সে আমি দাবা খেলছিলাম। কে একজন রেডিওটি খুলে দিয়েছিল।

"আমরা পাঁচ হাজার ফিট উচ্চতায় আছি। এখানকার 'ভিজিব্‌লিটি' কতো ?" রেডিওতে কে একজন ব'লে উঠ্‌লো।

ক্যাপ্টেন উইনষ্টন খেলা থেকে মুখ তুললেন। "নিশ্চয়ই লিস্‌বন থেকে কোন বিমান আসছে", তিনি বল্‌লেন।

স্থলস্থিত প্যান-আমেরিকান হোটেলের ম্যানেজার আগত বিমানের চালকের উদ্দেশে বল্‌লেন, "এখানকার 'ভিজিব্‌লিটি' হচ্ছে এক হাজার ফিট।'

"আমি আন্দাজী হিসাব মতে অবতরণ করবার চেষ্টা করছি," চালককে বল্‌তে শোনা গেলো।

ক্যাপ্টেন উইনষ্টন চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "লোকটা করছে কি, বেপরোয়া উড়ছে, বেপরোয়া নাব্‌ছে।"

এক মুহূর্ত্ত বাদে বিমানচালকের গলা পুনরায় শোনা গেলো, "আমি তিন হাজার ফিটে আছি।"

প্যান-আমেরিকান হোটেলের ম্যানেজার সতর্কবাণী ঘোষণা করলেন, "সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস আর এখানে প্রচুর বৃষ্টি, খুব সাবধান।"

"কি জানি হয়," বল্‌লেন উইনষ্টন, তারপর ঈষৎ ভীতিগ্রস্ত ভাবে একটা সিগারেট ধরালেন।

একটা থম্‌থমে আশঙ্কার ভাব—হৃদপিণ্ড যেন মুখে উঠে আস্‌ছে। স্তব্ধতা। আমরা অবতরণপ্রয়াসী বিমানটির মোটরের শব্দের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লাম, কিন্তু কোন শব্দই আমাদের কানে এলো না।

"আপনি কোথায় ?" ম্যানেজার শুধোলেন।

"এক হাজার ফিটের নিচে—নাবতে যাচ্ছি।" বিমানচালক উত্তর দিলেন। "আমি কিছুই দেখ্তে পাচ্ছি না। পোতাশ্রয়ে জাহাজ আছে কি ?"

"পোতাশ্রয়ের ঠিক মাঝখানে 'আইল দ্য রে' জাহাজখানা রয়েছে, সেটার উপর নজর রাখুন। 'আইল দ্য রে'-র পশ্চিম দিকে নাবুন।"

বিমানচালক উত্তর দিলেন, "বেশ। কিন্তু মনে রাখবেন নাবতে খুব বেগ পেতে হবে।"

"জলোচ্ছ্বাসের ধার ঘেঁস্বেন না," ম্যানেজার পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন।

উইনষ্টন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লেন।

বিমানচালক হঠাৎ ব'লে উঠ্লেন, "যাক্ নাব্তে পারা গেছে। এদিকেই আসছি ধীরে ধীরে।"

উইন্‌ষ্টন স্বস্তির আবেগে শীস্ দিয়ে উঠ্লেন এবং দাবাখেলার দিকে পুনরায় মনঃসংযোগ করলেন।

একটু পরে বিমানচালককে বল্তে শোনা গেলো, "ডকে এসে পড়েছি।"

হর্ত্তা ও লিস্‌বনের পোর্ত্তুগীজদের ক্ষুদ্রাকৃতি ও শীর্ণকায় ব'লে মনে হচ্ছিল। সাহসী নাবিকের কাছ থেকে যে জাতি উত্তরাধিকার সূত্রে একটা সাম্রাজ্য লাভ করেছে সে জাতি যেন আর নিজের উপর নির্ভর করতে পারছে না। অবতরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ডকের পাশে সারিবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান নরনারী যেন আমাদের বল্তে চাচ্ছে ইউরোপের প্রতিটি মানুষ যখন আমেরিকায় যেতে চাচ্ছে, তখন তোমরা কেন ইউরোপে আস্‌ছ ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পোর্ত্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেন, বিশেষ ক'রে পোর্ত্তুগাল, আন্তর্জ্জাতিক গুপ্তচরদের বিচরণক্ষেত্র ছিল।

লিস্‌বনের সীমার বাইরে এস্টোরিল নামক বিলাস-বিভ্রমপূর্ণ একটি জায়গায় নাৎসী কর্ম্মচারীরা একই রুলেট খেলার টেবিলে ব্রিটিশ কূট-নীতিকদের সহিত পাশাপাশি খেলেছে ; ইহুদী শরণাগত ও গেষ্টাপোর ভ্রমণকারীদল পাশাপাশি টেবিলে আহার সমাপন করেছে ; জাপানী এজেন্ট, মার্কিন বিমানচালক, বেল্‌জিয়ান কাউণ্ট, ইতালীয় অফিসার ও তুর্কী সওদাগর জুয়াখেলার টেবিলে একে অপরের টাকা হাত বাড়িয়ে নিয়েছে—ভদ্রভাবেই নিয়েছে। জুয়াড়ী হিসাবে জাপানীরা হচ্ছে সব চাইতে আত্মপ্রত্যয়হীন, হোয়াইট রুশিয়ার লোকেরা সব চাইতে গম্ভীর, নাৎসী-বিরোধী জার্ম্মানরা সব চাইতে কোলাহলকারী। আমেরিকানরা জুয়া খেলে এ থেকে কিছু উত্তেজনা পাবার এবং বাড়ীতে সে সম্পর্কে কিছু লিখ্‌তে পারার সুখানুভূতির লোভে। আমি দেখেছি, আমার সঙ্গতি অনুযায়ী ছোটোখাটো বাজীতে যখন খেলেছি, আমি বিশেষ কোনো উত্তেজনা বোধ করি নি, কিন্তু যখনই বেশি টাকার বাজীতে খেলেছি, প্রচুর উত্তেজনা অনুভব করেছি। ফলে বাজীতে যে টাকাটা হেরেছি, আমার ন্যায় একজন 'স্বতন্ত্র' বৃত্তিজীবী সাংবাদিকের পক্ষে তার শোক ভোলা কঠিন।

একটি বেসরকারী ও বেসামরিক ওলন্দাজ বিমানে ক'রে আমরা ছয় ঘণ্টায় লিস্‌বন থেকে ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে এসে পৌঁছুলাম। নাৎসী-অধিকৃত ফরাসী উপকূল ভাগের সমান্তরাল রেখায় আমরা উড়ে এসেছিলাম। নাৎসীরা ইংলণ্ডমুখী এই সমস্ত নিয়মিত বিমান চলাচলের খবর রাখ্‌তো, কিন্তু নিতান্ত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আট্‌কাবার প্রয়োজন দেখা না দিলে তারা সে সবের গতিরোধ করত না। জার্ম্মান বেসামরিক বিমানযাত্রা সম্পর্কে ইংরেজরাও অনুরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন করেছিল।

বোমার আঘাতে ব্রিস্টল সহর প্রচণ্ড ভাবে বিধ্বস্ত হ'য়েছিল। যে সমস্ত গৃহ ধ্বসে পড়েছিল তাদের অধিবাসীদের অবস্থা কী নিদারুণ!

রেলওয়ে ষ্টেশনের দেয়ালগুলি ভেঙ্গে পড়েছিল, ছাদ ফুটো হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণ আগাগোড়া শান্ত থাকে।

যে বিমান ঘাঁটীতে আমরা অবতরণ করলাম তার কর্পোরাল আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের বিমান ভ্রমণ সুখকর হয়েছে তো ?"

একজন সার্জ্জেণ্ট বল্‌লেন, "আপনার বসুন।" আমরা ছাড়পত্র সম্পর্কিত পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

একজন অফিসার বল্‌লেন, "আপনারা কি চা খাবেন ?" আমরা যেন সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগের জন্য পল্লী ভবনে এসেছি—এঁদের ব্যবহারের সৌজন্যে ও সহযোগিতামূলক মনোভাবে এইরূপই মনে হচ্ছিল।

১৯১৮ সালে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ সৌন্যবাহিনীতে আমি একজন স্বেচ্ছা সৈন্য ছিলাম। ষ্টেশনের দৃশ্যে আমার সে কথা মনে পড়ে গেল। সর্ব্বত্রই সামরিক পোষাক। মেয়েরা পর্য্যন্ত ইউনিফর্ম্ম পরিহিতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এটা ছিল না। সৈন্যেরা তাদের ভারী কিট্‌ব্যাগের উপর চেপে বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রত্যেকটি ট্রেন জনাকীর্ণ।

প্লাটফর্ম্মের এক ধারে দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করলাম। স্পষ্টতঃই পিতাপুত্র তারা। পিতার বয়স পঁয়তাল্লিশ আন্দাজ হবে, তিনি তাঁর পোষাকে সেনাবাহিনীর মেজরের পরিচয়সূচক চিহ্ন এবং ১৯১৪-১৮র অভিজ্ঞ যুদ্ধ ফেরতের অভিজ্ঞান বহন করছিলেন। পুত্রের বয়স পাঁচিশ কি তার কাছাকাছি হবে—রাজকীয় বিমান বাহিনীর 'ব্লু' চিহ্নিত তার কোর্ত্তা। ব্রিটেনে এর চাইতে বিষাদময় দৃশ্য আমার চোখে পড়ে নি। পিতা পুত্রকে যে বিষণ্ন দেখাচ্ছিল তাও নয়। পিতা ১৯১৭ সালে সংঘটিত ফ্রান্সের একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। পুত্র মাঝে মাঝে মৃদু হাস্য করছিল। কিন্তু একথা ভাব্‌তে সত্যি মন বিষাদ

গ্রস্ত হ'য়ে ওঠে যাঁরা "যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহের অবসান কামনায়" প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে পুত্র কন্যার জনক হ'য়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে চেয়েছিলেন তাঁরা আজ তাঁদের পুত্র কন্যার পাশে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধে সংগ্রামনিরত।

লণ্ডনের ট্যাক্সী যেসব রাস্তা দিয়ে আমাকে নিয়ে চল্‌লো সেসব রাস্তাঘাট আমার পরিচিত। প্রত্যেক রাস্তার উপর বোমার আঘাতের ছাপ। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কেননা এইটে হলো সেই সর্ব্ববিধ্বংসী প্রক্রিয়া যার নাম আধুনিক যুদ্ধ, যে যুদ্ধ বেসামরিক অধিবাসীদেরও রেয়াৎ করে না, যে যুদ্ধ শিশুশয্যার উপর গিয়েও আঘাত হানে, যে যুদ্ধ মানুষকে খাবার বা জিরোবারও অবসর দেয় না—হয়তো চারটি মানুষের একটি পরিবার আহারে বসেছে, হঠাৎ বোমার ঘায়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো; যে যুদ্ধ রন্ধনশালার তৈজসপত্রাদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে, গুঁড়িয়ে ফেলে।

লণ্ডনে পৌঁছুবার কয়েকদিন পর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'লো। তিনি বিখ্যাত উপন্যাসলেখিকা ষ্টর্ম্ম জেম্‌সন। আমি তাঁকে তাঁর আটাশি-বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। জান্‌তে পারলাম তিনি হুইট্‌বিতে আছেন। হুইট্‌বি ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলের একটি জায়গা—উত্তর সমুদ্র অতিক্রম ক'রে ঠিক এখানে এসেই নাৎসীরা মাঝে মাঝে তাদের বোমা ফে'ল্‌তো।

"তাঁর কোনো ক্ষতি হয় নি?"

"বিশেষ কিছু না। কেবলমাত্র তাঁর ঘরের জানালাগুলি ভেঙ্গে গেছে।"

"আপনি তাঁকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে, ইংলণ্ডের আরও অভ্যন্তরে সরিয়ে আনেন না কেন?" আমি তাঁকে প্রশ্ন করি।

জেম্‌সন আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান, "আপনি বল্‌ছেন

কী? এটা যে তাঁর বাড়ি! এই বাড়িতেই তাঁর জন্ম হয়েছে। আপনি কি বল্‌তে চান, যেহেতু হিট্‌লার বোমা দিয়ে আমার বাড়ি উড়িয়ে দিতে পারে, সেইহেতু আমি আমার বাড়ি ছেড়ে পালাবো?"

বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার দৃষ্টান্ত যে নেই এমন নয়, তবে সেগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। ষ্টর্ম্মের কথায় যে মনোভাব ব্যক্ত হ'লো সেইটেকেই ইংলণ্ডের প্রকৃত মনোভাবরূপে গণ্য করা যায়। ১৯৪৩ সালে ষ্টর্ম্মের ছোট বোন বিমান-আক্রমণের ফলে মারা যায়। ঐবৎসরে অরক্ষিত ছোট ছোট সহরের উপর যে সকল অর্থহীন দিবাআক্রমণ হয় তাদেরই একটির কবলে পড়ে তার মৃত্যু ঘটে। অর্থহীন ছাড়া আর কি? সহরগুলিতে না ছিল শিল্পপ্রতিষ্ঠান, না ছিলো উল্লেখযোগ্য আর কিছু। বল্‌তে গেলে মানুষ ছাড়া তাদের ভিতর আর কিছুই ছিল না। ষ্টর্ম্ম আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি সারা জীবন আমার বোনের অভাব বোধ করব। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে পর আমি তার সন্তানদের এখানে এনে মানুষ করব।"

একদিন এক সান্ধ্য পার্টিতে এক মহিলা সিগারেটের গুণাপকার্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন। আরেকটি মহিলা সংবাদপত্রের মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত খারাপ কাগজের সমালোচনা করলেন। "বস্ত্রের অবস্থা আরও শোচনীয়", একজন অভ্যাগত বল্‌লেন।

আরেকজন বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "সব জিনিষই খারাপের দিকে কিন্তু জনসাধারণের মনোবল চমৎকার।"

সত্যি, জনগণ অদ্ভুত। তারা যে অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করছে এটা পর্য্যন্ত তাদের চিন্তায় ঢোকে নি। আমার বইয়ের ব্রিটিশ প্রকাশক জোনাথান কেপ বল্‌লেন, "বাস্তবিক, আপনি কী করতে পারেন? বোমাপতনের সময়ে আপনি চীৎকার করতে পারেন, পাগল হ'য়ে যেতে পারেন, নয়তো আত্মহত্যা করতে

পারেন। অথবা আপনি আচরণে মর্য্যাদা ফুটিয়ে শান্ত থাক্‌তে পারেন।"

ব্রিটিশ জনগণ মর্য্যাদার সঙ্গে আচরণ করে। তথাপি আমি যখন ক্লান্ত ও সম্ভবতঃ ক্ষুৎপীড়িত লণ্ডনবাসীদের পরিপূর্ণ ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে মন্থর পদে ঘরে ফিরতে দেখতাম, আমার মনে হ'তো যুদ্ধ শুধু অমানবোচিতই নয়, তা মানবীয় মর্য্যাদাবোধের উপর কঠিন আঘাতও বটে। মানুষ এভাবে বেঁচে থাক্‌তে পারে না, এভাবে বেঁচে থাকা তার উচিত নয়। যুদ্ধ সর্ব্বনিকৃষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মানুষের চরিত্রের সর্ব্বোত্তম দিকটিকে পরিস্ফুট ক'রে তোলে।

পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য জর্জ্জ রাসেল ষ্ট্রসের গৃহে আমি অতিথি হয়েছিলাম। আনিউরিন বিভান ও তাঁর স্ত্রীও তাঁর কাছে অতিথিরূপে বাস করছিলেন। ষ্ট্রসের ন্যায় মিঃ বিভানও পার্লামেণ্টের একজন শ্রমিক সদস্য; ওয়েল্‌সের ঝড়ো পাখি তিনি। মিসেস বিভানের নাম জেনী লী, স্বীয় অধিকারে এবং স্বীয় যোগ্যতা বলেই তিনি একজন শ্রমিক নেত্রী। ষ্ট্রস ও বিভান দু'জনে মিলে বামপন্থী শ্রমিক দলীয় সাপ্তাহিক "ট্রিবিউন" কাগজটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এক রবিবারের সকালে, আমি রিজেন্ট ষ্ট্রিটের উপর দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম একটি লোক 'ট্রিবিউন' পড়তে পড়তে এগিয়ে আস্‌ছে। কাগজটি তার কেমন লাগে, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল এই নিয়ে আলোচনা করলাম। ঘরে এসে আমি রাসেল ও আনিউরিনকে সমস্ত ঘটনাটা বল্‌লাম, তাঁরা তো আমার মার্কিনী অধ্যবসায় দেখে অবাক। কয়েক বৎসর আগে হলে এই ভাবে আগু বাড়িয়ে আলাপ জমাতে আমি পারতুম না, কিন্তু আমি দেখেছি মানুষ কথা বল্‌তে ভালোবাসে, এবং কেউ যদি তার সঙ্গে আলাপ জমায় বা তাকে প্রশ্ন করে, সে বিরক্ত বোধ করে না। অনেক দেশেই আমি এটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। আলোচনায়

ডুবে যাওয়াই হচ্ছে পন্থা, যেমন 'ট্রিবিউন' পাঠকের বেলায় আমি করলাম। কিন্তু তার বদলে যদি আমাকে বলতে হ'তো, "কি চমৎকার প্রভাত" বা "বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে" তা হলেই আমি মুস্কিলে পড়তাম। এমন অবস্থায় আমার জিহ্বা যেন আট্‌কে আসে।

কোনো অপরিচিত দেশকে অনুধাবন করবার সময় যার সঙ্গেই দেখা হয় প্রত্যেকেরই নিকট সচরাচর আমি একই প্রশ্নমালা উপস্থিত করে থাকি। ফলটা প্রায়ই চমকপ্রদ হয়। একে বলা যেতে পারে আমার নিজস্ব "গ্যালাপ-পোল"। দুশো লোককে আমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি: "হিট্‌লার যদি এইক্ষণে শান্তি প্রস্তাব করে, আপনার মনোভাব কী হবে?" একজন মাত্র এর জবাবে বলেছিলো যে এইরূপ প্রস্তাব এলে তা বিবেচনা ক'রে দেখ্‌তে হবে; বাদ বাকী সবাই তীব্র ভাবে এবং উত্তেজিত কণ্ঠে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে।

রুশিয়া তখনও জয়লাভ করতে সুরু করে নি। আমেরিকা ছিল দূরে, যদিও ইংলণ্ডের প্রতি বরাবরই সহানুভূতিশীল ও সাহায্যপরায়ণ মনোভাব তার ছিল। তখন অবস্থা এমন যে হিট্‌লার যে কোনো দিন ইংলণ্ড আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের জনগণ যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তুত ছিল। জবাব-গুলির মধ্যে হাঁ-নায়ের ষাট-চল্লিশ ভাগাভাগি ছিল না; প্রত্যেকেরই উত্তর ছিল অবিসম্বাদী, এক ও ষোলো-আনা স্পষ্ট।

চার্চ্চিল আমাকে বলেছিলেন, "এখানে কেউ পেছু হট্‌বেনা।" জনগণ ছিল সঙ্কল্পে সুদৃঢ়, কেন না তারা জান্‌তো তারা পরিণামে জয়ী হবে।

নাৎসী বোমার বজ্রগর্জ্জনের মধ্যে ইংলণ্ড জাতীয় সঙ্গতির সন্ধান পেয়েছিল। মনে রাখতে হবে 'সঙ্গতি' 'ঐক্য' নয়। ঐক্য জিনিষটার মধ্যে স্বেচ্ছাচারআরোপিত বাধ্যবাধকতার আভাস আছে

কিন্তু সঙ্গতি জিনিষটা গণতান্ত্রিক। বিভিন্ন বৃত্তির সমন্বয়কে বলা হয় সঙ্গতি; আর ঐক্য হলো একের নিকট সকলের বলপ্রযুক্ত আত্মসমর্পণ। গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রে বিজয়ী প্রার্থী যদি এক ভোটেও জয়লাভ করেন তা হ'লেও তিনি সকলের অনুগত স্বীকৃতি লাভ করেন। কিন্তু নাৎসী "ঐক্যের" ধারণায় মেরেকেটে শতকরা ৯৭টি ভোট আদায় করতে না পারলে প্রার্থীর আনুগত্যলাভের আশা নাই।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে একটি বিষয় আমাকে বিস্মিত করেছিল—বোধ করি এতো অবাক আর আমি কোনো ঘটনায় হইনি। ঘটনাটি কয়লাখনির মালিকদের অপকীর্ত্তিসংক্রান্ত। আনিউরিন বিভান কৈশোরে কয়লা-খনিতে কাজ করেছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, কয়লা-খনির মালিকরা নাকি মাত্র খারাপ খনিঅঞ্চলগুলি থেকে কয়লা তোলাচ্ছেন, আর খনির উৎকৃষ্ট অংশগুলি অখনিত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন যুদ্ধপরবর্ত্তী মুনাফার লোভে। অভিযোগটি বিশ্বাস করা শক্ত, কেন না এই অভিযোগের অর্থ যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতা। গভর্ণমেণ্টের খনি বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তাকে আমি বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি জানালেন, অভিযোগটি সত্য। তবু আমি ঘটনাটিকে লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধা করেছি। তারপর একদিন দেখলাম, ব্যবসায়ীদের কাগজ "ফিনান্সিয়াল নিউজ"—কাগজটিকে ব্রিটিশ "ওয়াল ষ্ট্রীট জার্নাল" বললেও হয়—লিখেছেন, "খনির মালিকরা লাভজনক খনিগুলিতে কাজ করবার দিকে আরও ঝোঁক দিতে পারে যদি বাড়তি মুনাফা করের বোঝা কিছু কমিয়ে দেওয়া হয়।"

মালিকরা খারাপ 'পিট'গুলি থেকে কয়লা তোলাচ্ছেন, কারণ যুদ্ধকালে সবই বিক্রি হয়, অতি নিকৃষ্ট কয়লাও পড়ে থাকে না। তাছাড়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধপরিচালনার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বলতে গেলে

তাদের সমস্ত মুনাফার টাকাটাই ছিনিয়ে নিচ্ছিল। মালিকদের ভাবটা এই—মুনাফাই যদি না পেলাম, লাভজনক খনিগুলি থেকে কয়লা তোলানো কেন? সেগুলিকে বরং শান্তিকালের জন্য রেখে দেওয়া যাক্। ভালো কয়লার গ্রাহকও জুটবে আর কর নিরপেক্ষ মুনাফাও অনেক কামাই করা যাবে। যে মালিক এইরূপ আচরণ করছিল তার একটি ছেলে হয়তো রাজকীয় বিমানবাহিনীর চালক। দেশের জন্য মালিক তার ছেলের জীবন বরবাদ করতে পর্য্যন্ত রাজী, কিন্তু ভালো কয়লা ছাড়তে রাজী নয়।

মালিক ও শ্রমিক, ধনি ও দরিদ্র, অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর লোক—সকলেই যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে। দমকলের কর্ম্মী ও বিমান আক্রমণ ওয়ার্ডেনদের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য ঘুচে গিয়েছিল। হোমগার্ড ছিল বেসরকারী লোকদের আক্রমণ প্রতিরোধের শিক্ষার স্থল; সেখানে মনিবের গায়ে গায়ে চলেছে অফিসের ছোক্‌রা অনুচর। দেশরক্ষার কার্য্যে নিয়োজিত প্রত্যেকটি নাগরিক মিলে ব্রিটেন এক রাষ্ট্রিক বন্ধুগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলো। ব্রিটেনের ঐক্যের মূল এইখানে। বন্ধুত্ব ও ঐক্যের ফলে ইংরাজ সুখের সন্ধান পেয়েছিল।

এতো সব সত্ত্বেও কয়লাখনির মালিকদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে নি, মালিকমনোবৃত্তি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল।

যুদ্ধ বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করেছিল। শ্রেণী-ব্যবধানের প্রাচীর ডিঙিয়ে যোগাযোগের প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছিল। বোমা যখন মানুষে মানুষে পার্থক্য স্বীকার করে নি, তখন মানুষেই বা কেন পার্থক্য স্বীকার করবে?

তথাপি একথা স্বীকার্য্য যে একমাত্র যুদ্ধকালীন উৎপাদন এবং যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণবিধি প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। ব্রিটেনের অর্থনীতি পূর্ব্বে যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যুর বিভীষিকার সম্মুখে মানুষ যেখানে এক হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে জীবন উপভোগের বেলায় কেন বৈষম্য থাকবে? মানুষ কেন সেটা সহ্য করবে? চার্চ্চিলের কথার সূত্র ধরে সাধারণ মানুষও বল্ছে ইংলণ্ডের মৃত্যু নাই। কিন্তু কেমন সে ইংলণ্ড? নিকেতনশোভিত ইংলণ্ড, না বস্তিকলঙ্কিত ইংলণ্ড? সে ইংলণ্ডে কি জীবিকার পূর্ণ আশ্বাস থাকবে, না কি তখনও বেকারত্ব থাকবে এবং বেকারদের রাষ্ট্রের দয়ার দান ক্ষুৎকণার উপর নির্ভর করতে হবে? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা? না শুদ্ধমাত্র মৃত্যুর কোলে নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চয়তা? যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানকে কেন্দ্র করে সহযোগিতার মনোভাব উদ্দীপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অতীতের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাবও জাগ্রত হয়েছিল।

ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে আসার পর নাইট-ফাইটার স্কোয়াড্রনের নায়ক জনৈক তরুণ বিমানচালক তার নূতন হ্যারিকেন বিমানের গায়ে অঙ্কিত চিহ্নগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পনেরোটি হলদে ক্ষুদ্রাকৃতি স্বস্তিক চিহ্ন বিমানটির গায়ে আঁকা ছিল। তাদের দেখিয়ে বৈমানিক বললে, "যে পনেরোটি নাৎসী বিমানকে আমি গুলি করে ভূপাতিত করেছি এগুলি তারই চিহ্ন।" বিমানের এক ধারে সে এমন সস্নেহে হাত রাখলো যেন ঘোড়ার পিঠ চাপড়াচ্ছে! হঠাৎ সে বলে উঠলো, "আপনি কি মনে করেন যুদ্ধ শেষ হলে আমরা বেকার হয়ে পড়বো?" তার প্রশ্নে উৎকণ্ঠার চাইতে বিমূঢ়তার ভাবই বেশি। যুদ্ধকালে দেশের সে সেবা করলো, দেশ কি শান্তিকালে তার কাজের সংস্থান করতে পারবে না? তার কথায় স্পষ্টই বোঝা গেল শ্রমিক দলের প্রতি সে সহানুভূতিশীল। অর্থনৈতিক শক্তি-ধারকদের শক্তিত্যাগে অনিচ্ছা লক্ষ্য করে, স্বীয় অর্থনৈতিক শক্তির স্বল্পতা সম্পর্কে সচেতন শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সামাজিক ও অর্থ-

নৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী। উন্নততর জীবনের জন্য প্রত্যেকটি আধুনিক আন্দোলনই মূলতঃ রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করবার আন্দোলন। সেইজন্যেই শ্রমিকরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে উৎসুক। বিত্তবানদের করায়ত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা জনতা ভোটের জোরে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

কাজেই যে যুদ্ধ ইংলণ্ডে সামাজিক ঐক্যের কারক হয়েছিল সেই যুদ্ধের মধ্যেই আবার সামাজিক সংঘাতের বীজ নিহিত ছিল।

আমার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে সংবাদপত্রগুলি বোমাবিক্ষত প্লিমাথ সহর পরিদর্শনরত চার্চ্চিলের একটি আলোকচিত্র ছাপিয়েছিল। ছবিতে আছে চার্চ্চিল এক সঙ্কীর্ণপরিসর রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, মুখে তাঁর অপরিহার্য্য সিগার। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, চার্চ্চিলের সর্ব্বোত্তম মৃদুহাসি। তাঁর সম্মুখে, অব্যবহিত পশ্চাতে, এবং কাছাকাছি দুই ধারে নরনারী ও শিশুর দল ভীড় করে চলেছিল। স্বতঃস্ফুর্ত্ত এক গণ-অভিব্যক্তি! তাঁর মাথার প্রায় ঠিক উপরেই কতকগুলি লোক দোতলার বারান্দা থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল; আর তিনি টুপি খুলে সেটিকে তাঁর বেতের লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে টুপিটি শূন্যে আন্দোলিত করছিলেন। এ হচ্ছে খাঁটী গণতন্ত্রের চিত্র! অগণিত ও অজ্ঞাত জনতা চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে, মাঝখানে ডিক্টেটর দাঁড়িয়ে আছে—এরকম দৃশ্য বিরল। ডিক্টেটর ও জনগণের মধ্যে ব্যবধানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর; সে প্রাচীর শুধু পাথরের নয়, ভয়েরও। চার্চ্চিল ব্রিটিশ জনগণ সম্পর্কে ভয়হীন; ব্রিটিশ জনসাধারণেরও তাঁকে ভয় করবার কিছু নেই। কিন্তু ডিক্টেটরদের প্রতিষ্ঠাই ভয়ের উপর নির্ভরশীল।

অথচ চার্চ্চিল জনগণেরও লোক নন। ইংরাজেরা আমাকে প্রায়ই বল্‌তো—যুদ্ধের আগেও বলেছে, ১৯৪১ সালে আমার ইংলণ্ড সফর কালেও বলেছে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বহুলোক হতাহত হওয়ার

ফলেই যুদ্ধান্তবর্ত্তী বৎসরগুলিতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দুরবস্থা। তারা বল্‌তে চায়, আজকে যারা নেতা হ'তে পারতো তাদের সবাই বিগত যুদ্ধে ট্রেঞ্চের কাদায় মারা গেছে। কথাটা আংশিক সত্য। গুরুগম্ভীর আর্থিক বিষয়ক সাপ্তাহিক 'ইকনমিষ্ট'-এর মন্তব্যে সত্যের আরও স্পষ্টতর আভাস পাওয়া যায়। ১৯৪২ সালে কাগজটি লেখেন, "এ কথা অনস্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা নেতা তাঁদের অধিকাংশই এমন একটা শ্রেণী থেকে আহৃত, সমগ্র জনসংখ্যার বিশ ভাগের এক ভাগ লোক মাত্র যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, জনমান্য 'ইকনমিষ্ট'-এর মতে, এই সব নায়ক "যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত নন।"

'ইকনমিষ্ট' আরও লিখেছেন, "চার কোটি আশি লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রেট ব্রিটেনের শাসনকার্য্য পরিচালিত হচ্ছে কেবলমাত্র বিশ লক্ষ অধিবাসীর প্রতিনিধিস্থানীয় মস্তিষ্কগুলির দ্বারা। এর সঙ্গে দু'চারটি অসীম প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের নাম যোগ করা যায় যারা ব্যবধান ডিঙ্গিয়েই বড় হয়। কী সে ব্যবধান?—বিত্ত ও সামাজিক পদমর্য্যাদার ব্যবধান। 'ইকনমিষ্ট'-এর উপসংহারমন্তব্য—"দেশজ প্রতিভার যথাযথ প্রয়োগ এপথে হ'তে পারে না।" ব্রিটেনের জনবলের স্বল্পতার সমস্যা আংশিক ভাবে মনুষ্যকৃত। ১৯৪১ ও ১৯৪৫ সালের অন্তর্ব্বর্ত্তী বৎসরগুলির মধ্যে দশ দশটি বৎসরই কেটেছে ব্যাপক যুদ্ধবিগ্রহে (অর্থাৎ একত্রিশ বৎসরের ভিতর দশ বৎসর।) এতে ব্রিটেনের জনবলের যে ক্ষতি হয়েছে তাতে অবশিষ্ট জনবলের যোগ্যতাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করবার প্রয়োজন আরও বেশী অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। সেইজন্যেই সামাজিক ব্যবধান ঘুচাবার দাবী উঠেছে।

১৯১৭ সালে রুশিয়াতে মুষ্টিমেয় অভিজাত বিত্তবান শাসকগোষ্ঠী এবং অগণিত দরিদ্র নির্য্যাতিত শ্রমিক ও কৃষকের ভিতর ব্যবধানের

প্রাচীর ছিল অতি উচ্চ। তবে সে প্রাচীর ছিল সঙ্কীর্ণ ও ভঙ্গুর। রাইফেল, গ্রেনেড ও কথার কয়েকটি মুষ্ট্যাঘাতেই সে দেয়াল পড়লো ধ্বসে—ব্যবধান চিহ্নগুলি গুঁড়িয়ে বোমার টুকরোর মত ছত্রখান হয়ে পড়লো। তাদের আর চিনবার যো রইলো না। রুশিয়ার অনুন্নত অবস্থার দ্যোতক হিসাবে তার ব্যবধানের প্রাচীরটি ছিল দারুময়। আর অন্যত্র সেই প্রাচীর শক্ত কংক্রীট ও ইস্পাত দিয়ে গড়া। ইংলণ্ডের সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলি জাতির সেবা, বিদ্যাবত্তা, শাসন-কার্য্যের কুশলতা ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার নজীরের পিছনে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত; যে শিল্প, বানিজ্য, ব্যাঙ্কিং প্রচেষ্টা দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে তার পেছনে তারা আত্মগোপন করে আছে। তাদের স্থানচ্যুত করা সহজ নয়। কিন্তু প্রাচীরের ওধারে যে চার কোটি ষাট লক্ষ সাধারণ মানুষ রয়েছে তারাও বসে নেই; বিত্তবান বিশ লক্ষ মানুষ তাদের যে সমস্ত সুযোগসুবিধা থেকে এ যাবৎ বঞ্চিত করে এসেছে তারা এখন সেসব সুযোগ নিজেদের জন্যে দাবী করছে। এই দাবী স্বাভাবিক, কেন না, আত্মঘাতী বল্ড্‌উইন-চেম্বারলেন তোষণনীতির দৃষ্টান্তে শাসকশ্রেণীর প্রতি তাদের পূর্ব্বের শ্রদ্ধা আর নেই, এদিকে যুদ্ধের ফলে তাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ অনেক বেড়ে গেছে।

ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী সংগ্রাম কিভাবে পরিচালনা করতে হয় জানে। কিন্তু তারা যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করে নি। এই করণে ১৯৪১ সাল থেকেই একটা রব উঠেছিলো যে শান্তি চুক্তির দায়িত্ব রক্ষণশীলদের উপর ছেড়ে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত হবে না।

১৯৪১ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি লিখি, "নাৎসীদের প্রতিরোধ করবার ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতি এক ও অখণ্ড কিন্তু মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ব্রিটেনের পুরনো ব্যবস্থা—যে ব্যবস্থা তাদের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক—অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করছে। এদিকে

জনসংখ্যার অধিকাংশ চেষ্টা করছে এক নূতন ব্রিটেন সৃষ্টির জন্যে। ....বাস্তবিক পক্ষে, ব্রিটেন দুইটি যুদ্ধে নিয়োজিত—হিটলারের নব বিধানের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধের মুখ ; অপর যুদ্ধ চালিত হচ্ছে নেভিল চেম্বারলেন পোষিত পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।" চেম্বারলেনের নামের সঙ্গে চার্চ্চিলের নামও যোগ করা যায়।

বামপন্থী ব্রিটিশ নাট্যকার জে বি প্রিস্টলি তাঁর "Out of the People" বইতে লিখেছেন, "যথার্থ ব্রিটেনকে সংগ্রামে নিয়োজিত করবার কোন অধিকার নাই যদি তারপরই ঘোষণা করা হয় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অযথার্থ এক ব্রিটেনকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হচ্ছে।" প্রিস্ট্‌লিকে আর বেতার বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয় না। হ্যারল্ড ল্যাস্কির ভাগ্যেও অনুরূপ সম্বর্দ্ধনা ঘটে। ল্যাস্কি আমায় বলেছেন, তিনি চার্চ্চিলকে এইরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। চার্চ্চিল উত্তর দেন, "আমরা যে ইংলণ্ডকে চাচ্ছি আপনারা চাচ্ছেন তার থেকে ভিন্নতর এক ইংলণ্ড। সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা।" সে যা হোক্, লাস্কি, প্রিস্ট্‌লি এবং অন্যান্য বিদ্রোহীরা স্থল ও বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে লাগ্‌লেন, নিবন্ধাদি ও পুস্তক রচনা করলেন এবং যে কথা তাঁরা ইংলণ্ডকে বল্‌তে বাধা পেলেন সেকথা বেতার বক্তৃতার মারফৎ ডোমিনিয়ান সমূহের অধিবাসীদের বল্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও অনুরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলাম। ব্রিটিশ ব্রড্‌কাষ্টিং কর্পোরেশন আমাকে লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ এবং উত্তর আমেরিকার উদ্দেশে—কিন্তু ইংলণ্ডের উদ্দেশে নয়—বেতার-বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানালেন।

অবশ্য যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের অধিবাসীদের স্বাধীনতা কিছু কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তবে সে খুব বেশি নয়। ইংলণ্ড আগাগোড়া স্বাধীন রয়ে গেছে। বাথের নিকটে এক রাজকীয় বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে

জন ষ্ট্র্যাচীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ষ্ট্র্যাচী সাম্যবাদের সমর্থক ছিলেন। ষ্টালিন-হিটলার চুক্তির পর কম্যুনিষ্টদের ন্যায় তিনিও যুদ্ধবিরোধী হয়ে পড়েন। কিন্তু ১৯৪০ সালের বসন্তে নরওয়ে অভিযানের পর তাঁর মনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি বিমান আক্রমণ ওয়ার্ডেনের খাতায় নাম লেখান এবং বোমাকবলিত নগরী ও অধিবাসীদের উদ্ধারসাধনে রত হন। তারপর তিনি বিমানবাহিনীতে যোগ দেন এবং এক নাইট-ফাইটার স্কোয়াড্রনের এড্‌জুটেণ্ট হন। তাঁর শয়ন-আবাসের লাইব্রেরীতে অন্যান্য বইয়ের মধ্যে কার্ল মার্ক্স, লেনিন, ট্রট্‌স্কীর বই এবং তাঁর স্বরচিত সমাজতন্ত্রী পুস্তকগুলি ছিল। কর্তৃপক্ষ সেকথা জানতেন, কিন্তু তাঁরা কিছুই বলেন নি। ব্রিটিশ জাতি পরমতসহিষ্ণু। সহিষ্ণুতা সভ্যতার একটা লক্ষণ। বৈষম্যের সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে তা সে বৈষম্য চিন্তার হোক, গাত্রবর্ণের হোক (ধমনীতে প্রবাহিত শোণিতের বর্ণ এক), জাতির হোক্, ধর্ম্মের হোক কিম্বা রাজনীতির হোক—গণতন্ত্র উপহাসের বস্তু হয়ে পড়ে।

রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল তাদের রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও যুদ্ধজয়ের জন্য সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। শ্রমিক নেতারা যেখানে চার্চ্চিলের নীতি সমর্থন করেন নি সেখানেও তাঁরা চার্চ্চিলের বিরুদ্ধাচরণে বিরত ছিলেন। চার্চ্চিল মন্ত্রিসভার অধিবেশনগুলিতে একাধিপত্য করেছেন। মন্ত্রিরা আমাকে বলেছেন, অন্য যে কোন সদস্য অপেক্ষা তিনি বেশি কথা বলতেন, কখনও কখনও সকলে মিলে যা বলতো তিনি একাই তাই বলতেন। তাঁর ভাষার ছটা সকলেই উপভোগ করতো। তাঁরা লক্ষ্য করতেন,—যেটা সাক্ষাৎকার-কালে আমিও লক্ষ্য করেছি—সাধারণ, পূর্ব্বপ্রস্তুতিহীন আলোচনায় তাঁর মুখ থেকে যে সকল বাক্য নির্গত হয়, তাঁর সযত্নরচিত বক্তৃতার বাক্যবিন্যাসের ন্যায় সেগুলিও সমান মার্জ্জিত ও গুরুগম্ভীর।

চার্চ্চিল একজন অপরিহার্য্য যুদ্ধ-নেতা, যেহেতু তাঁর উদ্যম ও

বক্তৃতার আলোড়ন জনগণকে সঞ্জীবিত করে তোলে। কিন্তু তিনি উৎপাদন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমস্যা অবহেলা করেছেন—অর্থনীতির প্রতি চার্চ্চিলের স্বভাবপ্রীতি নেই। কয়েকবার তিনি নিজেও সেটা স্বীকার করেছেন। নৌ ও স্থল সেনাপতিদের সঙ্গে মিলে মানচিত্র ও ভূগোলক তন্নতন্ন করে অনুধাবন করা এবং রসায়নবিৎদের সঙ্গে নূতন নূতন বিস্ফোরক সম্পর্কে আলোচনা করা—এগুলিই তিনি পছন্দ করতেন।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁর কোনো ঔৎসুক্য নেই। শান্তিসমস্যা সম্পর্কিত তাঁর উক্তিগুলিই এর প্রমাণ। অতীতের প্রতি আনুগত্য বন্ধনে তিনি বাঁধা; উনবিংশ শতকের মানসসন্তান তিনি এবং তিনি সেই যুগটিকেই ভালোবাসেন। সাম্রাজ্য, রাজৈশ্বর্য্য এবং শ্রেণিভেদ তাঁর প্রিয়। যদিও তিনি সৌখীন নেশা হিসাবে রাজমিস্ত্রীর কাজ জানেন, সত্যিকার রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে তিনি তাঁর সাময়িক বৈষম্য ঘোচাতে পারেন নি। চার্চ্চিল হলেন জন্ম-অভিজাত। লয়েড জর্জ্জ ব্রিটিশ উচ্চ শ্রেণিসমূহ, সৈনানীমণ্ডল ও অভিজাতদের ঘৃণা করতেন। তিনি এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। আর চার্চ্চিল চান তাদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে। এটা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক, কারণ চার্চ্চিলের সঙ্গে সাধারণ অভিজাতদের তুলনা হয় না। বস্তুতঃ চার্চ্চিলের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে অভিজাতশ্রেণী চার্চ্চিলকে ভয় করে এবং ১৯৪০ সালের জাতীয় বিপর্য্যয়ের আগে পর্য্যন্ত তারা তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয় নি। অথচ তাদের শ্রেণিস্বার্থ ও ঐশ্বর্য্য রক্ষা করবার জন্যে চার্চ্চিলের আয়াসের অন্ত নেই। যে উনবিংশ শতক এই অভিজাত শ্রেণীগুলিকে গ'ড়ে তুলছে তার প্রতিই চার্চ্চিলের আকর্ষণ; এদের প্রতি ততোটা নয়। উনবিংশ শতক হ'লো সত্যিকারের ব্রিটিশ প্রভুত্বের শতাব্দী, নেপোলিয়ন শাসিত ফ্রান্সের পতন এবং জার্ম্মানীতে কাইসারের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্রিটিশ আধিপত্যের স্বর্ণযুগ;—রাণী

ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নগৌরবের শতাব্দী। ব্রিটেনের অতীত গৌরবের বিগ্রহের বেদীমূলে চার্চ্চিলের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিঃশেষে নিবেদিত। তাঁর চোখে অভিজাত শ্রেণীর অস্তিত্ব ও ইংলণ্ডের বিরাটত্ব সমার্থবাচক শব্দ। ভারতবর্ষকেও তিনি এই চোখেই দেখেছেন। উনিশ শতকের ইংলণ্ডের পরিষদীয় গণতন্ত্রকেও তাঁর এই চোখেই দেখা।

কিন্তু ইংলণ্ডের ঐতিহ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা চার্চ্চিল বিস্মৃত।

গণতন্ত্র ও দারিদ্র্যের মধ্যে যে বৈষম্য তা চার্চ্চিলের বিবেককে আদৌ পীড়া দেয় নি। ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও ভারতের পরাধীনতার মধ্যে যে স্বতোবিরোধিতা তা তাঁকে বিচলিত করে নি। মুসোলিনি ব্রিটেনের শত্রু হওয়ার আগে ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনিকে প্রশংসা করতেও তাঁর আটকায় নি। জেনারেলিসিমো ফ্রান্সিস্কো ফ্রাঙ্কো সম্পর্কেও তিনি "প্রশংসা মধুর" বাক্য ব্যবহার করেছেন। নাৎসী শাসনের বর্ব্বরতা চার্চ্চিলের চোখে বিভীষিকাময় ছিল। তাঁর নিকট হিট্‌লার সব ছাড়িয়ে ব্রিটেনের প্রতি জার্ম্মানীর আক্রমণ সম্ভাবনার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়েছিলো। তিনি এই সম্ভাবনা গোড়াতেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং ব্রিটেনকে সতর্ক করেও দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটেন তাঁর কথায় কান দেয় নি।

নেতৃত্বের প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণই হ'লো চার্চ্চিল-চরিত্রের চাবিকাঠি স্বরূপ। নেতা হিসাবে তাঁর স্ফুর্ত্তির অন্ত নেই—তিনি যেন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি জানেন জনগণ তাঁর কথা গোগ্রাসে গেলে। তাঁর কোন একটি রসাত্মক কথায় কমন্স সভার সদস্যদের হাস্যধ্বনি তাঁকে আমি চেখে চেখে উপভোগ করতে দেখেছি। অভিনেতার ভাবভঙ্গী তাঁর মধ্যে যথেষ্ট, আবার ডানপিটে ছেলের ভাবও কিছুটা আছে। তিনি একাধারে বালক ও রাষ্ট্রনীতিক। তাঁর কোটো

নেওয়া হোক, এ তাঁর খুব পছন্দ। প্রশস্ত নাট্যমঞ্চের উপর কেন্দ্রীয় চরিত্র অভিনয় করতেই তিনি ভালোবাসেন। আধুনিক গ্রন্থকার-রচিত ইতিহাস-পুস্তকের মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট ইতিহাস পুস্তকের লেখক চার্চ্চিল এক্ষণে নিজের জীবন দ্বারাই চূড়ান্ত ইতিহাস রচনা করেছেন। নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্ব ও লোকপ্রিয়তার ফলে যেন চার্চ্চিলের মধ্যে নূতন নূতন শক্তির উৎস খুলে গিয়েছে।

চার্চ্চিল অতীতের রোমাঞ্চ এবং বর্ত্তমানের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা মনে প্রাণে অনুভব করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যদ্দৃষ্টি তাঁর নেই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি কবি, নেপোলিয়ন ও বায়রণকে মেশালে যা হয়। কথা ও কাজ দুইই তিনি ভালোবাসেন। বর্ত্তমান যুগে এই সমন্বয় প্রায় বিরল। হিট্‌লারের এটা ছিল।

চার্চ্চিলের উদ্যম অফুরন্ত, তাঁর উদ্দীপনা প্রচুর। কর্ম্মারম্ভের তাগিদও তাঁর মধ্যে অপরিসীম। কোনো কোনো গণতান্ত্রিক নেতা জনমত সুস্পষ্টভাবে গ'ড়ে না ওঠা পর্য্যন্ত দেশকে তদানুযায়ী চালিত করতে দ্বিধাবোধ করেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মধ্যে এই দ্বিধা কয়েকবার দেখা গেছে। কিন্তু চার্চ্চিল বেপরোয়াভাবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং আশা করতেন যে ইংলণ্ড হাবুডুবু খেয়ে হলেও তাকে অনুসরণ করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিটলার কর্ত্তৃক রুশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বেতার মারফৎ চার্চ্চিলের রুশিয়াকে অবিলম্বে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা যায়। সেদিন চার্চ্চিল যা করলেন তেমন ভাবে বিশ্বের জনমতকে প্রভাবিত করতে বোধ হয় আর কোন মানুষ পারে নি।

চার্চ্চিল জয় কামনার নিকট আর সকল প্রয়োজনকে খাটো করেছিলেন। ১৯১৮, '১৯, '২০ এই তিন বৎসর বলশেভিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি সশস্ত্র ব্রিটিশ প্রতিরোধ বাহিনী গ'ড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বলশেভিক-বিরোধী মনোভাবের আর পরিবর্ত্তন ঘটে নি। ১৯৪১

সালের ডিসেম্বরে হোয়াইট হাউসে প্রদত্ত এক ভোজসভায় তিনি তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে বলেছিলেন, "রুশিয়া ভয়াবহ স্বৈরাচারের দেশ।" কিন্তু এসবে কিছুই এসে যায় নি, কেননা জয়ের পক্ষে রুশিয়ার সহিত সহযোগিতা অপরিহার্য্য ছিলো। যুদ্ধজয়ের প্রতি চার্চ্চিলের অখণ্ড ও ঐকান্তিক মনোযোগের কথা তাঁর দেশবাসী জান্‌তো। এই উৎসাহ সংক্রামক ছিল। তাঁর বিরুদ্ধবাদীদেরও এর ফলে তাঁদের বিরুদ্ধতার সুর নিচু পর্দ্দায় বাঁধ্‌তে হয়েছিলো। আনিওরিন্ বীভান ও হ্যারল্ড লাস্কি ক্রমাগত চার্চ্চিলকে সমালোচনা করছিলেন এবং চার্চ্চিলও তাঁদের পাল্টা আঘাত করছিলেন। কিন্তু পার্টি হিসাবে শ্রমিক দল তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে; গভর্ণমেন্টের কতিপয় শ্রমিক সদস্য, বিশেষতঃ এলেন উইল্‌কিন্‌সন্, চার্চ্চিলের আকর্ষণের নিকট আত্ম-সমর্পণই করেছিলেন।

শ্রমিক মন্ত্রীরা ইতিমধ্যে দেশ শাসনের কৌশল শিক্ষা করছিলেন। একদিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে হার্ব্বার্ট মরিসনের অফিসে আমি যাই। সেখান থেকে আমরা মরিসনের গাড়ীতে এলেন উইলকিন্‌সনের ছোট্ট বিশ্রাম নিকেতনে সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাতে যাত্রা করি। মরিসন বল্‌লেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বই পড়ার মতো অবসর তিনি পান (এলেন উইল্‌কিন্‌সন হেমিংওয়ের For whom The Bell Tolls এবং জ্যান ভাল্‌টিনের Out of the Night-এর নাম করলেন), কিন্তু শাসন পরিচালনার রীতিপদ্ধতি জান্‌বার জন্যে সরকারী দলিলপত্র, বিশেষতঃ বৈদেশিক দপ্তরের চিঠি পত্রাদি অনুধাবন করবার দিকেই তিনি যতোটা বেশি সম্ভব সময় দেন। অন্যান্য শ্রমিক মন্ত্রীরাও যে মন্ত্রীসভায় তাঁদের সদস্যপদের অনুরূপ সুযোগ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শাসনকার্য্যে পাঁচ বৎসর কালব্যাপী সক্রিয় অংশ গ্রহণের পর এবং ব্রিটেনের জয়ের পর শ্রমিক দলের প্রতি শাসন কার্য্যের অযোগ্যতার অপবাদ আরোপ করার আর উপায় ছিলো না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব নির্ব্বাচন অভিযানের সময় রক্ষণশীল দল শ্রমিক দলের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত যে যুক্তি প্রয়োগ ক'রে এসেছে এখন আর সে যুক্তি খাট্‌লো না। কতকাংশে এই জন্যেই ১৩৪৫এর জুলাইয়ের নির্ব্বাচনে শ্রমিকদলের নিঃসংশয় জয় ঘটেছে। ১৯৪১এর ১৬ই আগষ্ট আমি "The Nation" কাগজে লিখি, "শ্রমিক দল বিশ্বাস করে যে, উচ্চমধ্য ও মধ্যশ্রেণী শ্রমিকদলের স্বদেশপ্রাণতায় কখনও বিশ্বাস করেনি এবং বরাবরই তাদের যোগ্যতায় সন্দেহ ক'রে এসেছে, শ্রমিকদল বিশ্বাস করে যে তাদের মধ্যে অনেককে এরা স্বমতে আনয়ন করছে।"

মরিসনের বয়স তিপ্পান্ন। সচল ও সক্রিয় তাঁর মন; রসরসিকতা ও সজীবতায় তিনি ভরপূর। লণ্ডনে সকলেই তাঁকে চেনে, তাঁর পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিকট তিনি "আর্ব্বার্ট," অথবা সোজাসুজি "আর্ব্ব"। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন বার্ত্তাবাহী বালক; তারপর কিছুকাল টেলীফোন অপারেটরের কাজ করেছিলেন। উত্তর জীবনে তিনি লণ্ডন কাউন্টি কৌন্সিলের নেতা নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৪০ সালে চার্চ্চিল মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ভার গ্রহণ করেন।

একদিন স্বরাষ্ট্রদপ্তরের প্রতীক্ষা-গৃহে মরিসনের জন্যে অপেক্ষা করছি, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাধারের উপর একটি লাল ফ্রেমের উপর আমার চোখ পড়লো। ফ্রেমটি দৈর্ঘ্যে নয়, প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি আন্দাজ হবে; তার ভিতরে একটি শাদা কাগজে বড়ো বড়ো লাল অক্ষরে "মৃত্যু দণ্ডাদেশ" কথাটি মুদ্রিত। শিরোনামার নিচে নামের একটা তালিকা এবং নামের পাশে স্তম্ভগুলিতে বিস্তৃত বিবরণ। আমার মনে হলো জিনিষটাকে অধিক খুঁটিয়ে দেখা আমার পক্ষে হয়তো উচিত হবে না। কিন্তু মরিসনের অন্তর্কক্ষে প্রবেশ করতেই মরিসন তাঁর সেক্রেটারী মিস্ ম্যাক-

ডোনাল্ডকে বল্‌লেন, "এঁকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাগুলি দেখাও।" মিস্‌ ম্যাক্‌ডোলাণ্ড বারোটি নামযুক্ত একটি তালিকা আমাকে দেখালেন। প্রত্যেক নামের বিপরীতে অপরাধের স্বরূপ, দণ্ডদানের তারিখ, আপীলের তারিখ এবং বিচারালয়ের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রথম দুইটি নাম এবং তাদের সম্পর্কিত বিবরণীর মাঝখানে হাতে টানা লাল একটি রেখা এবং এই দুইটি নামের সর্ব্বশেষ স্তম্ভে লাল কালিতে লেখা: "ফাঁসী হয়ে গেছে।" মরিসন বল্‌লেন যে প্রথম প্রথম মৃত্যুদণ্ডের আদেশপত্রে নাম সই করতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে, কারণ এই সইটির উপরই একটা লোকের জীবনমরণ নির্ভর করছে। কিন্তু পরে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বিশেষ ক'রে যুদ্ধকালে, রাষ্ট্রকর্ত্তৃক কিছু লোকের প্রাণ হরণ অপরিহার্য্য; এবং যতোই তিনি চূড়ান্ত আদেশপত্রে নাম স্বাক্ষর করতে বিলম্ব করবেন ততোই তাঁকে অধিক বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে।

"শুধু নামের আদ্যক্ষর সই? পূরো নাম নয় কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

মরিসন বল্‌লেন, "স্বরাষ্ট্রদপ্তরের রীতি অনুযায়ী আদ্যক্ষর সই করাটাই রেওয়াজ, পূর্ণ নামস্বাক্ষরের রীতি এখানে নেই।" রাজা কর্ত্তৃক করুণাপ্রদর্শনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পরও মৃত্যুদণ্ড-পালনকারীকে হার্ব্বার্ট মরিসনের "H. M. S." স্বাক্ষরটির জন্য অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তে হবে।

মরিসন জন্মযোদ্ধা। বাম চক্ষুতে শুধু তিনি দেখেন, কিন্তু দেখেন অনেক কিছু। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জন্ম, কাজেই দারিদ্র্যকে তিনি ঘৃণা করেন। মরিসনের জীবনযাপনপ্রণালী সরল। কোনরূপ লোকদেখানোপনা তাঁর নেই। আর্নেষ্ট বেভিন ও তাঁর মধ্যে খানিকটা রেষারেষি আছে, তা নইলে মরিসন শ্রমিক দলের নেতা হ'তে পারতেন, তাঁর বন্ধুরা বলে। কিন্তু বেভিন কিম্বা মরিসন

কারও পক্ষেই যখন নেতা হওয়া ঘট্‌লো না, ক্লেমেণ্ট এট্‌লী মাঝখান থেকে নেতৃপদে অভিষিক্ত হলেন।

আর্নেষ্ট বেভিনের প্রচণ্ড দেহ, প্রবল বিক্রম। অত্যন্ত শক্ত, মজবুত লোক তিনি। শ্রমিকদের তিনি খোলাখুলিই অভিজাতদের চাইতে অধিক পছন্দ করেন। চার্চ্চিল মন্ত্রিসভায় উৎপাদন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিহিসাবে তিনি চমৎকার কাজ করেছেন। তাঁর শত্রুরা পর্য্যন্ত এবিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করে। মন্ত্রিসভায় যোগদান করার পূর্ব্বে বেভিন ইংলণ্ডের বৃহত্তর শ্রমিক-সংগঠন Transport Workers Union বা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়নের পরিচালক ছিলেন। সংগঠনটি তাঁর দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ ছিল। বেভিনের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎকার করতে যাই, কিন্তু সাক্ষাৎকারটি চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ব্রিটেনের যুদ্ধপূর্ব্ব বৈদেশিক নীতির সমালোচনার দ্বারা আমি বোধ হয় তাঁকে চটিয়ে দিয়ে থাক্‌বো। স্বদেশপ্রাণ তিনি, কাজেই স্বদেশের বিরূপ সমালোচনা তিনি সইতে পারেন নি। প্রায় এক ঘণ্টার উপর আমি তাঁকে আমার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা কওয়াবার চেষ্টা করি ; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কলহ করবেনই। শেষে হতাশ হ'য়ে আমি রণে ভঙ্গ দিই।

মরিসন, বেভিন এবং বাণিজ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিউ ডালটন (বৈদেশিক বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অনুসন্ধিৎসার জন্য আমি তাঁকে অনেক বৎসর ধরেই জানি)—ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক দলীয় সংগঠনগুলিতে কম্যুনিস্টদের বিরক্তিকর, সংহতি-বিনাশী কার্য্যকল্যাপের জন্য এঁরা তীব্র কম্যুনিষ্টবিরোধী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু প্রধানতঃ স্বাধীনতার প্রতি নিষ্ঠা থেকেই ব্রিটিশ শ্রমিক নেতাদের এবং শ্রমিক জনসাধারণের কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতার উদ্ভব। অনেক শ্রমিক দলীয় সদস্যই সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী, কিন্তু তারা পুঁথিগত মার্ক্সবাদের অনুগত নয়। বিশেষ

কয়েকটি মূল শিল্প এবং ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয়করণ তারা চায়। দারিদ্র্য ও অসহায় ব্যক্তিদের অভিযোগের প্রতিকারোদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ারও তারা পক্ষপাতী। তাদের সমাজতন্ত্রবাদকে এককথায় বলা যায় "মানবহিতবাদ"। তাদের এই মতবাদে কোনো গোঁড়ামি নেই, মানবজাতির ভাগ্যোন্নয়নের উপায় হিসাবেই তা বিচার্য্য।

শ্রমিক দলীয়রা হ'লো সোশ্যাল ডেমোক্রাট—সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রবাদী। সমাজতন্ত্রী হ'য়েও তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। এখানেই কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য। কম্যুনিষ্টরা সমাজতন্ত্রবাদী হয়েও গণতন্ত্রে বিশ্বাসবান নয়, তাদের আচরণও তদ্বিপরীত। এই কারণেই সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের ভীষণ আড়াআড়ি। শ্রমিক দলীয় এবং কম্যুনিষ্টদের পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি অনেক সময় পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে এদের নিজ নিজ দলের বৈরিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে তীব্রতার দিক থেকে।

কম্যুনিষ্টরা যে অতিমাত্রায় বামপন্থী তা-ও নয়। শ্রমিক দলের আনিওরিন বিভান পরিচালিত চরমপন্থী অংশ—যারা "Ginger Group" নামে পরিচিত—কম্যুনিষ্টদেরকে তাদের চাইতে অনেক বেশি দক্ষিণপন্থী ব'লে মনে করে। চার্চ্চিলের প্রতি বিভান, রাসেল ষ্ট্রস এবং তাঁদের বন্ধুদের বিশেষ কোনো অনুরাগ নেই। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের ধ্বনি হ'লো কি না: "দ্বিধাহীনভাবে চার্চ্চিলকে সমর্থন কর।" লণ্ডনের প্রচারদপ্তরের বাইরে এক খোলা ময়দানের সভায় আমি কম্যুনিষ্ট নেতা হ্যারী পোলিটকে বক্তৃতা দিতে শুনেছি। যে পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তাতে লেখা ছিল: "গভর্ণমেণ্টকে শক্তিশালী কর।" কয়েকটি উপনির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্টরা শ্রমিক প্রার্থীদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল।

ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মস্তিস্ক ও বুদ্ধির উজ্জ্বলতা তার বামপন্থী অংশে নিহিত; আর তার ভার ও শক্তি রয়েছে তার দক্ষিণপন্থী অংশে। "ক্লেম" এট্‌লী রয়েছেন শ্রমিক দলের ঠিক কেন্দ্রমধ্যে। পার্টির অধিকাংশ তার দক্ষিণে; বামে যারা রয়েছে তারা এট্‌লীর নেতৃত্বাধীন উগ্র সংগ্রামপন্থী। বাকী যেটুকু করবার সেটুকুর ভার ঘটনাবলীর উপর। এট্‌লীকে পার্লামেণ্টে তাঁর দপ্তরে (বিরোধী দলের নেতারূপে তার একটি বিশেষ দপ্তর ছিল এবং তিনি গভর্ণমেণ্ট থেকে নিয়মিত বেতন পেতেন।) এবং হাউস্ অব্ কমন্‌স্-এর ভোজন কক্ষে আমি বহুবার দেখেছি। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় আমরা দুজনে স্পেনে ছিলাম। ১৯৪১ সালে আমি ১১ নং ডাউনিঙ্ ষ্ট্রিটে এট্‌লীর সঙ্গে দেখা করি। চার্চ্চিলের সরকারী বাসস্থানের গায়েই এট্‌লীর দপ্তর। এটলী ছিলেন সহকারী প্রধান মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রী তখন অতলান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত এক উপসাগরে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাতনিরত। সেখানে "Augusta" যুদ্ধ-জাহাজের উপর তাঁরা অতলান্ত সনদ রচনা করেন। তারিখটি ছিল ১৪ই আগষ্ট। সেই দিনই সকালে সংবাদপত্র ও বেতারে রহস্যজনকভাবে এবং বিশেষ জাঁকজমকের সহিত ঘোষিত হয়েছিলো যে এট্‌লী বৈকালে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। রিফর্ম্ম ক্লাবে এক বন্ধুর সঙ্গে ব'সে আমি দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সমাধা করলাম। এট্‌লী কী বল্‌বেন না বল্‌বেন সেই নিয়ে জল্পনাকল্পনার অবধি ছিলো না। কেউ কেউ আশা করছিলো, যুক্তরাষ্ট্র হয়তো যুদ্ধে যোগ দেবে। রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল মিলে যুদ্ধাদর্শ বর্ণনা করবেন—অধিকাংশের চিন্তা এই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করেই আবর্ত্তিত হয়েছিল। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর বিশ্রামকক্ষে একটি "জাত-ইংরাজ" গোছের শীর্ণকায় বৃদ্ধ বল্‌লেন, "আমরা কী জন্যে যুদ্ধ করছি তাই নাকি উনি বল্‌বেন। আমরা তো জানিই সেকথা—আমরা হিট্‌লারকে পরাজিত

করতে চাই।” বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে আমরা পনেরো জন বসে বেতার-বক্তৃতা শুন্‌লাম। এট্‌লী নীরস, অনুত্তেজ কণ্ঠে তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন। চার্চ্চিলের চমৎকার রেডিও বক্তৃতা শুনে শুনে ইংরেজদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে, আর কিছুতেই তাদের মন ওঠে না। এটলী অতলান্ত সনদের অষ্টবর্গ ধারা প'ড়ে শোনালেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র প্রত্যেকে স্থানত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলো। কারও মুখে প্রশংসা বাণী শোনা গেল না। কেউ সামান্য একটু মন্তব্যও করলো না। কেউ যে অভিভূত হয়েছে তাও বোধ হ'লো না। প্রত্যেকেরই ভঙ্গীতে নৈরাশ্য—যেন এটলী তাদের আশার মুখে ছাই দিয়েছেন। সকলেই আশা করেছিলো আমেরিকা ব্রিটিশের সঙ্গে যোগ দেবে এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

ক্লাব থেকে আমি সোজা ১১, ডাউনিঙ্‌ ষ্ট্রীটে এট্‌লীর দপ্তরে চলে এলাম। সজীব ও দোলায়িত গতিভঙ্গীতে বৃহৎ কক্ষটি অতিক্রম করতে করতে এটলী আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে তাঁর বক্তৃতা বেতারে খুব “স্পষ্ট” শোনা গেছে। আমার কথায় স্মিতহাস্যে তাঁর মুখ ভরে উঠ্‌লো। অন্যান্য সময়ে তাঁর মুখে “পাইপ” থাকে ; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তিনি পাইপ টান্‌ছিলেন না ; কিম্বা কথা এড়াবার জন্য কেবল “হুঁ” “হাঁ” করে দায় সারছিলেন না। তিনি যেন একটু প্রগল্‌ভ হ'য়ে উঠ্‌তে চাইছিলেন, এবং কথাগুলিও খুব জোরের সঙ্গে বল্‌ছিলেন। ব্রিটিশের আভ্যন্তরীণ ও সাম্রাজ্য-নীতির মার্কিণ সমালোচকদের বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথা হলো।

এটলীর বিতর্কের ক্ষমতা প্রচুর। তাঁর যদি কিছু বল্‌বার থাকে, তা হ'লে তিনি সেটাকে সজোরে আঁকড়ে থাকবেন—কিছুতেই ছাড়বেন না। অন্যান্যদের হয়তো বিরক্তি ধ'রে যায়, কিন্তু এট্‌লী তাঁর সাদামাঠা ধরণে লড়াই চালিয়েই যাবেন। এট্‌লীর বিষয়ে বলতে

গিয়ে এলেন উইলকিন্সন লিখেছেন, "এক বিক্ষুব্ধ পার্টি মিটিংয়ে আমি তাঁকে দেখেছি। মিটিং-এ আবেগ-প্রধান ব্যক্তিরা উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আবহাওয়া অত্যন্ত গরম; এখুনি বুঝি কোন বিপর্য্যয় ঘট্‌বে, পার্টির নিরপত্তা বিপন্ন হবে। এমন সময় মিঃ এট্‌লী অতি ধীর মন্থরভাবে তাঁর আসন থেকে উঠ্‌লেন এবং শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ স্বরে তিনি তাঁর অনাবেগ অথচ বুদ্ধিদীপ্ত বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। প্রায় দুশো লোক এতক্ষণ ক্রুদ্ধ হ'য়ে সোরগোল করছিলো, এট্‌লীর বক্তৃতায় সব তারা শান্ত চিত্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো—এ আমার নিজের চোখে দেখা।"

ক্লেমেন্ট এট্‌লীকে জনগণের চিত্তে "হিরো" হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। শ্রমিক অনুগামীরা এট্‌লীর এই ত্রুটির জন্য কিছু মনে করে না; বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব বর্ণহীন হওয়ায় তারা তাঁকে আরও বেশী বিশ্বাস করে। উপাধি, বিত্ত এবং উপাধিক অভিজাতদের সহিত সাক্ষাতের আমন্ত্রণের সূক্ষ্ম উৎকোচ শ্রমিক নেতাদের বশীভূত করতে পারে—ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীর এই ভয় আছে। কিন্তু এটলীকে তারা সর্ব্ব প্রলোভনের উর্দ্ধে মনে করে। রাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ডের মতো এট্‌লী প্রমোদ বৈঠকগুলির অধিরাজ নন। রামসে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিক প্রধান মন্ত্রী হয়েও ১৯৩১ সালে রক্ষণশীল দলে যোগ দেবার লোভ সামলাতে পারলেন না।

১১, ডাউনিঙ্‌ ষ্ট্রীটে এট্‌লীর উপদেষ্টা হ্যারল্ড জে লাস্কি আমাকে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন। "একদিন আমি হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে কথা বল্‌ছি। প্রেসিডেন্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যারল্ড, আমাদের লণ্ডনস্থিত রাষ্ট্রদূত বিঙ্‌হামকে তুমি কিরূপ মনে কর? আমি বল্‌লাম যে বিঙ্‌হামের সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। প্রেসিডেন্ট বিস্মিত হলেন! আমি প্রেসি-ডেন্টকে জানালাম, বিঙ্‌হাম শ্রমিক দলীয়দের সঙ্গে খুব বেশি মেশেন

না। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের দূতবাস থেকে আমার নৈশভোজের আমন্ত্রণ এলো। ভোজসভায় এট্‌লী বিঙহামের ডান দিক ঘেঁসে বসেছিলেন। কথাবার্ত্তা খুব বেশী হচ্ছিল না। বিঙ্‌হাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেজর এট্‌লী, গুলী ছোঁড়ার অভ্যাস কি আপনার এখনও আছে?' এট্‌লী উত্তর দিলেন, '১৯১৭ সালের পর আর আমি গুলি ছুঁড়িনি।' বিঙহাম্‌ আগ্রহভরে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কী শিকার করতেন?' এট্‌লীর মৃদুকণ্ঠ উত্তর, 'জার্ম্মান'।"

কোন বাগানবাড়ির বিশ্রামকক্ষে অথবা মেংফেয়ারের হলঘরে যে এইরূপ আলোচনা চল্‌তে পারতো না সেটা নিশ্চিত।

এট্‌লী কর্ত্তৃক বেতার মারফৎ অতলান্ত সনদ ঘোষিত হবার কয়েকদিন পর আমি প্রচারসচিব ব্রেণ্ডান ব্রাকেনকে প্রশ্ন করলাম, "চার্চ্চিল নিজে কখনই অতলান্ত সনদের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাব্‌তে পারতেন না—আপনি কি একথা স্বীকার করেন? যুদ্ধাদর্শ বর্ণনার জন্য জনগণের তরফ থেকেও তাঁর উপর কোনো চাপ আসেনি। সুতরাং তাগিদটা রুজভেল্টের কাছ থেকেই এসেছে ধরে নিতে হবে।" ব্রাকেন আমার কথায় সায় দিলেন। জনগণের যুদ্ধচেতনাকে চাগিয়ে তোলার জন্যে চার্চ্চিলের সনদের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রুজভেল্টের ছিল।

অতলান্ত সনদের দুর্ব্বলতা তার পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত। শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সব মূলগত নীতিতে আস্থা প্রয়োজন তার ভিত্তিতে সনদটি পরিকল্পিত হয়নি। পক্ষান্তরে আমেরিকাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই সনদটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। এটা যুদ্ধের জন্য প্রচার; শান্তির কার্য্যনীতি নয়। শান্তিস্থাপনের কাজ সুরু হ'তে দেখা গেলো অতলান্ত সনদ প্রথমে উপেক্ষিত অথবা লঙ্ঘিত হ'লো; পরে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে গেলো।

পররাষ্ট্রসচিব এন্থনী ইডেন যুদ্ধোত্তর সমস্যা ও সামাজিক প্রশ্নাবলীর প্রতি চার্চ্চিল অপেক্ষা অধিক অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনিও ১৯৪১ সালে শান্তিসমস্যার সমাধান সম্পর্কে এতো বাক্যব্যয় করতেন না যদি না তিনি বুঝ্‌তেন যে শান্তির নীতি ঘোষণা সম্পর্কে আমেরিকা অত্যন্ত আগ্রহশীল। ইডেন বুঝেছিলেন, আমেরিকা এখনও যুদ্ধে যোগ দেয়নি, তার কারণ কার্য্যতঃ এখনও প্রথম মহাযুদ্ধেরই জের চলেছে। ১৯১৯ সালের প্রতিষ্ঠিত শান্তি অন্তর্হিত হয়েছে যারা মনে করে আরেকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে তাদের দ্বিধা জাগা স্বাভাবিক। তাই ভবিষ্যৎ শান্তির স্বরূপ সম্পর্কে তারা পূর্ব্বাহ্নে আশ্বস্ত হ'তে চায়।

ইডেন যোগ্য ব্যক্তি। অমায়িক তাঁর ব্যবহার। তাঁর সম্মুখের ছয়টি উঁচু দাঁতে তাঁর এই অমায়িকতার পরিচয় স্পষ্ট। জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসাবে ইংলণ্ডে চার্চ্চিলের পরেই তাঁর স্থান এবং চার্চ্চিলের পদের সম্ভাবিত উত্তরাধিকারী হিসাবেই তিনি পরিগণিত হ'য়ে আস্‌ছিলেন। (শ্রমিক দলের বিজয়ের কথা তখনও কারও চিন্তায় আসেনি)। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন ইডেনের জন্ম। চার্চ্চিলের তুলনায় স্পষ্টতঃই তিনি নবীনতর যুগের প্রতিনিধি। "সামাজিক নিরাপত্তা ব্যতিরেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়"—ইডেনের এই যে উক্তি সেটা বিংশ শতাব্দীর মনোভাবেরই দ্যোতক।

এন্থনী ইডেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বৎসরেই রণাঙ্গনে নিহত হন। তার দুই বৎসর পর তাঁর আরেক ভাই নৌযুদ্ধে মারা যান। ইডেন নিজেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধজনিত মৃত্যু ও যুদ্ধে যোগদানের ফলে ইডেন নূতন ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন বাঙ্গলার গভর্ণর এবং তাঁর মা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। ইডেনদের পরিবার—যাদের একটি শাখা মেরীল্যাণ্ড ও নর্থ ক্যারোলিনা উপনিবেশদ্বয়ে প্রতিপত্তি অর্জ্জন

করেছিলো—অশেষ বিত্তসম্পত্তি ও উপাধির অধিকারী। রক্ষণশীলদের সহিত ইডেনের সংযোগসূত্রের মূল এইখানে।

রক্ষণশীলেরা ইডেনের সমাজ সম্পর্কিত "অদ্ভুত" সব ধারণার জন্য তাঁকে "দুর্ব্বল" মনে করে। আর মনে করে যেহেতু ইডেন রক্ষণশীল দলের সদস্য—যা তাঁর হওয়া উচিত ছিল না, সেইজন্য শ্রমিক দলীয়রাও তাঁকে "দুর্ব্বল" মনে করে।

ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের তরুণ সদস্যেরা তরুণ বলে কিছু কম রক্ষণশীল নয়। বস্তুতঃ রক্ষণশীলতার দুর্গগুলির উপর বিংশ শতাব্দীর আঘাতের পর আঘাত দুর্গরক্ষকদেরকে তাদের প্রতিরোধ প্রাচীর দৃঢ়তর করবারই প্রেরণা জোগাচ্ছে মাত্র। স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা প্রতিরোধের জন্য তারা আরও শক্ত করে ঘাঁটি গেড়ে বসছে। পার্লামেন্টের সদস্য, প্রচারসচিব ব্রেণ্ডান ব্রাকেন বিত্তবান, উগ্র, মেজাজী ও ক্ষিপ্রবুদ্ধি। এককালে তিনি চার্চ্চিলের সেক্রেটারীর কাজ করেছেন। চার্চ্চিলের তিনি বন্ধু ও শিষ্য। তরুণ টোরীদের মধ্যে যাঁদের সব চাইতে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব, তিনি তাঁদের অন্যতম। যুদ্ধের আগে থেকেই আমি তাঁকে জানি। ১৯৩৯ সালে ব্রিটেনে আমার যুদ্ধকালীন প্রথম সফর কালে তিনি চার্চ্চিলের সহিত আমার সাক্ষাতের সুবিধা করে দেন। আরও কয়েকজন অফিসারের সহিত সাক্ষাতও মুখ্যতঃ তাঁর সাহায্যেই ঘটে ওঠে সেইবার। ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রচার দপ্তরের নূতন দালানে ব্রাকেন তাঁর নিজস্ব ভোজনকক্ষে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে আমাকে আমন্ত্রণ করেন। আহারে বসেছিলাম আমরা চারজন—ব্রাকেন, উপনিবেশ-সচিব লর্ড ময়েন, ডোমিনিয়ন-সচিব ভাইকাউন্ট ক্র্যানবোর্ণ (এঁদের সকলেই রক্ষণশীল দলভুক্ত) এবং আমি। বেলা দেড়টায় আমাদের সাক্ষাৎ হয় আর আমি চলে আসি চারটেয়। ব্রাকেন আমাকে তাঁর সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। গিনেস্ ব্রুয়ারী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ময়েন যুদ্ধের আগে

অবসর গ্রহণ ক'রে বিশুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর বহু ঔৎসুক্যের মধ্যে ভেষজ বিজ্ঞান এবং প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু সম্পর্কে কৌতূহল অন্যতম। (পরে লর্ড ময়েন মিশরে দু'জন প্যালেষ্টিনীয় সন্ত্রাসবাদীর হস্তে নিহত হন।) মার্কুয়িস্ অব্ সেলিস্‌বারির পুত্র ক্র্যানবোর্ণ্ বনেদী ও প্রভাবপ্রতিপত্তিময় সেসিল পরিবারের সন্তান।

কথায় কথায় মিউনিক্ চুক্তির কথা উঠ্‌লো। ব্রাকেন বল্‌লেন যে, "মিউনিক" একটা বিপর্য্যয় স্বরূপ। চেকদের রক্ষার্থে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত ছিল।

"আমাদের বিমানধ্বংসী কামান ছিল না," ময়েন প্রতিবাদের সুরে বল্‌লেন।

ব্রাকেন বল্‌লেন, "ওয়াল্টার, ১৯৩৮, সেপ্টেম্বর এবং ১৯৩৯, সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্ত্তী একবৎসর আমাদের দেশে বিমান ও কামান উৎসাদনের নৈরাশ্যকর হিসাব যদি তুমি নিতে তো দেখ্‌তে পেতে, যুদ্ধে যাবার আগে কোন জাতিই যুদ্ধের জন্য যথার্থ প্রস্তুত হয়না।"

আমি বল্‌লাম যে মিউনিক সঙ্কটে রুশিয়া হয়তো পাশ্চাত্য শক্তি-গুলির সঙ্গে মিলেই যুদ্ধ করতো। ব্রাকেন আমার কথায় সায় দিলেন। তিনি বল্‌লেন, "হুনরা"—ব্রাকেন বরাবরই 'হুন' শব্দটি প্রয়োগ করতেন—"প্যারিস দখলের জন্য চেক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিলো। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্কোডা কারখানার মতো মূল্যবান জিনিষ সমগ্র জার্ম্মানীতেও নাই।"

অধ্যয়নপিপাসু, চশমাধারী, তোবড়ানো গাল ক্র্যানবোর্ণ বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "যাই হোক্, রুশিয়ার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বুদ্ধিহীনতার কাজ হয়েছিলো।"

আমি বল্‌লাম, "সমস্যাটির সমাধান দুঃসাধ্য ছিল। কারণ, কোন

পোল গভর্ণমেণ্টই রুশ সৈন্যবাহিনীকে তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে দিতো না। আমার কথায় সকলেই সায় দিলেন।

ব্রাকেন ক্র্যানবোর্ণকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, "ববিটি, আমি জানি স্পেন সম্পর্কে আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল নেই। আমার মনে হয় সমস্যাটি ধর্ম্মীয় প্রশ্নের সহিত জড়িত থাকায় আমাদের পক্ষে সেখানকার ব্যাপারে কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নিওনে (১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে ইংরাজ ও ফরাসী নেতৃবর্গ নিওনে বসে ইতালীয় সাবমেরিন কর্ত্তৃক রাজতন্ত্রীদের জন্য অস্ত্রবাহী জাহাজ নিমজ্জিতকরণ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগরে প্রহরা বসাবার সিদ্ধান্ত লন) যখন আমরা অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করি, তখন সকলেই সেটা লক্ষ্য করেছিলো।"

ক্র্যানবোর্ণ বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "ইংলণ্ডের মতো নৌশক্তিপ্রধান একটা জাতি তার নৌবল রক্ষা করবেনা, একথা বলা নিছক বোকামী। চেম্বারলেন এ ভুল করেছিলেন। মুসোলিনি ও ফ্রাঙ্কোকে আমাদের সাফ বলে দেওয়া উচিত ছিল যে আমরা আমাদের জাহাজ রক্ষা করবো এবং যারাই তাদের আক্রমণ করবে তাদের আমরা ডুবিয়ে দেবো। এতে যুদ্ধ বাধে বাধুক।"

ব্রাকেন বল্‌লেন, "আবিসিনিয়াতেই আমাদের ইতালীকে রোখা উচিত ছিল। তা হ'লে আর স্পেনে এই কাণ্ড ঘট্‌তে পারতো না।"

"এ বিষয়ে আমি একমত," ক্র্যানবোর্ণ মন্তব্য করলেন।

ময়েন দ্বিধাভরে চুপ করে রইলেন। তিনি বরাবরই তোষণনীতির পক্ষাবলম্বী ছিলেন।

আমাকে তাঁরা ষ্টালিনের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বল্‌লাম, "ষ্টালিন একজন প্রচণ্ড সুবিধাবাদী, কিন্তু বিরাট লোক।"

"হ্যারী হপ্‌কিন্সও ঠিক এই কথাই বলেন," ব্রাকেন জানালেন।

ক্র্যানবোর্ণের প্রশ্ন: "দেখ্‌তে কি তিনি রাশভারী?"

"না।"

ময়েন সোভিয়েটের বিভীষিকামূলক তৎপরতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। সোভিয়েট গোয়েন্দা পুলিশের কোনো কোনো কার্য্যের কথা আমি উল্লেখ করলাম।

ব্রাকেন প্রশ্ন করলেন, "বুদেনী ও ভোরোশিলভ সেনাপতি হিসাবে কার্য্যক্ষেত্রে মোটেই সুবিধা করতে পারছেন না—এঁদের খবর কিছু জানেন ?"

আমি বল্‌লাম, "তাঁরা তো রাজনৈতিক সেনাপতি মাত্র। বাহিনী পরিচালনার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত সে সব সেনাপতির নাম বাইরের লোক কেউ জানে না।"

ব্রাকেন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মনে করেন যে টুকাচেভ্‌স্কি সত্যি সত্যি নাৎসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ? নিশ্চয়ই আপনি তা' মনে করেন না ?"

"না, আমি তা মনে করি না। তার কারণ প্রমাণাভাব। রুশ সৈন্যরা চমৎকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বরাবরই তারা সাহসী যোদ্ধা। কিন্তু সৈন্য পরিচালনার কার্য্যে ত্রুটী আছে বলে মনে হয়।"

ব্রাকেন বল্‌লেন, "লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে রুশদের ফন্ লীবকে সাম্‌লাতে হচ্ছে। সৈন্যপরিচালনার ক্ষেত্রে লীব অদ্বিতীয়।"

শীতকালীন অভিযানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা চল্‌লো। আমি বল্‌লাম, শীতকালীন হিম অথবা পার্ব্বত্য বন্ধুরতার দরুণ রুশিয়ায় শীতযুদ্ধ আট্‌কায় না। আমরা তৈলের প্রশ্ন, ভল্‌গা নদীতে রক্ষাব্যবস্থা এবং সংশ্লিস্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে পরস্পরের সহিত মতবিনিময় করলাম।

আমি বল্‌লাম, "আমার মনে হয় রুশিয়া আক্রমণে হিট্‌লারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে সন্ধি করা। হিট্‌লার জানে যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা আর বৎসর খানেকের মধ্যেই

অত্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিতে উৎপাদন সুরু করে দেবে—কাজেই তার হাতে আর একটি বৎসর মাত্র আছে। এই এক বৎসরে সে রুশিয়াকে পর্য্যুদস্ত করতে চায়। এতে করে ইংলণ্ড এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যাতে তার পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব হবে এবং নিরুপায় হয়ে সে হিট্‌লারের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হবে।"

"সত্যি কথা," ব্রাকেন বল্‌লেন, "হিট্‌লারের সময় নির্ব্বাচন নিখুঁত।"

তিনটার সময় ক্র্যানবোর্ণ ও ময়েন চলে গেলেন। ব্রাকেন তাঁদের দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবার সময় আমাকে বল্‌লেন "আপনি যাবেন না।" আমরা আরও এক ঘণ্টা কথাবার্ত্তা বল্‌লাম।

ব্রাকেন তাঁদের বিদায় দিয়ে ফিরে এসে আমাকে বল্‌লেন যে, "হিট্‌লারের সঙ্গে ষ্টালিনের স্বতন্ত্র সন্ধিচুক্তির সম্ভাবনা গভর্ণমেণ্টকে নিরন্তর সচকিত করে রেখেছে।" এই ধরণের সম্ভাব্যতা লণ্ডনের সর্ব্বত্র আলোচিত হচ্ছিল। ব্রাকেন মন্তব্য করলেন, যুদ্ধ যেন শাট্‌ল্‌ককের খেলা। প্রথম পূব দিকে পোল্যাণ্ডে যুদ্ধ বাধ্‌লো তারপরেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো পশ্চিমে—হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশে এবং ফ্রান্স আক্রান্ত হলো। তারপর আবার পূবদিকে—রুশিয়া। যুদ্ধের গতি আবার কি পশ্চিমমুখী হবে?"

এক গ্লাস হুইস্কি ও সোডা নিয়ে ব্রাকেন বসেছিলেন। রুশিয়াকে যুদ্ধের ভেতর ধ'রে রাখতে হলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কী করা উচিত ব্রাকেন জিজ্ঞেস করলেন। আমি বল্‌লাম, "রুশিয়াকে আপনারা অস্ত্র সরবরাহ করুন; তুরস্ক যাতে রুশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসীদের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে সেদিকে চোখ রাখুন, নাৎসীদের কবল থেকে স্পেনকে রক্ষা করুন; এবং ক্রেমলিনের নায়কদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করুন যে ইংলণ্ড হিট্‌লারের তোষণ করবে না। আমার নিশ্চিত ধারণা, ষ্টালিন বিশ্বাস করেন রুশ ও জার্ম্মানরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে উভয়েই ফৌত হয়ে যাক্ এইটেই ইংলণ্ডের অভিপ্রেত।"

ব্রাকেন উচ্চৈঃস্বরে বল্‌লেন, "তোষণ আমরা কখনও করবো না। আমাদের এইটুকু শিক্ষা অন্ততঃ হয়েছে।"

ইউরোপ ভূখণ্ডে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থাপনের প্রসঙ্গ উঠ্‌লো। ব্রাকেন এই মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি উত্থাপন করলেন। কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট স্যার জন এণ্ডার্সন, এবং শ্রমিক মন্ত্রীদের কাছ থেকে আমি যুক্তিগুলি আগেই শুনেছিলাম। যুক্তিগুলি নিতান্তই সামরিক।—তাদের মোদ্দা কথা এই যে জার্ম্মান বাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ লাল ফৌজের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মান সামরিক শক্তির সঙ্গে এঁটে ওঠার মতো যথেষ্ট জনবল ও উপকরণ ব্রিটেনের হাতে নাই।

ব্রাকেন বল্‌লেন, "সে যাই হোক্, বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা রুশদের ক্রমেই অধিক নিকটতর হচ্ছি। প্রথম প্রথম আমাদের মোটেই মিল ছিল না। ক্রীপ্‌স্ ছিলেন তাঁদের চোখে উগ্র বামপন্থী। মস্কো বরং ডেভনশায়ারের ডিউক কিম্বা তাঁর ধরণের আর কাউকে ক্রীপ্‌সের বদলে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ষ্টালিন ও ক্রীপ্‌স্-এর মধ্যে চমৎকার বনিবনা হচ্ছে। মলোটভের সঙ্গে অবশ্য ক্রীপ্‌সের সম্পর্ক আশানুরূপ নয়, কিন্তু মলোটভের গুরুত্ব ততো নয়।"

ক্রীপ্‌সের প্রসঙ্গে আমি ওয়াশিংটনের ব্রিটিশ রাজদূত হালিফ্যাক্সের কথা পাড়্‌লাম। ব্রাকেন বল্‌লেন, "হালিফ্যাক্স ও রুজভেল্ট পরস্পরের বিশেষ বন্ধু। দু'জনেরই মনোভাব ধর্ম্মযাজকের, কাজেই ধর্ম্মীয় আলোচনায় দু'জনেরই বিশেষ উৎসাহ।" ব্রাকেন জানালেন যে, ব্রিটিশ বক্তার দলকে আমেরিকা গমনে তিনি প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন। ব্রাকেনের মত হ'লো এই যে, আমেরিকা ইংলণ্ডের আশানুযায়ী যথাসম্ভব যুদ্ধের নিকটবর্ত্তী হয়েছে; ইংলণ্ড আমেরিকার কাছ থেকে সৈন্যসাহায্য আশা করে না।

আমি বল্‌লাম, "ঠিক এই জিনিষটির উপরই হিট্‌লার ভরসা ক'রে

আছে। হিট্‌লার ব্রিটেনের নিকট শান্তির প্রস্তাব ক'রে পাঠাবে আবার একই কালে যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাবে যে আমেরিকা যদি পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য সাহায্য না পাঠায়, তা হ'লে ইংলণ্ডের পক্ষে জয়লাভ অসম্ভব।"

"আমেরিকা কখনই সৈন্য সাহায্য পাঠাবে না।" ব্রাকেন বল্‌লেন।

"সেই ক্ষেত্রে জয়ের জন্য ইংলণ্ডকে রুশিয়ার উপরই নির্ভর করতে হবে," আমি বল্‌লাম।

ব্রাকেন—"আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী রুশিয়াকে সাহায্য করেছি। গোড়ার দিকে ষ্টালিন, বৎসরে আমরা যতগুলি বিমান নির্ম্মাণ করি একমাসেই ততগুলি ক'রে বিমান চেয়ে পাঠাতেন। তাঁকে বাস্তব অবস্থা সম্যক বুঝিয়ে দিতে তিনি তাঁর দাবীর অর্দ্ধেকাংশ ত্যাগ করেন। আমরা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাঁকে আমাদের যথাসাধ্য দেবো। আপনি জানেন বোধ হয়, ক্রীপ্‌স্‌ যখন আসন্ন নাৎসী অভিযানের বার্ত্তা ষ্টালিনকে জানান, ষ্টালিন সে কথা বিশ্বাস করেন নি।"

আমি— "আমার মনে হয় ষ্টালিন খবরটি জান্‌তেন। কিন্তু সে সময়টা হচ্ছে জার্ম্মানীর সঙ্গে রুশিয়ার চরম মিতালির সময়। কাজেই রুশিয়া শীঘ্রই জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধরত হবে—আগে থেকে এই ধারণার সৃষ্টি ক'রে ষ্টালিন ব্রিটিশ-প্রত্যাশার পোষকতা করতে চান নি।"

ব্রাকেন—"আপনি জানেন বোধ হয় যে উইনষ্টন ও চার্চ্চিলের মধ্যে খুব বনিবনা হয়েছিল। একদিন মন্ত্রিসভায় চার্চ্চিল একটি টেলীগ্রাম হাতে ক'রে এসে বললেন, 'আঙ্কল জো' তার করেছেন।' কথাটাকে যেন তিনি চেখে-চেখে বল্‌লেন।"

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধে এযাবৎ কোন্‌ পক্ষে কত হতাহত হয়েছে সে সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে নির্ভরযোগ্য হিসাব আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। ব্রাকেন জানালেন যে, যুদ্ধের প্রথম দশ সপ্তাহে

রুশিয়ার পক্ষে ত্রিশ লক্ষ হতাহত হয়েছে ; আর জার্ম্মানীর পক্ষে কুড়ি লক্ষ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় এবার নিহতের সংখ্যা অধিক। বন্দী সৈন্যের সংখ্যা অনেক কম। মার্কিণ সৈন্যাধ্যক্ষরা মনে করেন যে জার্ম্মান বাহিনী অজেয় এবং রুশিয়ার পরাজয় সুনিশ্চিত। রুশিয়া যদি হেরে যায় তা হলে আমাদের সকলের পক্ষেই সেটা চরম বিপর্য্যয়ের কারণ হবে।"

আমি বল্‌লাম, "যেহেতু রুশিয়ার পরাজয় ইংলণ্ডের পক্ষে সর্ব্বনাশকর হবে সেইহেতু এই বিপর্য্যয়কর সম্ভাবনা নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকা উচিত।"

ব্রাকেন জানালেন, "যদি এইজন্যে আমাদের একলক্ষ জীবনও বলি দিতে হয়, আমরা সেটা গ্রাহ্য করবো না। আর যদি গ্রাহ্যও করি, তা হ'লেও সেটা করবো। কিন্তু যা-ই আমরা করি না কেন তা' কি পূর্ব্ব রণাঙ্গন থেকে একটি জার্ম্মান সৈন্যকেও অন্যত্র নিয়োজিত করতে পারবে? ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডে হিট্‌লারের অগণিত রিজার্ভ সৈন্য আছে। আমরা সেকথা ষ্টালিনকে জানিয়েছি। ষ্টালিন আমাদের কথা মেনে নিয়েছেন।"

ব্রাকেনের কাজ ছিলো ; কাজেই হৃদ্যতাপূর্ণ করমর্দ্দনের পর আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

১৯৩৮ সালে হিট্‌লারের নিকট মিউনিক আত্মসমর্পণ, ১৯৩৯-এর সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি এবং ১৯৩৫-এ আরব্ধ ষ্টালিন প্রবর্ত্তিত বিশোধনকার্য্য—যেখানেই রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিরা একত্রিত হন সেইখানেই এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা হয়। ব্রাকেনের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন-বৈঠকে মিউনিক সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিলো। ১৯৪১-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে চেকো-

শ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট এডোয়ার্ড বেনেসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। স্বভাবতঃ তাঁর মনে মিউনিকের চিন্তাটাই সব চাইতে বলবৎ ছিল।

লণ্ডনে নির্ব্বাসিত চেকোশ্লোভাক গভর্ণমেণ্ট-দপ্তরে প্রবেশ করে আমি প্রেসিডেণ্ট বেনেস্‌কে কুশলপ্রশ্ন করলাম। তিনি জানালেন, তিনি ভালো আছেন। আমি তাঁকে তাঁর ভালো থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। প্রেসিডেণ্ট বেনেস বললেন, "আমি নরকবাস করে এসেছি। এখানে তার চাইতে অনেক ভালো আছি। এখন আমরা সংগ্রাম চালাচ্ছি। কিন্তু মিউনিক সমর্পণের সময়েই আমাদের এ সংগ্রাম চালানো উচিত ছিলো—সেইটেই ছিলো উপযুক্ত সময়। সুদেতেন ভূমির প্রশ্নে জার্ম্মানরা যে যুদ্ধে যেতোই তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তারা এজন্যে তৈরী ছিলো না, এরকম রিপোর্ট আমি পেয়েছি। কিন্তু যদিও বা তারা আমাদের আক্রমণ করতো আমরা তাদের অন্ততঃ পক্ষে চারমাস, এমন কি ছয়মাস পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম। সুদেতেন ভূমিতে আমাদের দুর্গশৃঙ্খল ম্যাজিনো লাইনের চাইতেও দুর্ভেদ্য ছিল।

"কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া-অষ্ট্রেলিয়া সীমান্ত কি অরক্ষিত ছিলো না?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বেনেস উত্তর দিলেন, "খুব ভালো না হলেও ঐ সীমান্তের রক্ষা-ব্যবস্থায় কাজ চলে যেতো। অবশ্য প্রাগের ধ্বংস হবার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরাও ড্রেসডেন এবং লাইপ্‌জিগ ধ্বংস করতে এবং বার্লিনে বোমা ফেলতে পারতাম। আর এখন কিনা স্কোডা এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্যান্য কারখানা ইংলণ্ড ও রুশিয়ার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে! আমাদের ১,৭০০ সংখ্যক বিমান ছিলো। জার্ম্মান বিমানের তুলনায় তারা কোনো অংশে খারাপ ছিলো না। ক্রান্সের দেড় হাজার বিমান ছিলো; আর ইংলণ্ডের বিমানের সংখ্যা ছিলো দেড় থেকে দু'হাজারের মধ্যে—তার সবই সম্মুখ রণাঙ্গনে

কার্য্যোপযোগী। জার্ম্মানদের ছিলো তিন হাজার বিমান। চেকো-শ্লোভাকিয়ার পতন ফ্রান্সের মনোবলের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলো, এবং রুশিয়ার সহিত সম্পর্কের পক্ষেও অত্যন্ত খারাপ হয়েছিলো। বস্তুতঃ, মিউনিক শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপর্য্যয়ই ডেকে আনে নি, সমগ্র ইউরোপের বিপর্য্যয় ডেকে এনেছিলো। আমরা প্রথমে বোহেমিয়ায় লড়াই চালাতাম। সেখানে সুবিধা না হ'লে মোরাভিয়ায় আশ্রয় নিতে পারতাম। তারপর শ্লোভাকিয়া, এবং সর্ব্বশেষে রুমানিয়ার মধ্যে দিয়ে রুশিয়ায় গিয়ে আত্মরক্ষাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'তো না। রুমানিয়ার মধ্য দিয়ে সোভিয়েট সীমান্ত অভিমুখে আমরা একটি রেলপথ নির্ম্মাণ করেছিলাম।"

আমি মানচিত্রের গায়ে রেলপথটি দেখ্‌তে চাইতে তিনি আমাকে মানচিত্র এনে দেখালেন।

বেনেস্ বল্‌লেন, "কর্জ্জের ভিত্তিতে আমরা দৃশ্যতঃ রুমানিয়ার জন্য রেলপথটি নির্ম্মাণ করেছিলাম। কিন্তু বস্তুতঃ, এটা ছিল আমাদের পশ্চাদপসরণের রাস্তা। আমরা তিনশত সোভিয়েট বম্বার নেয়েছিলাম, চেকোশ্লোভাক বিমান চালকরাই সেগুলি রুশিয়া থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। আমরা নিজেরাও এই ধরণের বিমান প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিলাম। রুমানিয়ার উপর সেগুলি উড়ে বেড়াতো। অনুমতিদান এবং অন্যান্য প্রশ্নে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল খুবই বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন এবং বল্‌তেন, "অনুমতি চাইবার কি দরকার?" ক্যারল রুমানিয়ার মধ্য দিয়ে রুশ সৈন্যবাহিনীকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যেতে দিতেন। কিন্তু পোলদের সে-অনুমতি তিনি দিতেন না। লাল ফৌজ রুমানিয়ার মধ্য দিয়ে এসে পোলদের নিরস্ত ও নিষ্ক্রিয় করতে পারতো।"

বেনেস বলে চল্‌লেন—মনের মতো কথা পেয়ে তিনি সজীব হয়ে উঠেছিলেন, "১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে রুশরা আমাদের তিন তিন বার সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হয়। সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে, আমাদের

পত্রের উত্তরে মস্কো জানান যে, ফ্রান্স যদি সাহায্য করে তা হ'লে তাঁরাও সাহায্য করবেন। এই উত্তর আমাদের মনঃপূত হয় নি, কারণ আমাদের কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিলো যে ফ্রান্স সাহায্য করবে না। কাজেই আমরা পুনরায় মস্কো গভর্ণমেণ্টকে লিখলাম এবং বিষয়টি জাতি সঙ্ঘে উত্থাপনের জন্য মস্কো আমাদের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু আমার ভয় হলো, জাতি-সঙ্ঘ হয়তো ফ্রান্সের চাপে পড়ে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রস্তাবকে আমল দেবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি যুদ্ধ করতাম, আমাদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ চাপানো হতো যে আমরা জাতি সঙ্ঘের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করছি। শেষ পর্য্যন্ত, মস্কো রুমানিয়ার মধ্য দিয়ে এবং বিমান পথে আমদের সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং আমাদের দ্বিধাহীনভাবে যুদ্ধ সুরু করবার পরামর্শ দিলেন।"

সেই ভয়ঙ্কর সেপ্টেম্বরের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় বেনেসের চোখমুখের রেখা ও ভাঁজ যেন আরও কুঞ্চিত দেখালো। কারণ লণ্ডন ও প্যারিসের ভীতিপ্রদর্শনের চাপে পড়ে তাঁকে সে মাসে যুদ্ধ না করবার প্রস্তাবে রাজী হতে হয়েছিলো। মিউনিক চেকোশ্লোভাকিয়াকে হত্যা করেছিলো। এইরূপ যে ঘটবে বেনেস্ তা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করেন নি। এর কারণস্বরূপ তিনি আমাকে বললেন, "আমার দেশ দ্বিতীয় একটি স্পেনে পরিণত হোক্ এটা আমি চাই নি। আমরা যদি সোভিয়েট সাহায্য গ্রহণ করে যুদ্ধে যেতাম, তা হলে সবাই বল্‌তো আমি বল্‌শেভিক।"

স্বদেশীয় তোষণকারীদের কাছ থেকেও যে তাঁর গভর্ণমেণ্টকে বিরুদ্ধতা সইতে হয়েছিলো, তিনি তারও ইঙ্গিত করলেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বল্‌লেন, "এগারো মাস পূর্বে না হয়ে যদি ১৯৩৮ সালে যুদ্ধ সুরু হ'তো, তা হলে ফ্রান্সকে হয়তো রক্ষা করা যেতো। হিট্‌লারের পশ্চিম দুর্গপ্রাকার তখনও নির্ম্মিত হয় নি

আর তখন স্পেনের যুদ্ধও চল্‌ছিল।” ১৯৩৮-এর ইঙ্গ-ফরাসী হিট্‌লার-তোষণের সঙ্গে ১৯৩৯-এর ষ্টালিনকৃত হিট্‌লার-তোষণের যে সাদৃশ্য আছে এবিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন। কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি বল্‌লেন, “ফ্রান্সকে রক্ষা করা রুশিয়ার উচিত ছিলো।”

এক শনিবার বৈকালে ইংলণ্ডের সুদৃশ্য শ্যামল পল্লী অঞ্চলের অভিমুখী এক ট্রেনে আমি চেপে বস্‌লাম এবং ছোট্ট একটি ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জের সেক্রেটারী মিঃ হোয়াইট আমার সহিত ষ্টেশনে সাক্ষাৎ করলেন। রাস্তায় যেতে তিনি তাঁর মোটরে দু'জন কানাডীয় সৈন্যকে তুলে নিলেন। সৈন্যদ্বয় জানালো, তারা যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্যভর্ত্তীর খাতায় নাম লিখিয়েছিলো—কিন্তু মাসের পর মাস নিষ্ক্রিয় থেকে তাদের বিরক্তি ধরে গেছে। তারা যখন শুনলো যে লয়েড জর্জ্জের মোটরে ক'রে তারা যাচ্ছে, তাদের উৎসাহের আর সীমা রইল না।

বার্কটেস্‌গাডেনে হিটলারের সঙ্গে দেখা ক'রে আসার পর লয়েড জর্জ্জ চার্টস্থিত তাঁর পল্লী-আবাসের প্রধান বিশ্রামকক্ষটিকে পুনর্নির্ম্মিত করেছিলেন এবং ফুয়ারের কক্ষের ধরণে এক বৃহৎ গবাক্ষ নির্ম্মাণ করেছিলেন। ১৯৩৮-এর সফর কালে উপত্যকাটিকে যেরূপ দেখেছিলাম তার চাইতে এবার দৃশ্যটিকে অনেক বেশী সুন্দর মনে হ'লো। লয়েড জর্জ্জের পিয়ানোর ডালার উপর থেকে হিট্‌লারের স্বয়ং-স্বাক্ষরিত ফোটোগ্রাফখানা অন্তর্হিত হয়েছিলো। ওয়াশিংটনস্থিত প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজদূত এবং লয়েড জর্জ্জের এককালীন সেক্রেটারী লর্ড লোথিয়ানের ফোটোখানাও পিয়ানোর উপর ছিলো না।

অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি ছিলো। তার ভিতর একটি

ছবি উড্রো উইলসনের, যার নিচে লেখা "আমার বন্ধু" লয়েড জর্জ্জকে উপহার। যদিও দু'জনার মধ্যে সম্প্রীতি যে খুব বেশি ছিলো তাও নয়। অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে ফীল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্, ফস্, ক্লেমেন্সো, লর্ড বার্কেনহেড এবং লয়েড জর্জ্জের মায়ের ছবি উল্লেখযোগ্য। একটা বড়ো কৌচের উপর সাপ্তাহিক "New Statesman and Nation"-এর অনেকগুলি এবং "Picture Post" কাগজের কয়েকটি সংখ্যা, বামপন্থী প্রচার পুস্তিকা, এবং কিছু পুস্তক ছিলো।

লয়েড জর্জ্জ ঘরে এলেন। তাঁর গতিভঙ্গী সজীব। কিন্তু ১৯৩৮ সালে তাঁকে যেমন দেখেছি, এখন তাঁকে তেমন স্বাস্থ্যবান বা প্রাণবন্ত বলে মনে হ'লো না। তাঁর দীর্ঘ শ্বেতশুভ্র কেশ আগেরই মত কোটের কলার ছুঁয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাতে পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য ছিলো না। আমার বিগত সাক্ষাৎকারকালে আমি তাঁর সঙ্গে মুখ্যতঃ স্পেন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, তাঁর মনে পড়লো সেকথা। তিনি খেদোক্তি ক'রে বল্‌লেন, "স্পেনে যদি আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম, তা হ'লে হয়তো বর্ত্তমান যুদ্ধ নিবারণ করা যেতো। অবশ্য, স্পেনেই যুদ্ধ সুরু নয়। তারও আগে আবিসিনিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার লজ্জাকর কাহিনী। কিন্তু ডিক্টেটরদের দমন করবার পক্ষে স্পেনই ছিলো উপযুক্ততম ক্ষেত্র ও সুযোগ।" তিনি রুশিয়ার প্রসঙ্গ তুল্‌লেন। লয়েড জর্জ্জ দৃঢ়তার সহিত বললেন "ষ্টালিন জার্ম্মানদের সঙ্গে সন্ধি করবেন না। সন্ধির ফল কী দাঁড়াবে তা তিনি ভালো করেই জানেন।" রুশিয়ার উপর নাৎসী চাপ কমাবার জন্যে তিনি ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থাপনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার কথা বল্‌লেন। যে সমস্ত মন্ত্রীর সঙ্গে আমার এই নিয়ে কথা হয়েছে,—তাঁদের মধ্যে চার্চ্চিলের দক্ষিণহস্ত স্যার জন এণ্ডারসনও আছেন—তাঁরা সকলেই মনে করেন যে ব্রিটেনের পক্ষে এক্ষুনি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্ভব নয়। আমি লয়েড জর্জ্জকে সেকথা জানালাম।

তিনি প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লেন, "কেন নয়? আমাদের যথেষ্ট সংখ্যায় জাহাজ নেই, এই তো? জাহাজের জন্য যেন কাজ আটকে থাকে! ১৯১৮র মার্চে যখন ফ্রান্সে আমাদের সৈন্যদের অবস্থা কাহিল, আমি ফুড-কণ্ট্রোলারকে ডেকে বল্‌লাম, 'আট্‌লাণ্টিক থেকে তোমার খাদ্য জাহাজ সব তুলে নাও।' আমরা ফ্রান্সে ক্রমাগত সৈন্য পাঠাতে লাগ্‌লাম এবং বিপন্ন সৈন্যবাহিনীকে বাঁচালাম। তাতে অবস্থারও মোড় ঘুরে গেলো। আমি হ'লে এক্ষুনি ফ্রান্সে একলক্ষ কি দু'লক্ষ লোক পাঠাতাম। বলা হবে যথোপযুক্ত উপকরণ নেই; জিজ্ঞাসা করি গত বারো মাস আমরা তবে কী করছি? ১৯১৫-র জুন থেকে ১৯১৬-র জুলাইয়ের মধ্যে আমি ১৩ লক্ষ লোককে সজ্জিত করে ফ্রান্সে পাঠাতে সমর্থ হই।"

আমি বল্‌লাম, "এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এখন সৈন্যদের ট্যাঙ্কের ন্যায় ভারী উপকরণ এবং বিমান না হলে চলে না।" তিনি বল্‌লেন, "ট্যাঙ্ক চাই, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ট্যাঙ্ক বানাবার জন্য আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিলো। উইন্‌ষ্টনের এড্‌ভেঞ্চারবোধ নেই। যেটুকু ছিল প্রথম যুদ্ধে গ্যালিপোলির বিপর্য্যয়ে সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। ইউরোপ-ভূখণ্ডে কিছু করতে উইনষ্টনের বড়ো দ্বিধা। জার্ম্মানী যখন রুশিয়া আক্রমণ করলো, তিনি গেলেন কিনা রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করতে। অর্থাৎ অধিক কিছু করবার জন্য যাতে তাঁর উপর চাপ না পড়ে তার হাত থেকে তিনি পালিয়ে বাঁচলেন।"

একটি চাকাযুক্ত ছোট্ট ট্রলীর উপর চা, রুটি, মাখন ও মধু চাপিয়ে ঘরে ঢুকলো পরিচারিকা। লয়েড জর্জ্জ এক গ্লাস ঘোল হাতে নিয়ে বল্‌লেন, "ঘোলই আমার পানীয়।" লক্ষ্য করলাম গ্লাসটি মুখে ধরতে গিয়ে তাঁর হাত কেঁপে গেলো। বয়সও তো কম হয়নি—আটাত্তর। তাঁকে ধূমপান করতে দেখ্‌লাম না—বোধ করি অভ্যাসটি ত্যাগ করেছেন।

১৯৩৭ ও ৩৮-এ রুজভেল্টের নাকি একবার খেয়াল চেপেছিলো, হিট্‌লার, ষ্টালিন, মুসোলিনি, চেম্বারলেন ও দালাদিয়ারকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ করে তিনি বিশ্বসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। আমি জনশ্রুতিটির কথা লয়েড জর্জকে বলতে তিনি তারস্বরে বল্‌লেন, "কেন তিনি ডাক্‌বেন না? প্রস্তাবটি তো চমৎকার!" পরক্ষণেই তিনি নৈরাশ্যসূচক একটি মুখভঙ্গী করে বল্‌লেন, "ষ্টালিন এই বৈঠকে নিশ্চয়ই আসতেন না। তিনি লিট্‌ভিনভ্‌কে পাঠাতেন। দেখাদেখি হিট্‌লার পাঠাতেন রিবেনট্রপকে—ফলে কাজ কিছুই হোত না।"

অতলান্ত সনদ সম্পর্কে আমি তাঁর অভিমত জান্‌তে চাইলাম। তিনি বল্‌লেন, "এতে কী হবে? অবাধ বাণিজ্যের সুবিধে হবে?" মুখের পশ্চাদ্দেশ থেকে তিনি কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ নির্গত করলেন এবং মাথাটাকে স্ফুর্ত্তির ভঙ্গিতে দোলাতে লাগলেন। অতলান্ত সনদের ফলে অবাধ বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হবে বলে তিনি মনে করেন না। তাছাড়া, নিরস্ত্রীকরণের কার্য্যকারিতা সম্পর্কেও তাঁর অবিশ্বাস। তিনি বল্‌লেন, "ভার্সাই সন্ধিতেও নিরস্ত্রীকরণের কথা ছিলো। কিন্তু প্রস্তাবটি ধোপে টিক্‌লো না। ফ্রান্স নিরস্ত্রীকৃত হতে অস্বীকার করলো। কেবলমাত্র আমরা এবং আমেরিকানরা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম।

লয়েড জর্জ্জের পুত্র গুইলিম তাঁর স্ত্রী ও পুত্র ডেভিড সহ এই সময়ে চা খেতে এলেন। গুইলিম পার্লামেন্টের সদস্য এবং খাদ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ড উল্টনের সহকারী। যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব কী লয়েড জর্জ্জ জান্‌তে চাইলেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে কেবল মাত্র যুদ্ধরত দেশই যুদ্ধের জন্য সর্ব্বাত্মক উৎপাদনের ঝুঁকি নিতে এবং তার ধকল সইতে পারে।

তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি মনে কর আমেরিকা

যুদ্ধে যোগ দেবার পূর্ব্বেই রুশিয়ার প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়বে ?" আমরা এই দ্বিমুখী আনুমানিক প্রশ্নটি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। তার থেকে আরেকটি আনুমানিক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্‌লো—জার্ম্মানীতে বোমা ফেলে ব্রিটেন জয়লাভ করতে পারে কিনা ?

লয়েড জর্জ্জ উচ্চকণ্ঠে বল্‌লেন, "তা কি হয় ? জার্ম্মানী তো আমাদের উপর ক্রমাগত বোমা ফেল্‌ছে তাতে কি তাদের কিছু সুরাহা হ'লো ? আমরা এর চেয়ে আর বেশী কী করতে পারি ? আসল কথা, বোমা দিয়ে কিছু হবে না।"

রুশিয়াকে সাহায্য করা সম্পর্কে ইংলণ্ডে যে শৈথিল্যের মনোভাব আমি লক্ষ্য করেছি তার কথা বল্‌লাম। ব্যাপারটা যে জরুরী সে বিষয়ে জনগণের আশানুরূপ চেতনার অভাবের কথাও বল্‌লাম।

তিনি বল্‌লেন, "বিমান-আক্রমণ বন্ধ হওয়াই এই ঔদাসীন্যের কারণ ব'লে আমার ধারণা। অগ্নিপরিবেষ্টিত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যখন মানুষ বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন স্বাভাবতঃই সে উৎফুল্ল বোধ করে। ১৯১৮ সালে আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিপর্য্যয়ের পর আমি ক্লেমেন্সোর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ফ্রান্সে যাই। বোভিলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেটা এপ্রিল মাস। আমি যখন গাড়ীতে ক'রে যাচ্ছিলাম, আমাদের কয়েকটি সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ তারা ট্রেঞ্চে কাটিয়েছে। জার্ম্মানদের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ তাদের সইতে হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারা খুব বেশী দূর ছিলো না। অদূরেই কামানগর্জ্জন হচ্ছিল। কিন্তু তাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে—গান গেয়ে শীষ দিয়ে, হুইহুল্লোর ক'রে সে এক কাণ্ড !"

"আপনার কি মনে হয়, ইংলণ্ড আরও দু'বৎসর টিকে থাকতে পারবে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ক্ষিপ্র গতিতে তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, কেনই বা নয় ? ইংলণ্ড আক্রান্ত হবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। তবে অনেক কিছুই

নির্ভর করছে রুশদের উপর। তাদের হতাহতের সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছে তা রীতিমতো ভীতিজনক। পাল্টা আক্রমণ করে তারা আক্রমণ ঠেকাচ্ছে এবং বরাবরই তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি দাঁড়ায়। জার্মানরা ট্যাঙ্ক ও প্যান্‌ৎসার বাহিনী ব্যবহার করায় তাদের প্রাণহানি কম হয়েছে। এই সেদিন উইনষ্টন আর আমি এক সঙ্গে ব'সে বিশ্বযুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলাম। আমাদের মনে পড়লো, আমাদের প্রধান সৈন্যদপ্তরের প্রদত্ত হতাহতের রিপোর্ট সম্পর্কে যখনই আমাদের সন্দেহ হ'তো, আমরা সরকারী জার্মান রিপোর্টের সঙ্গে সেগুলি মিলিয়ে বিচার করতাম, এবং দেখা যেতো জার্মান রিপোর্টের হিসাবই অপেক্ষাকৃত নির্ভুল। যেমন ধরো, পাসেনডেলের যুদ্ধে হেগ (ব্রিটিশ প্রধান সেনাধ্যক্ষ, যাঁকে লয়েড জর্জ্জ ঘোরতর অপছন্দ করতেন) আমাকে জানালো, আটান্নটি জার্মান বাহিনীকে নাকি নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রিপোর্টটি যে অসত্য এবিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। পরে জান্‌তে পারি জার্মান সেনাবাহিনীর এতৎসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির জার্মান হতাহতের সংখ্যার হিসাবই অধিকতর নির্ভুল।"

গুইলিম লয়েড জর্জ্জ এতোক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন, বল্‌লেন, "বর্তমান যুদ্ধে ইউ-বোটের কীর্ত্তিকলাপ সম্পর্কে জার্মানরা অনেক মিথ্যা কথা বল্‌ছে।" পিতা সেটা স্বীকার করলেন এবং এটাও মান্‌লেন যে জার্মানরা তাদের বিমানক্ষতি লঘু ক'রে দেখাচ্ছে।

লয়েড জর্জ্জ পুনরায় আমেরিকার প্রসঙ্গে এলেন, বল্‌লেন, "আমেরিকার শিল্পোৎপাদনের উপরই জয় নির্ভর করছে।" আমি তাঁকে জানালাম যে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। তিনি বল্‌লেন, "তা বটে, তবে কি জানো, তোমরা গত যুদ্ধে বিশেষ তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারোনি। তোমাদের সৈন্যবাহিনীকে ফরাসী কামান ব্যবহার করতে হয়েছিলো, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ

কামান দিয়ে পর্য্যন্ত কাজ চালাতে হয়েছিলো, যেহেতু আমেরিকান বাহিনী যথাযথভাবে সজ্জিত না হয়েই ইউরোপে পৌঁছেছিলো।” এবার সেরকম হবে না বলেই আমার মনে হলো।

লয়েড জর্জ্জ আমার চোখে ইতিহাসের প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। ভাবতেই অদ্ভুত লাগে। যে কোনো সমস্যা চট ক’রে বুঝ্‌তে তাঁর ক্ষমতা অপরিসীম। তাঁর কল্পনাশক্তিও প্রচুর; বোধ করি মন্ত্রিসভার যে কোনো তিনজন সদস্যের কল্পনাশক্তিকে একত্র করলেও তাঁর কল্পনাকে ছুঁতে পারবে না। আমরা ক্রমাগত আমেরিকা ও ব্রিটেন এ দুটি বিষয়ে আমাদের প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করছিলাম। আমেরিকার প্রসঙ্গ আলোচনার প্রতিই তাঁর সমধিক ঝোঁক দেখা গেলো; কিন্তু আমি চাইছিলাম, তিনি ইংলণ্ডের বিষয়ে কথা বলুন। আমেরিকার বিষয়ে বল্‌তে গিয়ে তিনি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথা জিজ্ঞেস করলেন।

এক মুহূর্ত্ত নীরবতার পর আমি প্রশ্ন করলাম, “ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় বিখ্যাত কাউকে গ্রহণ করা হয়নি তার কারণ কি?”

“তোমাদের মন্ত্রিসভাতেই বা বিখ্যাত লোক কই?” লয়েড জর্জ্জ পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন। “রুজভেল্টের মন্ত্রিসভায় নেই, উইলসনের মন্ত্রিসভায়ও ছিলো না।”

আমি বল্‌লাম, “চার্চ্চিল বোধ করি প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্থান দিতে ভয় পান। বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাঁদের আশেপাশে বিখ্যাত ব্যক্তির আনাগোনা পছন্দ করেন না।”

লয়েড জর্জ্জ বল্‌লেন, “কিন্তু সত্যই যদি বিখ্যাত হতো তো কথা ছিলো” এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি নিজের কথাই ভাবছিলেন। “প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে চার্চ্চিলের ভয় থাকা উচিত নয়। কারণ দেশ তাঁকে এবং শুধু তাঁকেই চায়।”—তিনি বল্‌লেন।

আলোচনাপ্রসঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর রুশনেতৃত্বের কথা মনে পড়েছিল। তিনি বল্‌লেন, “রুশ সেনাধ্যক্ষদের কাজ আমার তো মনে হয় খারাপ।

বুদেনীকে একজন উত্তমশীল ক্যাভেল্‌রী অফিসার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।”

আমি বল্‌লাম, “বুদেনী আসলে সার্জ্জেণ্টমেজর; কিন্তু তাঁকে দেওয়া হয়েছে মার্শালের দায়িত্ব।” তিনি হেসে উঠ্‌লেন। ষ্টালিন সম্পর্কে আমার ধারণা কি তিনি জান্‌তে চাইলেন। কয়েক মিনিট বাদে তিনি উঠ্‌লেন এবং আমাকে তাঁর দর্শক-খাতায় স্বাক্ষর রেখে যেতে বল্‌লেন। দর্শক-খাতায় আমার নামের আগে মাইকেল ফুট, ফ্র্যাঙ্ক্‌ ওয়েন প্রভৃতি কয়েকজন নামকরা ব্রিটিশ সাংবাদিকের নাম চোখে পড়লো। পৃষ্ঠার একেবারে উপরের দিকে দেখ্‌লাম সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আইভান মেইস্কি ও মিসেস মেইস্কির নাম রয়েছে।

গুইলিম ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমি ওঁদের বাগান ও ক্ষেত ঘুরে দেখ্‌লাম। হাঁটতে হাঁটতে আমি আতা ও কুল কুড়িয়ে খেতে লাগ্‌লাম। একটা ফলের বাগানের মধ্যে অনেকদূর ঢুকে পড়েছি, দেখ্‌লাম সবুজ রঙ্‌য়ের একটা পশমী জামা গায়ে লয়েড জর্জ্জ তাঁর সম্পত্তি দেখাশুনো ক'রে বেড়াচ্ছেন। চলনে তাঁর দৃপ্ত ভঙ্গী। তিনি যে এক বিরাট ব্যক্তিত্বময় পুরুষ, তাঁর চেহারাতেই সেটা স্বপ্রকাশ।

ষ্ট্রসের বাড়ীর পশ্চাৎদিকে যে প্রশস্ত উদ্যান তাতে ব'সে আমি সূর্য্যের মৃদুমধুর উত্তাপটুকু উপভোগ করছিলাম আর রবিবারের কাগজগুলি পড়ছিলাম। টেলিফোন ‘কলের’ ঝঞ্ঝাট ছিলো না। গৃহকর্ত্তা এবং অন্যান্য লণ্ডনবাসীরা সপ্তাহান্ত ছুটি কিম্বা একদিনের বিশ্রাম উপভোগের উদ্দেশ্যে পল্লী অঞ্চলে গিয়েছিল। গৃহাভ্যন্তর থেকে বিবিসি বেতারে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আওয়াজ আসছিলো। পরিচারিকাপ্রধানা এলা গান শুন্‌ছিল। পুস্তক-সমালোচনা এবং “অব্‌জার্ভার” কাগজের আর্থিক প্রসঙ্গ পাঠের ফাঁকে ফাঁকে আমিও সে-গানে কান দিচ্ছিলাম। সময়টাকে কাটাবার জন্য আমি করাত

দিয়ে কিছু কাঠ চিরলাম—শীতকালে অগ্নিস্থলীর জন্য ব্যবহার করা যাবে। প্রকাণ্ড লনের ধারে ধারে খুব বড়ো বড়ো ক্রীসেনথীমাম্, চোখধাঁধানো ডালিয়া ও মেরীগোল্ড ফুটে' ছিলো। তারিখটি ছিলো ৭ই সেপ্টেম্বর। স্তব্ধ, শান্ত দিন। ঠিক এক বৎসর আগে এই দিনে সাড়ে তিনশো নাৎসী বিমান টেম্স্ মোহনার মুখ বেয়ে উড়ে এসেছিলো; তারপর রাজকীয় বিমান বাহিনীর আবরণ ভেদ ক'রে লণ্ডনে এসে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ক'রে যায়। সেই দিন ১০৩টি জার্ম্মান হানাদার বিমানকে গুলী ক'রে ভূপাতিত করা হয়েছিলো। জার্ম্মানরা হতচকিত হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন্তু লণ্ডনের উপরিস্থ শূন্যস্থলের আধিপত্যের জন্য যে যুদ্ধ, তা' ক্ষান্ত হয় নি। ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত সেটা চলেছিলো। জার্ম্মান বিমান বাহিনীর আক্রমণশক্তি নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়াতেই বোধ হয় তারা সেই থেকে আক্রমণে নিবৃত্ত হয়। তবে মাঝে মাঝে আবার আক্রমণ চল্‌তে লাগ্‌লো। যথা, ১৯৪১ সালের ১০ই মে তারিখের জার্ম্মান বিমান আক্রমণ—সেইটেই বর্ত্তমান যুদ্ধের নিকৃষ্টতম বিমান-আক্রমণ। লণ্ডন সহরের রক্ষাব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত স্যার ওয়ারেন ফিসার আমাকে বলেছিলেন, "এরকম দশটি আক্রমণ হ'লেই লণ্ডন পঙ্গু হ'য়ে যেতো।" কিন্তু উক্ত প্রচণ্ডতম আক্রমণের ছয় সপ্তাহ পর থেকে জার্ম্মাণ বিমান বাহিনী রুশিয়ার উপর তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সুরু করল। আমি যে নয় সপ্তাহ ইংলণ্ডে ছিলাম, লণ্ডনে মাত্র একবার বিমান আক্রমণ হয়েছিলো—তা'ও যৎসামান্য। অবশ্য লণ্ডন সব সময় সজাগ হ'য়েই ছিলো। হাজার হাজার প্রতিরোধ বেলুন—সাম্‌নে থেকে দেখ্‌লে যাদের মনে হয় তিমিমাছের মতো, আর পেছন থেকে দেখ্‌লে মনে হয় বৃহদাকার আমেরিক হরিণের মতো—শূন্যে উচ্চমার্গে বিলম্বিত ছিলো। লম্বা শক্ত ইস্পাতের তারে সেগুলি ভূমিস্থ ভারী ট্রাকের সঙ্গে বাঁধা থাকায় যথাস্থানে তারা সংস্থিত ছিলো।

এতো অসংখ্য বেলুন শূন্যে ভাসমান ছিলো যে তারের জালে আটকে' কাটা পড়ার ভয়ে সেগুলিকে ভেদ ক'রে আক্রমণপর বিমানের তলায় নেমে আস্‌বার সাহস হতো না; কাজেই বিমানবিধ্বংসী কামানের সীমানার মধ্যে যেখানে এসে তারা দাঁড়াতো সেখানেই তাদের থেকে যেতে হতো; আর নিচে নাম্‌তে পারতো না।

তা সত্বেও, বৃহৎ আক্রমণস্থলগুলিকে বিমান-আক্রমণ থেকে কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব নয়। ১৯৪০ সালে একদলের আক্রমণে তিনটি জার্ম্মান বোমা সুড়ঙ্গপথের চল্লিশ ফিট গভীরে গিয়ে প্রবেশ করেছিলো। সুড়ঙ্গপথে তখন বহুলোক নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলো। ভিক্টোরিয়া অঞ্চলে একটি বোমার ঘায়ে ৫৮,০০০ টেলীফোনের তার ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে লণ্ডনের গ্যাসবাহী নালিকাগুলিতে ৮,০০০ জায়গায় ফাটল দেখা গিয়েছিলো। ১৯৪০-এর অক্টোবরে বোমার আঘাতে সাদার্ন রেলওয়ের কাজকর্ম্ম অচল হবার উপক্রম হয়। চরম বিমান-আক্রমণ কালে ইংলণ্ডের কুড়ি লক্ষ গৃহ সম্পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

কিন্তু সেসবই এখন পুরাতন কথা। সেই শান্তিপূর্ণ যুদ্ধকালীন রবিবারে আমি যখন অবজার্ভার কাগজটি পড়ছিলাম, আমার মাথার উপর দিয়ে কয়েকটি মিডিয়ম বোমারু বিমান পূর্ব্বাভিমুখে উড়ে যাচ্ছিলো। তারপর সংবাদপত্রপাঠ ও দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সাঙ্গ ক'রে উঠ্‌তে দেখ্‌লাম জার্ম্মানী এবং নাৎসীকবলিত ইউরোপ ভূখণ্ডে হানা দিয়ে বোমারুগুলি ঘরে ফিরে আস্‌ছে। ইংলণ্ডের আর এখন আহত হবার পালা নয়; জার্ম্মানী রুশিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে আঘাত করতে সুরু করেছিলো। এই অবস্থা কিছুকাল চলে। পরে আবার buzz বোমা আবিষ্কৃত হবার পর হিট্‌লারের মাথায় খেয়াল চাপ্‌লো, শূন্য থেকে ইংলণ্ডকে বিধ্বস্ত ক'রেই যুদ্ধজয় করা যাবে।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের সেই বিরতির সময়ও অবশ্য শত শত প্রৌঢ়া নারী লণ্ডনের সুড়ঙ্গপথে সরকার নির্ম্মিত কাঠের 'বাঙ্কে' রাত্রি অতিবাহিত করেছে। পাছে গৃহে ঘুমের ঘোরে বোমা পড়ে সেই ভয়ে তারা অতিমাত্রায় জড়সড় ছিল। ঈষ্ট হ্যাম এবং লণ্ডনের অন্যান্য ডক ও কারখানা অঞ্চলের অসংখ্য গৃহ বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছিলো। সে সকল এলাকার সমগ্র অধিবাসীরাই ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে রাত্রে ঘুমোতো ; বস্তুতঃ তারা সেগুলিতেই বাস করতো। আশ্রয়স্থল গুলিতেও পানীয়জল, পায়খানা, ক্যানটিন, বিদ্যুৎ ও রেডিয়োর ব্যবস্থা ছিলো। জনসাধারণ এখানে দুই কিম্বা তিন তাকযুক্ত বাঙ্কে ঘুমোতো। শিশুদের জায়গা ছিলো নিচে—প্রাপ্তবয়স্করা ঘুরে ঘুরে সব দেখাশুনো করতো। সকালে শিশুদের স্কুলে পাঠানো হতো। দুপুরে তারা বাড়ি ফিরতো। বাড়ি অর্থাৎ "এই সব দুর্গন্ধযুক্ত, কোলাহলমুখর সুড়ঙ্গ, যেখানে কারও একলা থক্‌বার উপায় নেই।" এই অবস্থার মধ্যে পড়ে পারিবারিক জীবন কিরূপ অস্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলো তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কোন কোন নারী কেঁদে ফেল্‌তো। যুদ্ধে প্রাণহানি, বিধ্বস্ত গৃহ, রেশন, স্বল্প এবং অপকৃষ্ট বস্ত্র—মাত্র এই কয়টি ক্ষতিই যে লণ্ডনকে সইতে হয়েছে তা-ই নয়, আরও একটা বড় ক্ষতি তার হয়েছে।—স্নায়ুর বিকৃতি। এবং স্নায়ুবিকার মানে একটু একটু ক'রে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই অসুস্থতার জের টেনে চলা। এমন কি ভবিষ্যৎ সন্ততিদেরও এর কুপ্রভাব বয়ে বেড়াতে হয়। ইয়র্ক, বাথ, রদারহ্যাম, শেফীল্ড এবং অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ব্রিটিশ সহর আমি পরিভ্রমণ করেছি সেখানে অবস্থা লণ্ডনের তুলনায় একটু ভালো ; কিন্তু তারতম্যটা খুব বেশি মৌলিক নয়। তবে ইউরোপ ভূখণ্ডের অবস্থা এর চাইতে অনেক খারাপ।

যুদ্ধোত্তর ইউরোপ স্নায়ুপীড়িত নরনারী ও শিশুতে পরিপূর্ণ। অথচ এদেরই দেশ নূতন করে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। সেই সঙ্গে

তাদের নিজেদেরও গ'ড়ে তোলার সাধনা করতে হবে, মানুষের শালীনতায় তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আন্‌তে হবে।

ব্রিষ্টল থেকে বিমানযোগে লিস্‌বনে এলাম। সেখানে নিউইয়র্ক-গামী বিমানে আসন সংগ্রহের জন্য আমাকে আটদিন অপেক্ষা করতে হলো। আমি জান্‌তাম্ দুদিন আগে হোক পরে হোক্, আসন পেয়ে যাবো। তা সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার এই ভেবে রাগ হ'লো যে যেখানে আমি থাকতে যাচ্ছি না সেখানে আমাকে নিরুপায় হয়ে থাক্‌তে হচ্ছে। হাজার হাজার শরণাগত—তাদের অধিকাংশই ইহুদী, মাসের পর মাস লিস্‌বনে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কবে যে তারা সেখান থেকে বেরোতে পারবে তার কোনই নিশ্চয়তা ছিলো না। আমেরিক বৈদেশিক সংবাদদাতা জে এলেন বলেছিলেন যে "হিট্‌লার ইচ্ছা করলে টেলীফোনযোগেই পার্ত্তুগাল দখল করতে পারে।" ইহুদী শরণাগতরাও সেকথা ভালো ক'রে জান্‌তো।

একদিন ভিলা ফ্র্যাঙ্কা দ্য জিরাঁ-তে বৃষের লড়াই দেখ্‌তে গেলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন গেল বর্ডেন, "ওয়াশিংটন পোষ্টের" মালিক ইউজিন মেয়ার, এবং ব্রিটিশ দূতাবাসের স্যাম হার্ব্বার্ট, মিসেস হার্ব্বার্ট ও মাইকেল ষ্টুয়ার্ট। স্পেনীয় বৃষের লড়াই চমকপ্রদ দেখ্‌তে; কিন্তু পোর্ত্তুগীজ বৃষের লড়াই নীরস ব্যাপার। একটি সুন্দর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বৃষের সহিত সংগ্রামরত বীর লড়াই চালায়। ঘোড়ার পায়ের কাজ অদ্ভুত ও চমৎকার। স্পেনে যেমন প্রত্যেকটি বৃষকেই মেরে ফেলা হয়, পোর্ত্তুগালে তেমন নয়। এখানে কয়েকজন সাহসী লোক বৃষটির মাথায়, লেজে ও পাঁজরে শক্ত করে চেপে ধরে, তারপর তাকে ক্রীড়াঙ্গন থেকে বের ক'রে আনা হয়।

পোর্ত্তুগীজ জনসাধারণ ব্রিটিশসমর্থক। তাদের "ভি" চিহ্নিত বোতাম পরা এবং নাৎসী পরাজয়ে তাদের খুসীর ভাব দেখেই সেটা বোঝা যায়। ডিক্টেটর সালাজারনিয়ন্ত্রিত যাজক-ফ্যাসিস্ত পোর্ত্তুগীজ গবর্ণমেন্টও ব্রিটিশ-সমর্থক ছিল, কেননা তারা জানতো যে পোর্ত্তুগাল সম্পর্কে ইংলণ্ডের কোনো কুমতলব নেই। কিন্তু ইউরোপে ফ্যাসী-বিরোধীদের জয়ে পাছে না তাদের আসন টলে, তাদের সে ভয় ছিলো। কাজেই তারা ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী উভয়েরই মনরক্ষা করে চল্‌ছিলো এবং উভয় দেশেই মাল বিক্রি ক'রে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করছিলো।

লিস্‌বনে রাস্তার ধারের অসংখ্য ছোট ছোট ষ্টলে নাৎসীদের প্রকাশিত পুস্তকমালা বিক্রি হতো ব্রিটিশ গ্রন্থ ও পুস্তিকাদিও বিক্রি হ'তো। জার্ম্মান দৈনিক সাপ্তাহিকগুলি আমি খুব মনোযোগ সহকারে পড়তাম। প্রত্যেকটি কাগজেই রুশিয়ায় জার্ম্মানদের সমূহ অসুবিধার বর্ণনা দেওয়া থাক্‌তো—কর্দ্দম, আর্দ্র ও ক্লেদাক্ত জমি, বালিময় পথ ও বিশ্রী যানবাহন ব্যবস্থা। এই স্বীকৃতি যেন সর্ব্বত্রই প্রচ্ছন্ন যে জার্ম্মান সেনাপতি বাহিনী গোড়ায় রুশিয়াকে যা ভেবেছিলো, রুশিয়া তার চাইতে অধিক শক্তিশালী।

পথে, রেস্তোরাঁয়, সিনেমায় যে সকল পোর্ত্তুগীজ আমি দেখতাম তারা যেন স্পেনীয়দের ন্যায় তেমন সজীব, প্রানবন্ত ও বলিষ্ঠ নয়। কিন্তু স্পেনীয়দের ন্যায় সমানই তাদের কোলাহল—ঘন ঘন পিঠে চাপড় মারবার কায়দাও একই রকম। পোর্ত্তুগালের রাস্তায় প্রধানতঃ পুরুষই দৃশ্যমান ; মেয়েরা কদাচিৎ কাজে বা রেস্তোরাঁয় যায়।

ভবিষ্যতের আবির্ভাব

"রবিবার সকাল ন'টায় আমি ইউরোপ থেকে রওনা হয়েছিলাম, সোমবার বিকেল তিনটেয় নিউইয়র্ক এসে পৌঁছুই।" পেন্‌সিল-ভ্যানিয়ার নিউ ক্যাস্‌ল্‌-এ ষ্টেট টিচার্স এসোসিয়েসনের সম্মেলনে সমবেত শ্রোতারা এ কথায় একেবারে হতবাক্‌ হয়ে গেলেন বলে মনে হলো। মহাসমর আজ যে স্থানসান্নিধ্যের সূচনা করেছে তাঁরা সেটাকে অনুভব করতে লাগ্‌লেন যেন।

২৪শে অক্টোবর আমি শিক্ষক সম্মেলনে বলি : "অনেক বিবেচনার পর যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে আমি ইউরোপ থেকে ফিরেছি তার সারমর্ম্ম হলো এই : ইংলণ্ড জিত্‌তে পারে না, সম্ভবতঃ জার্ম্মানীর পক্ষেও যুদ্ধ-জয় অসম্ভব ; ওদিকে ইংলণ্ডও আপোষ-সন্ধির ভিত্তিতে যুদ্ধের অবসান ঘটাবে না।" তা হলে সিদ্ধান্ত কী দাঁড়ায় ? "একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে ; এক-নায়কত্বের পরাজয় ঘটিয়েই তা পারে।" [জনৈক ষ্টেনোগ্রাফার আমার বক্তৃতা টুকে নিচ্ছিলেন, পরে তিনি আমার কাছে তার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দেন,—তা আমি রেখে দিয়েছি।] আমি আরো বলেছিলাম, "যুদ্ধ সম্পর্কে যে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাতে ক্রুটি ঘট্‌লে যুদ্ধকে জিইয়েই রাখা হয়।"

যুদ্ধ থেকে সরে থাকা হবে, না তাতে যোগদান করা হবে—জাপানই সে প্রশ্নের মীমাংসা করে দিল ; পার্ল হারবারে জাপানীরা আমাদের বুঝিয়ে দিল যে, পৃথিবীতে বিমান আছে এবং এটা বিংশ শতাব্দী।

১৯৪১-এর ৭-ই ডিসেম্বর আমি ইরাণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লিখিত রুশিয়া-সম্পর্কিত

পত্রাবলীর প্রণেতা আর্থার আপ্‌হ্যাম পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেখানে তাঁর মার্জ্জারকুল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গদীতে বসে আমাদের চা খাওয়া হলো। তারপর যখন সেখান থেকে চলে আস্‌ছি, চাপরাশধারী এক ব্যক্তি আমাকে বললো, "জাপানীরা হাওয়াইতে আমাদের আক্রমণ করেছে।" সেই সন্ধ্যায় ট্রেণ যখন নিউইয়র্ক থেকে সিন্‌সিনাটির দিকে ছুটে চলেছে, গাড়ীভর্ত্তি অসামরিক লোক তখন বেতারে সংবাদ শুন্‌ছেন। তাঁরা যে বিষাদভরাক্রান্ত, তাঁদের নীরবতা থেকেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল।

পার্ল হারবারের ঘটনা এক আত্মবিধ্বংসী নিদারুণ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। জাপানীরা সে ভুল করতে গেল কেন? ১৯৪১-এর ৭-ই ডিসেম্বর তারা যে আঘাত হেনেছিল, নিঃসংশয়েই তার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ধ্বংসসাধন বা তাকে পঙ্গু করে দেওয়া। জাপানের নেতৃবৃন্দ কি মনে করেছিলেন যে, আমেরিকার শিল্পসামর্থ্য এত তুচ্ছ যে, সে তার ক্ষতির অঙ্ক তাড়াতাড়ি পূরণ করে নিতে পারবে না? তাঁরা কি ভেবেছিলেন যে, আমেরিকা এতখানি মুমূর্ষুচেতন যে উচ্চবাচ্য না করে সে এই অপমান পরিপাক করে নেবে? টোকিও কি ততখানিই নির্ব্বোধ?

জাপানীরা ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করেছিল কেন প্রশ্ন তা নয়। সেখানে তারা ইউরোপের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্পদ অপহরণের একটা সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তার উপরে আবার তারা জোর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে নামাতে গেল কেন? অকারণে মার্কিন সামরিক শক্তিকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করানোর মধ্যে যুক্তি কোথায়?

টোকিওর সাম্‌নে দুটিই মাত্র পথ খোলা ছিল। হয় তাকে উত্তরে হানা দিয়ে সোভিয়েট রুশিয়ার জমি দখল করতে হয়, আর নয়তো

ব্রিটিশ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী-অধিকারভুক্ত জমি দখলের জন্য তাকে দক্ষিণে হানা দিতে হয়। জাপানী রাজনীতিকদের মধ্যে এক বিরাট অংশ মনে করতেন যে, রুশিয়াকে দিয়েই জাপানের প্রধান আশঙ্কা। ১৯৪১ এর অক্টোবর, নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে হিট্‌লার যখন মস্কো এবং ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন তাঁরা মনে করছিলেন যে, সেই অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জাপানের পক্ষেও সাইবেরিয়ার উপর আক্রমণ চালানো প্রয়োজন। সে যুদ্ধ চালাতে হতো জাপানের স্থল-বাহিনীকে।

এর উল্টোদিকে জাপানের নৌবাহিনীও তখন এ যুক্তি দেখাতে পারে যে, দক্ষিণে হানা দিলে জাপান বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল এবং জনবলের অধীশ্বর হবে। সে সম্পদ সোভিয়েট পূর্ব্ব-এশিয়ার সম্পদের অনেক বেশী। তা ছাড়া তাতে চীনা-প্রতিরোধেরও অবসান ঘটানো যায়।

এই যুক্তিতেই জাপান দক্ষিণে অভিযান চালিয়ে হংকং, মালয় এবং সিঙ্গাপুরের দিকে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, জাপানী নৌবাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুঁচিয়ে যুদ্ধে নামাতে গেল কেন? অবলীলাক্রমে যুদ্ধজয়ের স্বপ্নে কি জাপানী অ্যাডমিরালদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল? পরিণাম চিন্তা না করে কাজ করে বলেই উন্মাদদের উন্মাদ বলা হয়। পার্ল হারবারের ঘটনা হয়তো সেই মূঢ়তারই পরিচয়; ক্ষমতা-উন্মত্ত সেনাধ্যক্ষদের এ রকম মূঢ় আচরণ এই প্রথম নয়। জাপানের যে মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন যোদ্ধারা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র হাতে পেয়েছিল এ ঘটনা হয়তো তাদের সেই বুদ্ধিবিভ্রমেরই পরিচয় দিচ্ছে।

তা সত্ত্বেও জাপানের পক্ষে পার্ল হারবার দখল করিবার যুক্তিযুক্ত প্রয়োজনও ছিল। ১৯৪১ সালে তার পূর্ব্ব এশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন, রুশিয়া এবং হল্যাণ্ড যখন হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধ-ব্যাপৃত অবস্থায়

অন্য কোনও দিকে মন দিতে অক্ষম তখন, এই সুবর্ণ-সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, সে জন্য তার পক্ষেও আঘাত হানবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

১৯৪০ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের পতন হয়; ইংলণ্ডেরও তখন টলোমলো অবস্থা; সেই সময়ে দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালালে জাপানের আরও অনেক সুবিধে হতো। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান যে ফরাসী-ইন্দোচীনের বেশী আর কিছু গ্রাস করতে সমর্থ হয়নি, খুব সম্ভবতঃ তার কারণ হলো এই যে, সে সময় সে প্রস্তুত ছিলনা। আর একটা কারণ হলো রুশিয়া। ইউরোপের যে সমস্ত অঞ্চল পূর্ব্বে জারের অধিকারভুক্ত ছিল—হিট্‌লার যখন অন্যত্র ব্যস্ত, নিরপেক্ষ রুশিয়া তখন তার সেই প্রাক্তন অঞ্চল দখলের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। এশিয়া ভূখণ্ডেও জাপানের অধিকারভুক্ত এমন অনেক অঞ্চল ছিল পূর্ব্বে যার অধীশ্বর ছিলেন জার। জাপান যদি দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হয় তা হলে রুশিয়া আবার সেই সুযোগে তার পুরোণো জমি পুনর্দখলের চেষ্টা করবে কিনা—সে কথা ভেবে টৌকিও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তবে, পূর্ব্ব-এশিয়ায় সোভিয়েট অভিযানের যে আশঙ্কা ছিল ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে রুশ-জাপান চুক্তি এবং ১৯৪১ সালের জুন মাসে রুশিয়ার উপর হিটলারের অভিযানের ফলে সে আশঙ্কা তিরোহিত হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান যে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করে এতে সেই অভিযানেরই পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

১৯৩৯, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ এই ক-বছরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের উত্তরোত্তর অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৩৯ সালের ১০ই জুলাই তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল ওয়াশিংটনস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূতকে জানিয়ে দেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র চীন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জকে মাঞ্চুরিয়ার

দশাপ্রাপ্ত হতে দিতে রাজী নয়। একই সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের উপর অর্থনৈতিক চাপও দিতে থাকে, এবং মার্কিণ নৌবাহিনীর এক বিরাট অংশকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকা থেকে জাপানে যে বিমানের জন্য ব্যবহার্য্য গ্যাসোলিন রপ্তানী করা হতো ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে তা এবং অধিকাংশ রকমের যন্ত্রপাতি রপ্তানী করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পরের মাসে লৌহ এবং ইস্পাতের পাত রপ্তানী করাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জাপানের যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, ১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক আদেশ করে তা আটক করেন। এর দু'দিন আগেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জাপানকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ফরাসী-ইন্দোচীনের নিরপেক্ষতা যেন লঙ্ঘন না করা হয়। তা সত্ত্বেও জাপবাহিনী সেই সমৃদ্ধ উপনিবেশকে দখল করে যেতে থাকে। চার্চ্চিলের সঙ্গে আটলাণ্টিক-সাক্ষাৎকার শেষ করে ফিরে এসেই ১৯৪১ সালের ১৭ই আগষ্ট প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জাপানী রাষ্ট্রদূতকে একটি লিপি প্রদান করেন; তাতে বলা হয়েছিল যে, জাপান যদি "জবরদস্তি করে' অথবা জবরদস্তির ভয় দেখিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির উপর সামরিক প্রভুত্ব বিস্তার"-এর নীতিই অনুসরণ করতে থাকে, তা হলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র "নিজের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে বাধ্য হবে।"

এই তারিখটির গুরুত্বই বোধ হয় সর্ব্বাধিক। জাপ নৌবাহিনী তখন ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত নূতন নূতন বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করতে উদ্যত। এই অবস্থায়, জাপানের ইন্দোচীন দখলে রুজভেল্ট-সরকার যে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন তা থেকে টোকিও বুঝতে পারলো যে, জাপান যদি নতুন কোনও অঞ্চল, বিশেষতঃ বোর্নিও, সুমাত্রা এবং মালয়ের মতো কাঁচামাল-সমৃদ্ধ এবং সামরিক

পরিস্থিতির দিক্ থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের উপর আক্রমণ চালায় তাহলে তার ফলে তাকে কঠোর মার্কিণ-প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। আমেরিকার মনোভাব ক্রমান্বয়েই সমরোন্মুখ হয়ে উঠছিল।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আশা করেছিলেন যে, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই তিনি আক্রমণের অবসান ঘটাতে সমর্থ হবেন। এ মনোভাব প্রশংসার্হ। তবে নৌ ও সামরিক দিক থেকে আমেরিকা এ-সময় এত দুর্ব্বল ছিল যে, মিঃ রুজভেল্ট তার কূটনৈতিক চালে কিছুটা বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিলেন বলে মনে হয়। যাই হোক, পার্ল হারবারকে বাঁচাবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আরো কয়েক মাস আগেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল কিনা ইতিহাসই সে কথা প্রমাণ করবে।

রুজভেল্টের দাবী মেনে নিতে হলে জাপানকে তার রাজ্যবিস্তার-নীতি পরিহার করতে হয়; এমন কি ইতিপূর্ব্বে সে চীনের যে-সমস্ত অঞ্চল দখল করেছে তাও প্রত্যর্পণ করতে হয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে এমন এক নিরীহ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। তারা দেখলো যে বিশাল এক সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করতে হলে ১৯৪১ সালই তার সুবর্ণসুযোগ;—সে সাম্রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যকেও টেক্কা দেবে। বৃহত্তর এশিয়ার দুর্গ-প্রাকারের আড়ালে তারা অপরাজেয় হয়ে থাকতে পারবে—এই ছিল তাদের বিশ্বাস।

অতএব তারা স্থির করলো যে, মার্কিণ সশস্ত্রবাহিনী ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মার্কিণ নৌবাহিনীকে পঙ্গু করে ফেলতে হবে। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে ওয়াশিংটনে যে আলাপ-আলোচনা চলে তা থেকেই টোকিও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে অনিবার্য্যভাবেই আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো; তাই সে আমাদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই মার্কিণ যুক্ত-

রাষ্ট্রের একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে স্থির করলো। পার্ল হারবার আক্রমণের পটভূমিকা হলো এই।

সাম্রাজ্যজয় ও তা রক্ষার জন্য জাপান একটি বিরাট বেষ্টনী গঠনের পরিকল্পনা করেছিল, ব্রহ্মদেশ, টাইমর, ফিলিপাইন, ওয়েক এবং গুয়াম সেই বেষ্টনীর মধ্যে থাকবে, খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়াও। জাপান ভেবেছিল যে, এই ঘাঁটিগুলির আশ্রয়ে থেকে এবং তাদের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে দীর্ঘতম অবরোধকেও সে পার হয়ে যেতে পারবে। টোকিও কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, আমেরিকা সর্বাগ্রে ওয়াদালক্যানালে সেই বেষ্টনীর একটি টুক্‌রোকে উড়িয়ে দেবে, তারপর লেট-এ সেই বেষ্টনী বিদীর্ণ করে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে বেষ্টনীর কেন্দ্রস্থল ওকিনাওয়াকে ভেদ করে অগ্রসর হবে; এবং ইতিমধ্যে, সম্রাট হিরোহিতো যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সন্ধিপ্রার্থনা করছেন, খাস জাপানের উপরেই বোমা, পরমাণু-বোমা এবং গোলাবর্ষণ করে যাবে।

হিট্‌লারের রুশিয়া-অভিযানের ফলে টোকিওতে একমাত্র এই ধারণারই সৃষ্টি হতে পারে যে, ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ চালিয়ে হিট্‌লার তাকে পরাজিত করতে অক্ষম। হিট্‌লার ভেবেছিলেন যে, রুশিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে তিনি একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারবেন। তাঁর যুক্তি এই যে, রুশিয়াকে যদি তিনি তাঁর প্রভুত্বে আন্‌তে পারেন তা হলে জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটানো সম্ভব হবে না। জাপান যুদ্ধে নাম্‌লে বৃটিশ এবং মার্কিণ শক্তি ইউরোপ এবং এশিয়ায় বিভক্ত হয়ে পড়বে; ফলে জার্ম্মানীকে পরাজিত করা আরো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে পরাজিত জার্ম্মানীও ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীকে এমনভাবে যুদ্ধে ব্যপৃত করে রাখ্‌তে পারবে যাতে তারা জাপানের পরাজয় না ঘটাতে পারে। জার্ম্মানী যদি একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে তা হলে তাতে জাপানের পক্ষেও একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করতে সুবিধে হয়।

চক্রশক্তি রুশিয়া, ইউরোপ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর প্রভুত্ববিস্তার করতে পারলে তার ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির যুদ্ধ-জয়ের পথ রুদ্ধ হতো। এই অবস্থায় চক্রশক্তি ভেবেছিল যে, আর কিছু না হোক, যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিতই থেকে যাবে; নাৎসী এবং জাপানীদের মধ্যে এক অংশ হয়তোবা এই অবস্থায় চূড়ান্ত বিজয়ের স্বপ্নও দেখে থাক্‌বে।

চক্রশক্তির এই গণনায় রুশিয়া এবং আমেরিকার শক্তিকে বড়ই কম করে ধরা হয়েছিল।

ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কয়েক মাস আমি আমার বক্তৃতাবলীতে ক্রমাগতই শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, রুশিয়াকে ক্রমবর্দ্ধমান হারে সাহায্যদান এবং যুদ্ধোত্তর শান্তি পরিকল্পনা নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। তখন থেকেই আমি 'শান্তি'র উপরে জোর দিয়ে আস্‌ছি। যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি; তা সত্ত্বেও আমি যুদ্ধের সমর্থক ছিলাম এই কারণে যে, আমি প্রকৃত শান্তি কামনা করি, এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানি যে, শক্তিশালী আক্রমণকারীরা যতদিন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল দেশগুলিকে শিকার করে ফিরছে ততদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

১৯৪২ সালের বসন্তকালে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি সফর করবার সময় আমি দেখতে পাই যে, বহু লোকই জাপানীদের বিমান আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। অনেকে এ দাবীও জানিয়েছিল যে, আমেরিকাকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দেশেই রেখে দেওয়া হোক্‌। ধনী পরিবারগুলি তখন সান্‌ ফ্রান্‌সিস্‌কো, সিটল্‌ এবং অন্যান্য সহর ত্যাগ করে আরিজোনা এবং নেভাডার নিরাপদ অঞ্চলে চলে যাচ্ছে। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমি তখন জানিয়েছিলাম যে, মাত্র পাঁচ সেণ্ট

পেলেই শত্রুপক্ষের বোমায় মৃত্যু বা ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে আমি তাদের মোটা অঙ্কের বীমা করিয়ে দিতে প্রস্তুত।

১৯৪২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী আমি যে বক্তৃতা দিই তা থেকে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোর সংবাদপত্রগুলিতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করে দেওয়া হয়েছিল: "চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে আমি আশাবাদী। আমরা জয়লাভ করবো। তবে এখনও পর্য্যন্ত আমরা আদৌ যুদ্ধে নেমেছি বলেই আমার মনে হয় না। অসামরিক জনসাধারণকে তার জন্য কিছুমাত্রও প্রস্তুত করে তোলা হয়নি। এযাবৎ শুধুমাত্র সৈন্যবাহিনী এবং কলকারখানাতেই সেই প্রস্তুতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সরকার থেকে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে, জনসাধারণকে আজ স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনযাত্রার মানকে সঙ্কুচিত করে আন্‌তে হবে।"

ইউরোপে থাক্‌তে কারখানা পরিদর্শন করা আমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়; এখানেও আবার সেই পুরোণো অভ্যাসবশে সম্ভব হলেই আমি কারখানা পরিদর্শন করতে আরম্ভ করেছিলাম। সিট্‌ল্‌-এর বিমান-তৈরীর কারখানায় আমি একটা পূরো দিনই কাটিয়ে দিই। টাকোমা এবং পোর্টল্যাণ্ডেও আমি জাহাজ-তৈরী কারখানা পরিদর্শন করি। সেখানে আমি যা দেখলাম তা বেশ উৎসাহজনক। ১৯৪২-এর ৭ই মার্চ্চ আমি 'নেশন' পত্রিকায় লিখি, "একটি বিরাট কারখানাতে মাত্র এক মাসের মধ্যেই উৎপাদনের হার শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে; এখানে যে অস্ত্র উৎপাদন করা হচ্ছে তা বোধ হয় আধুনিক ধরণের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র।" "ব্যুইং ফ্লাইং ফোর্ট্রেস্‌"-এর কারখানা সম্পর্কেই আমি একথা বলেছিলাম; তখন এ সম্পর্কে গোপনীয়তা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। "পার্ল হারবারের ঘটনাই আমাদের তাড়াতাড়ি সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলেছে। প্রতিদিনকার সামরিক ইস্তাহার থেকেই শ্রমকিরা বুঝতে পারে যে, আজ এবং প্রত্যহ তারা যে-কাজ করে চলেছে—অল্পক্ষণের মধ্যে তারই ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়।"

সমরোপকরণ তৈরীর পৃথক পৃথক কারখানার ম্যানেজারদের আমি প্রশ্ন করেছিলাম তাঁদের প্রধান অভাব কি। তাতে তাঁরা সকলে একই উত্তর দিলেন—'কাগজ'। তাঁরা বল্‌লেন, "ওয়াশিংটন থেকেই আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়; তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রও এই-রকমের তথ্য চেয়ে পাঠাচ্ছে। তারপর নানা অঞ্চলের লোকেরাও এ সম্পর্কে বিশদ্‌ভাবে জান্‌তে চান। আবার, ওয়াশিংটনের কোনও দপ্তর থেকে হয়তো তারযোগে এমন সমস্ত হিসাবপত্রের বিবরণী চেয়ে পাঠানো হলো, যা তারি পাশের অন্য এক দপ্তরের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এর আর শেষ নেই।"

কোনও কারখানার জনৈক পদস্থ ব্যক্তি একটি অসম্পূর্ণ বাড়ীর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, "ওখানে কয়েক শো কুস্তীগীরকে জায়গা করে দেওয়া হবে; তাঁরা সব নথিপত্র নিয়ে কুস্তী লড়বেন।" এই ব্যাপক অসন্তোষের কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না তা আমার নিশ্চিতভাবে জান্‌বার উপায় ছিল না। তবে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে বড় বেশীরকম জিজ্ঞাসাবাদ করতেন বলে মনে হয়েছে। কারখানার পরিচালকদের তাঁরা অযথা উত্যক্ত করে তুল্‌তেন; তাতে উৎপাদনের পথে বিঘ্নসৃষ্টিই করা হতো।

কাজে অনুপস্থিত হওয়াটা একটা জাতীয় সমস্যায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকদের বিপথে চালিত করবারও এটা একটা সুবর্ণ-সুযোগ। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে আমি দেখতে পাই যে, 'গরহাজির' শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই হলো সন্তানের মাতা। দেশরক্ষা বিভাগীয় বহু শ্রমিকই দূরবর্ত্তী বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে এসেছে। বাড়ীতে ঠাকুরমা, খুড়ীমা, বা ভাইঝি-ভাগ্নী না থাকায় মায়েদের পক্ষে অসুস্থ শিশুকে বাড়ীতে ফেলে রেখে কারখানায় যাওয়া সম্ভব হয় না। গরহাজির শ্রমিকরা একটা সমস্যারই সৃষ্টি করেছিল। বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্য এবং আসবাবপত্রের খোঁজে বেরিয়ে

অনেকসময় তারা কাজে যোগ দিতে পারতো না। মাঝে মাঝে হাতে প্রচুর টাকা পড়ায় কাজে যোগ না দিয়ে তারা মদ্যপান এবং আরো নানা পথে টাকা উড়িয়ে দিতে আরম্ভ করতো। তা ছাড়া যুদ্ধকালীন অনিশ্চিত অবস্থায় তাদের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল কাজে যোগ না দেওয়ার সেটাও একটা কারণ। বড় বড় শহরের ফুটপাথের উপর প্রতিদিন সকালেই শূন্য হুইস্কির বোতল ছড়িয়ে পড়ে থাক্‌তো, তার অর্থ—সমরোপকরণ তৈরীর কারখানাগুলিতে বহু শ্রমিক সেদিন কাজে যোগ দেয়নি। এই গরহাজিরার মূলে যথেষ্ট বাস্তব কারণও ছিল। তারা যে কেবল ছুতোনাতা করে অনুপস্থিত থাক্‌তো তা নয়। শ্রমিকদের শিশুদের যাতে দিনের বেলায় ঠিকমতো দেখাশুনো হয়, সেজন্য কোনও এক কারখানায় একটি শিশু-ললনাগার প্রতিষ্ঠা করে দেখা গেল যে, তাতে গরহাজিরার হিড়িক যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে।

মজুরীর উচ্চহারই তখন সকলের আলোচনার মূল বিষয়। সৈন্য এবং বিত্তশালী অসামরিক ব্যক্তিদের আমি বল্‌তে শুনেছি, "সৈন্যরা যদি দিনের মধ্যে অষ্টপ্রহর কাজে হাজিরা দিয়ে জীবন বিপন্ন করেও মাসে মাত্র ২১ ডলার করে পায়, তবে শ্রমিকরা কেন সপ্তাহে ৪০।৫০ ডলার করে পাবে?" যন্ত্রের নির্ঘোষ এবং এসিটিলিন টর্চ্চের উজ্জ্বল আলোকময় পরিবেশে যুদ্ধ-কারখানার শ্রমিকদের কাছেও আমি সেই প্রশ্নই উত্থাপন করেছিলাম। ঢিলে পোষাক-পরা রঞ্জিত-ওষ্ঠ একটি সুন্দরী মেয়ে তাতে জবাব দিল, "কংগ্রেস-নিযুক্ত কমিটি থেকে উপরওয়ালাদের আজ মুনাফাখোর বলে রায় দেওয়া হচ্ছে; সেই উপরওয়ালারা যেখানে আজ লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জ্জন করছেন, সেখানে এই চড়া বাজারে আমি যাতে আমার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিন্‌তে পারি তার জন্যে আমিই বা ভালো-মজুরী পাবোনা কেন?" জনৈক ক্রেন-শ্রমিক বল্‌লো, "উপরওয়ালারা যেদিন মাসে ২১ ডলার করে নেবেন, সে দিন আমিও

তাই নেবো।" একজন ওয়েল্ডার চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো, "ছুটির দিন কাজ করে আমি যে দ্বিগুণ মজুরী পাই, তা যদি আমি ছেড়ে দিই তা হলেই কি সে টাকা ম্যাক-আর্থারের সৈন্যদের হাতে গিয়ে পৌঁছুবে? না, সে টাকা গিয়ে পৌঁছুবে কোম্পানীর অংশীদারদের কাছে।" যুদ্ধ-কালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা যে ত্যাগস্বীকার করেছে তার মধ্যে কোনও সমতা ছিলনা।

আমেরিকার যুদ্ধবাদী ব্যক্তিরা এই সময় পশ্চিম-অঞ্চলে খুবই তৎপরতার পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে ভাবতো যে, মিসেস্ রুজভেল্টকে গালিগালাজ করলেই বা যে-সমস্ত জাপানী দু-পুরুষ ধরে আমেরিকার বাসিন্দা তাদের কলরেডোতে নির্ব্বাসন দিলেই যুদ্ধ-জয় সম্ভব হবে। অনেক মহিলার সঙ্গে আমি আলাপ আলোচনা করে দেখেছি, তাঁরা এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে জাপানী ফিরিওয়ালারা তাদের শাকসব্জীতে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। অনেকে আমাকে জানালেন যে, উপকূলবর্ত্তী সহরগুলি থেকে জাপানী বাসিন্দাদের জোর করে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া দরকার; নইলে, যদি কোনও বিমান-আক্রমণ ঘটে তাহলে মার্কিণরা ক্ষেপে গিয়ে তাদের হত্যা করতে পারে। যে-সমস্ত সংবাদপত্র খালি উত্তেজনা ছড়িয়ে বেড়ায় তারা এইসময় গলাবাজী করে বল্‌তে লাগলো যে, জাপানীদের উপর অন্তরীণাদেশ জারী করতে হবে। বিচ্ছিন্ন জাপানী কৃষকদের উপর ক্রমেই আক্রমণ বেড়ে যেতে লাগলো। এ-সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় এলে খৃষ্ট বলতেন, "যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী তার মাতাপিতা নির্ব্বাচন করে নিতে পেরেছে সেই যেন পরের ছিদ্রান্বেষণ করতে যায়।"

ক্যালিফোর্নিয়ায় দেখলাম এক হতাশামূলক মনোভাবের সঞ্চার হয়েছে। "পূর্ব্ব-এশিয়া বিশেষজ্ঞরা" ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, আমরা "মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে জাপানীদের তাড়িয়ে দিতে পারবো।" এতদিন পর্য্যন্ত নাগরিকদের

মন যেখানে নির্ব্বোধ অহঙ্কারে বোঝাই হয়ে উঠেছিলো, এই ভবিষ্যদ্বাণীর অসারত্ব বুঝতে পারার পর সেখানে আবার অযথা নৈরাশ্যের সঞ্চার হলো।

তবে উৎপাদনের হার এ-সময় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। ৩রা মার্চ্চ মিলঅকিতে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমি বলি, "আমেরিকার যন্ত্রশক্তি আবর্ত্তিত হতে সুরু করেছে।" তাতে আমি বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, আমাদের পক্ষে এমনভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তা কারুর পক্ষে "শাস্তিমূলক" হয়ে না দাঁড়ায়, তা যেন সকলকে "নিরাময়" করে তুল্‌তে পারে। দৃঢ়ভাবে আমি বলি, "প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শই হলো শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। ইতিপূর্ব্বে কোনও মহাসমরের পরেই এ পথে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়নি।

১৯৪২-এর ১১ই মার্চ্চ আমার বক্তৃতা থেকে "সেণ্টপল্‌ ডেস্‌প্যাচ্‌" পত্রিকার নিম্নলিখিত অংশটুক তুলে দেওয়া হয়; "হিটলার বুঝতে পেরেছিলেন্‌ যে, গ্রেট বৃটেনকে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব; তাই তিনি তার পরিবর্ত্তে রুশিয়াকে আক্রমণ করে বস্‌লেন।....এখন রুশিয়া যাতে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে মিত্রপক্ষকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ষ্টালিন এ-যুদ্ধে দেবদূতদের পক্ষ হয়েই লড়াই করছেন; এবং দেবদূতরা যদি এখন টিঁকে থাক্‌তে চান তা হলে তারা অবিলম্বে ষ্টালিনকে সাহায্য করলেই বুদ্ধির কাজ করবেন;....রুশিয়ার পক্ষে সাহায্য পাওয়া দরকার, প্রচুর সাহায্য পাওয়া দরকার।...."

১৫ই মার্চ্চ তারিখে কেনটাকির অন্তর্গত লুইভিলে এক বক্তৃতায় আমি বলি, "যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হলো রুশিয়া, আর ভারতবর্ষ হলো শান্তির প্রতীক।" বক্তৃতায় আমি দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলাম যে, লাল ফৌজ হিটলারের গতিরোধ করেছে সত্য, কিন্তু এখনো তাঁর দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।

ওদিকে জাপানীরা তখন পূর্ব্ব এশিয়ার মধ্য দিয়ে দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তখন আমি বলেছিলাম, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ যে বেহাত হয়ে গেল, আংশিকভাবে রণসম্ভারের অভাব এবং আংশিক-ভাবে বৃটিশের কিপলিংসুলভ প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী নীতিই তার জন্য দায়ী। বৃটেনের দুর্ব্বলতার কারণ হলো এই যে, ভাবনাধারণার দিক থেকে বৃটিশ সরকার আজ এক যুগ পিছিয়ে আছেন। বিগত সমস্তগুলি শতাব্দীই যেন একত্রিতভাবে চার্চ্চিলের মধ্যে রূপপরিগ্রহ করেছে—বিংশ শতাব্দী সেখানে নেই।" মার্কিণ সরকারের কাছে আমি দাবী জানিয়েছিলাম যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের ব্যাপারে তাঁরা যেন ভারতবর্ষকে সাহায্য করেন। তার কারণ হিসেবে আমি বলেছিলাম, "অন্যথায় যুদ্ধজয় সত্ত্বেও আমরা হয়তো শান্তির আস্বাদ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবো। শান্তিপ্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা এবং হলেও সে শান্তি মঙ্গলপ্রসূ হবে কিনা সে সম্পর্কে জনসাধারণ যে-আজ সর্ব্বত্র সন্দিহান হয়ে উঠেছে এটাকে আমি আমাদের বিকাশমান সভ্যতার প্রতি কটাক্ষ বলেই মনে করি। মূলগত যে সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে প্রথম মহাসমরের সূত্রপাত হয়েছিল ভার্সাইতে তার সমাধানের জন্য কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। আবার আমরা সেই ধরণের শান্তিপ্রতিষ্ঠা করতে পারি বটে, কিন্তু তার ফলে আবার আমাদের যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে।"

লালফৌজ তখন জার্ম্মানীর হাত থেকে হৃত অঞ্চলের এক পঞ্চমাংশ মাত্র পুনর্দ্দখল করতে সমর্থ হয়েছে। তা সত্ত্বেও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমেই সোভিয়েট-ভীতি বেড়ে উঠছিল। এইসময় নিউ-ইয়র্কের 'পি এম' পত্রিকা আমার কাছ থেকে একটি প্রবন্ধ চান; প্রবন্ধের বিষয় হলো, 'বিজয়ী রুশিয়ার সম্পর্কে কি আমেরিকার আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ আছে?' প্রবন্ধটির প্রস্তাবনা করে ফ্রিডম্

হাউস্-এর সভাপতি হার্ব্বার্ট আগার লিখেছিলেন যে, মার্কিণদের মধ্যে "কেউ কেউ গোপনে রুশিয়ার পরাজয় কামনাও করেন। নিদেনপক্ষে তাঁরা চান যে, রুশ-জার্ম্মান রণাঙ্গণে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হোক্।"

১৯৪২-এর ২৭শে এপ্রিল আমি 'পি এম' পত্রিকায় লিখি, "বিজয়ী রুশিয়া সম্পর্কে আমেরিকার কিসের ভয়? সাম্যবাদী বিপ্লবের? এমন কথা চিন্তা করাও হাস্যকর। আমেরিকার কম্যুনিষ্টরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তারা সকলেরই বিরাগের পাত্র। তারা যখন সাধারণতন্ত্রী স্পেনের সাহায্যার্থে কাজ চালিয়েছে, বা তারা যখন ধনতান্ত্রিক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাব্যবস্থা এবং রুশিয়াকে সাহায্যদানের জন্য কাজ চালায়—একমাত্র তখনই লোকে তাদের কথার কিছুটা দাম দেয়। তাই বলে তারা যদি যুক্তরাষ্ট্র-সরকারের পতন ঘটাতে অগ্রসর হয় তবে সে-ব্যাপারে তারা লোকজনই যোগাড় করে উঠ্‌তে পারবেনা।........ বিপ্লবের ভয় নেই, তা হলে কি আক্রমণের ভয়? যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী রুশিয়া কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বস্‌বে? কথাটা বড় অদ্ভুত শোনায়।........রুশিয়া সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে না পড়ে' আমাদের আজ এই কথাটাই বড় করে দেখানো দরকার যে, হিটলার এবং তাঁর মিত্র জাপানকে পরাজিত করবার পথে এ যাবৎ রুশিয়াকেই সব থেকে বেশী চোট্ সাম্‌লাতে হয়েছে। রুশিয়াকে শক্তিশালী করে তোলাই আজ আমাদের কর্ত্তব্য।"

এই সঙ্গে আমি একটা সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছিলাম; 'পি এম' পত্রিকা সেটুকুকে বর্জ্জন করেন। তার থেকে শুধুমাত্র নিচের অংশটুকু প্রকাশিত হয়, "যুদ্ধশেষে আমাদের এবং রুশিয়ার মনোভাব কী দাঁড়ায় —তার ওপরে অনেক কিছুই নির্ভর করছে।" এর পরের তিনটি বাক্য বর্জ্জন করা হয়। কার্ব্বন, কাগজে আমি তার যে অনুলিপি রেখে দিয়েছিলাম তার থেকে আমি বর্জ্জিত অংশটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি: "যুদ্ধোত্তরকালে রুশিয়ার আচরণে পররাজ্যদখললিপ্সার পরিচয় পেলে

আমরা যতখানি অসন্তুষ্ট হবো, আমরাও যদি তেমনি সাম্রাজ্য বা প্রভুত্ববিস্তার অথবা একচ্ছত্র ইঙ্গ-মার্কিণ প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তা হলে অন্যান্য জাতিও আমাদের উপরে ঠিক ততখানিই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। বৃটিশ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের ঝক্কি নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে যাওয়াটা খুব নিরাপদ নয়, সে পথে আমাদের সমৃদ্ধি নেই; তেমনি রুশিয়াও যদি তার পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলির উপরে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভুত্ববিস্তার করতে যায় তা হলে সেটা তার পক্ষে খুব নিরাপদ হয়ে দাঁড়াবেনা। যতো গণ্ডগোল এবং আশঙ্কা এই পথেই।"

কোন্ উদ্দেশ্যে আমার এই কথাগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া হলো?

মূর্খদের বিশ্বাস, সমস্যাকে চেপে যাওয়া বা তাকে উপেক্ষা করাটাই হলো তার সমাধানের পথ। প্রকৃতপক্ষে রুশিয়ার যুদ্ধোত্তর আচরণ ওয়াশিংটনের বড়কর্ত্তাদের উত্তরোত্তর চিন্তিত করে তুলেছিল। যুক্তরাষ্ট্র সরকার জান্‌তে পেরেছিলেন, পররাষ্ট্র-সচিব ইডেনের সঙ্গে আলোচনাকালে ষ্টালিন তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বাল্‌টিক্ রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং পূর্ব্ব পোল্যাণ্ড দখল করতে ইচ্ছুক। ইংলণ্ডে থাক্‌তে লণ্ডনের মার্কিণ-রাজদূত জন জি উইন্যাণ্টের সঙ্গে কয়েকবার আমার বেশ অন্তরঙ্গ আলাপ আলোচনা হয়। ১৯৪২-এর ২৫শে এপ্রিল নিউ ইয়র্কে তিনি তাঁর 'হোটেল রুজ্‌ভেণ্ট'-এর ঘরে বসে আমাকে এই গোপন-বার্ত্তা জানান যে, কার্জ্জন-লাইন পর্য্যন্ত বিস্তৃত পোল্যাণ্ডের সমস্ত জমিই মস্কো দখল করে নিতে চায়, তবে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় সীমান্তব্যবস্থার এই পরিবর্ত্তনসাধনের ব্যাপারে মার্কিণ-প্রেসিডেণ্ট বাধা দিয়েছেন। তার অর্থ, রুশিয়ার রাজ্যবিস্তারে মার্কিণ-প্রতিরোধ। মিত্রপক্ষীয় যে সমস্ত রাষ্ট্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করে এসেছে, ইতিমধ্যেই তারা যুদ্ধোত্তর সুযোগসুবিধার জন্য চক্রান্ত করতে আরম্ভ করেছিল।

ইংলণ্ডে থাক্‌তে ১৯৪১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের "রয়্যাল ইন্‌স্‌টিট্যুট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স"-এ আমি এক বক্তৃতাপ্রদান করি। সেখানে প্যারীর শান্তি-সম্মেলনের জনৈক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আমাকে বলেন, "যুদ্ধের পর ইংলণ্ড আমেরিকার ছোট-অংশীদার হয়ে দাঁড়াবে।" তিনি আরো বলেছিলেন, "তাতে আমাদের কিছুই মনে করবার নেই।" তাঁর রয়্যাল ইন্‌স্‌টিট্যুটের দু'জন সহযোগীও এ-কথার সমর্থন করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বল্‌লেন, "আমেরিকা এবং রুশিয়ার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করবে বৃটেন।" অপর একজন মতপ্রকাশ করলেন যে, রক্ষণশীল বৃটিশ সরকার জাতীয়তাবাদী রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন; তাতে ইউরোপ দুটি আলাদা এলাকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। ঐতিহাসিক ভদ্রলোক এ-কথায় আপত্তি জানিয়ে বল্‌লেন, "ইউরোপ মহাদেশে রুশিয়ার কাছে যদি আমরা একা পড়ে যাই তবে তা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

এ আলোচনার কথা পরে আমি পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক বিভাগীয়-কর্ত্তাকে জানাই। তাতে তিনি শুধুমাত্র এইকথা বল্‌লেন, "যুদ্ধের পর রুশিয়ার উল্টোদিকে আমেরিকাই ভারসাম্য রক্ষা করবে।" ১৯৪২ সালেও চক্রশক্তি-বিরোধীরা যুদ্ধ জিত্‌তে সুরু করেনি। তবু, আমেরিকার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি এবং রুশিয়ার রাজ্যবিস্তারলিপ্সা দেখে, যুদ্ধোত্তরকালে ত্রিশক্তির মধ্যে কে কার পক্ষাবলম্বন করবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তুমুল জল্পনাকল্পনা সুরু হয়ে গিয়েছিল।

পেঁতার শাসনাধীন ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক নিয়েও ইতিমধ্যে বাদানুবাদ সুরু হয়ে যায়। ওয়াশিংটনে জনৈক পররাষ্ট্র-নীতিবিদ্‌কে আমি বলেছিলাম, "দেশের সার্ব্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে এখন আমি বল্‌তে পারি যে, মার্কিণ যুবকেরা স্বেচ্ছাতেই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। এতে তারা ভালোই করবে। তবে সেখানে পদোন্নতিরও

কোনো ব্যবস্থা নেই, তেমন উদ্দীপনাও নেই। এ যুদ্ধ কেন—তা-ই অনেকে জানেনা। যে ভিসি-সরকার হিট্‌লারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন—তাদেরি সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক; জনসাধারণ এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সভায় সভায় প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে কি জন্যে আমরা যুদ্ধ চালাছি। আজ যদি আমরা ভিসি-সরকারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ফ্রান্স, স্পেন এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে সাফ্ ফ্যাসীবিরোধী নীতি অনুসরণ করে চল্‌তাম তবে তাতে আমাদের আদর্শ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যেতো। জনসাধারণও সেক্ষেত্রে বিশ্বাস করতো যে, রুজ্‌ভেল্ট এবং চার্চিল আটলান্টিক সনদে যা-কিছু বলেছেন তাতে কোনও ফাঁকী নেই।"

সরকার জান্‌তেন যে, ভিসি-সরকারের শাসনাধীন ফ্রান্সের সম্পর্কে তাঁরা যে নীতি অনুসরণ করে চল্‌ছিলেন তা জনমতকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। সরকারী মুখপাত্ররাও স্বীকার করেছিলেন যে, ফরাসী নৌবহরেরও আর জার্ম্মানীর হাতে গিয়ে পড়বার আশঙ্কা নেই। ভিসি-সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার যুক্তি হিসেবে এতদিন তাঁরা এই নৌবহরের কথাই তুলে এসেছেন। ১৯৪২-এর বসন্তকালে প্রেসিডেন্টের ওয়াশিংটনস্থ জনৈক উপদেষ্টা আমাকে বল্‌লেন, "ধরা গেল, আমরা ফরাসী অঞ্চলে আক্রমণ চালাতেই মনস্থ করলাম; (এ ইঙ্গিতটি আমি বুঝে নিলাম) সেই সঙ্গে মনে করুন, আমাদের লোকজন ফরাসী অঞ্চলে খবরাখবর সংগ্রহ করছেন। এক্ষেত্রে আমরা কি তাঁদের সর্ব্বনাশ ঘটাবো?"

পেঁতার সঙ্গে বৃটিশ সরকারের কোনও সম্পর্ক ছিলনা। রাষ্ট্রদূত উইন্যান্ট আমাকে বলেন যে, এরি জন্যে বৃটিশ সরকার আশা করছেন যে, আমরা পেঁতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে চল্‌বো।

পররাষ্ট্রবিভাগ এবং বৈদেশিক দপ্তরগুলির ধারণা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, সে সম্পর্কের উন্নতিসাধন এবং তাদের

সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করাই হলো তাদের "ব্যবসা"। ঠিক এই কথাটাই অনেক সময় আমি তাদের ব্যবহার করতে শুনেছি। এর থেকেই পররাষ্ট্রবিভাগ এবং বৈদেশিক দপ্তরগুলির মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে যাতে ভাঙন না ধরে, তার জন্যে কূটনীতিবিদ্‌রা এই কারণেই এত বেশী তৎপর। তাতে, আদর্শ ক্ষুণ্ণ হলো কিনা, অথবা জনচিত্তে তার প্রতিক্রিয়াই বা কী ঘট্‌লো সে দিকে তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করেননা।

কি উদ্দেশ্যে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি পার্ল হারবারের আঘাত সাম্‌লে উঠে মার্কিণ জনসাধারণের চিন্তাশীল অংশ ১৯৪২ সালে তা ভাবতে স্বরু করেছিলেন। জাপান, জার্ম্মানী এবং ইটালীকে পরাজিত করাই কি সেই উদ্দেশ্য ? অবশ্যই। কিন্তু তাই কি সব ? জয়লাভের পর, তখন ?

মার্কিণ জনমত সম্পর্কে আমার যে ধারণা জন্মেছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম কোর্টের সহকারী বিচারপতি ফেলিক্স ফ্র্যাঙ্কফুর্টারকে আমি তার সারমর্ম্ম জানাই। আমি তাঁকে বল্‌লাম, "দেশ আজ এ যুদ্ধের অর্থ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। আদর্শ শান্তি এবং সাম্রাজ্যবাদ—শেষ পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এ দুয়ের মধ্যে একটি পথ বেছে নিতে হবে। আমরা আজ যে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েছি জাতি যখন তা বুঝতে পারবে তখন তারা নানাস্থানে আক্রমণ চালিয়ে নতুন নতুন জমি দখল করতে চাইতে পারে। আপনি জানেন, 'ইয়াঙ্কী যুগ' এবং রুশিয়ার বর্ত্তমান রাজ্যবিস্তার-নীতির কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। এ উদ্বেগের আংশিক কারণ হলো এই যে, আমরাও হয়তো এই একই নীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত করতে পারি। অন্য যে পথ আমাদের সাম্‌নে 'খোলা রয়েছে তা হলো বিভিন্ন এলাকার উপর প্রভাববিস্তার নীতি, সাম্রাজ্যবাদ এবং চড়া শুল্ক-ব্যবস্থা সম্পর্কে সাফ ফ্যাসীবিরোধী নীতি অনুসরণ করে'

তাকে বাধা প্রদান করা। সেইসঙ্গে আমাদের 'আটলান্টিক সনদ'কে পুরোপুরিভাবে মেনে চল্‌তে হবে। যাঁরা আজ এযুদ্ধের অর্থ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন ফ্যাসীপন্থী ভিসি-সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকায় তাঁরা আজ বিক্ষুব্ধ। একই কারণে তাঁরা আজ ভারতবর্ষ সম্পর্কে এত আগ্রহশীল।" (বিচারপতি ফ্র্যাঙ্কফুর্টার যা বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যাবে না।)

ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর গুরুত্ব তখন খুবই বেশী। জাপানীরা তখন ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়েছে; নাৎসীবাহিনীও তখন তুরস্কের উপর আক্রমণ চালিয়ে মিশর দখল করে নিতে পারে। এশিয়ার কোনও স্থানে, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই, যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে তবেই চক্রশক্তির যুদ্ধজয়ের আশা থাকে। ওদিকে ভারতবর্ষেও তখন তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। প্রাক্তন সহকারী সমর-সচিব কর্ণেল লুই জনসনকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁর ব্যক্তিগত দূত হিসেবে নয়াদিল্লীতে পাঠান। বৃটিশ সরকারও মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য এবং মস্কোর প্রাক্তন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে প্রস্তাবসহ ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলই তা প্রত্যাখ্যান করে। তা হলে এখন কি হবে? জাপান কি এবার ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ চালাবে? হিট্‌লারও কি এবার দুরন্তগতিতে পশ্চিম এশিয়ায় ঢুকে পড়বেন?

২২শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার আমি মিঃ সাম্‌নার ওয়েল্‌স্‌কে জানাই যে, আমি ভারতবর্ষে যেতে ইচ্ছুক। আমার কথা তিনি তাঁর খাতায় টুকে রাখলেন। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে তিনি আমাকে নিউইয়র্কে টেলিফোন করে বল্‌লেন, "রবিবার দিন নিউ ইয়র্ক থেকে একটি বিমান ভারতবর্ষে যাচ্ছে। তিন দিনের মধ্যে যদি আপনি 'টিকে' নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন তা হলে সে-বিমানে আপনার জন্যে একটি আসন রেখে দেওয়া হবে।" আমি বললাম, "চমৎকার।" তারপর

আমি তাঁকে ছাড়পত্রের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি জানালেন যে, সেইদিনের ডাকেই তিনি আমাকে ছাড়পত্র পাঠিয়ে দেবেন। পরের দিন সকালেই তা এসে আমার হাতে পৌঁছুলো। কোনো জিজ্ঞাসাবাদ, দরখাস্ত বা নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যেই আমাকে যেতে হলোনা। কলেরা, টাইফয়েড-প্যারাটাইফয়েড, পীতজ্বর এবং বসন্তের প্রথম দফা টিকে নিয়ে ৫ই মে সোমবার আমি আমার বিমানে উঠ্‌লাম। (সে দিন আমার দুই ছেলেরই জন্মদিন।) সাম্‌নের দিনগুলি বেশ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাট্‌বে বলে ভেবেছিলাম—কিন্তু তা যে এত উত্তেজনাময় হয়ে উঠ্‌বে তা ভাবতে পারিনি।

দক্ষিণ থেকে ভারতে

ক্লিপার সীপ্লেনের পঞ্চাশজন আরোহীর মধ্যে ছিলেন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়াররা, যুদ্ধে আমেরিকান মাইকা প্রয়োজন হওয়ায় তাঁরা ভারতে অধিক মাইকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন, চীনযাত্রী আমেরিকান অফিসাররা যাচ্ছিলেন চীনা বিমানবাহিনী সংগঠনের কাজে, সর্ব্বক্ষণ সিলমোহরকরা ডাকের থলি নিয়ে বসেছিলেন রাষ্ট্রদপ্তরের অফিসাররা, এক আমেরিকান দম্পতি যাচ্ছিলেন বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকায় পীতজ্বর ধ্বংসের কাজে, আর একজন পোল কূটনীতিবিদ মিশর ও রুশিয়া হয়ে যাচ্ছিলেন চীনে।

পরদিন সকালে ক্লিপার সীপ্লেন পোর্টোরিকোর অন্তর্গত সানজুয়ানে এসে অবতরণ করে। আমি ঐ দ্বীপের গভর্ণর রেক্সফোর্ড জি, টাগওয়েলকে ফোন করি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় মস্কোতে। ফোন পেয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। বিদায়ের সময়ের আগে পর্য্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বুদ্ধিজীবি টাগওয়েল মত, দি নেশনের ম্যানেজিং এডিটার আর্নেষ্ট গ্রুয়েনিং এবং দি নিউ রিপাবলিকের অন্যতম সম্পাদক রবার্ট মোরস লভেটকে যথাক্রমে পোর্টোরিকো, আলাস্কা ও ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। এভাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট নিশ্চয়ই হাতে কলমে ছোটখাট একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছিলেন। হয়তো তিনি বলেছিলেন, "অন্যের কাজের সমালোচনা আপনারা করেছেন। এখন আপনারা নিজেই দায়িত্ব নিয়ে দেখুন কেমন মনে হয়।" আমি জানি যে গ্রুয়েনিং-এর সে কাজ খুবই মনোমত হয়েছিল।

সম্পাদনা বা আনুমানিক মতামত দেওয়া ছেড়ে বাস্তব শাসনকার্য্য পরিচালনাতে নামায় গ্রুয়েনিং বা টাগওয়েল রক্ষণশীল হয়ে পড়েন নি। আর, রক্ষণশীলদের অভিযোগের মানদণ্ডে বিচার করলে বলা যায়, লভেটও তা হন নি। প্রকৃতপক্ষে, রাজনীতিক জগতের ভিতরকার দুর্নীতি এবং রাজনীতিক কর্ম্মীদের যেভাবে দুরভিসন্ধিমূলক চাপের খপ্পরে পড়তে হয়, তার সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটায় গভর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা আরও উপলব্ধি করেন।

সুরিনামকে নিয়ে আমরা খেলা করেছি এবং ডাচ উপনিবেশ রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত মার্কিণ সেনাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সুরিনামের অভ্যন্তরে দুর্গম অরণ্য। তা'হলেও বিমান থেকে সুরিনামকে শত শত মাইলব্যাপী সযত্নে রক্ষিত পরিব্যাপ্ত একটা বনানীর মত দেখাচ্ছিল,—এখানে সেখানে নদীর অনুচ্চ তীরে দু একটা কুটীর, আর মাঝে মাঝে অনেকগুলি কুটীরেঘেরা এক একটা লাল টালির বাড়ী ; ও অঞ্চলটা সম্ভবতঃ একটা তালুক। আমদের সঙ্গে একজন ব্রাজিলবাসী ভদ্রলোকও ছিলেন। তিনি মার্কিণ বিমান বাহিনীর অবতরণ ক্ষেত্র তৈরীর উপযোগী স্থানের সন্ধানে গোটা দক্ষিণ আফ্রিকাই চষে বেড়ান। আমাদের ভ্রমণ পথের নিম্নস্থ জল ও স্থলভূমির নাড়ী নক্ষত্রের খবরও তিনি রাখতেন। তিনি বললেন যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ অরণ্য পরিচ্ছন্নই, তবে কিছু ঝোপ ঝাপড়া ও হিংস্র জন্তু আছে ; চিতাবাঘ, পুমাবাঘ, ক্ষুদে বিড়াল, আরমাডিলোস, তাপির, পিঁপড়েখেকো এদের সংখ্যা খুব বেশী নয় ; কিন্তু এ অরণ্যে বন্য পাখী ও ছোট বড় সাপের সংখ্যা অজস্র। এখানকার বানরগুলো অনায়াসেই হাতের তালুতে এসে বসে ; সবচেয়ে বড় বানর বড়জোর দুই ফুট লম্বা।

আমাদের 'ক্লিপার' আর পয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ব্রেজিলের

অন্তর্গত বেলেমে এসে পৌঁছত, কিন্তু তার একটি মোটর বিগড়ে গেল। প্রপেলারটার তিনটি ডানাই অচল দেখে একটু বিব্রত বোধ করলাম, কিন্তু একজন মেকানিক যাত্রী ভরসা দিলেন যে, দুটি মোটরে ভর করেও বন্দরে পৌঁছোন সম্ভব। ক্লীপার অনায়াসেই পারা নদীর তীরে অবতরণ করলে। তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। আমাদের বিমানের সার্চলাইটের রশ্মিতে সেই বৃষ্টিধারা রূপার মত ঝকঝক করছিল। সেই রূপালী আলো লক্ষ্য করে গ্রীষ্মমণ্ডলের সন্ধ্যার ঘনান্ধকারে আমাদের বৈমানিক পথ চিনে নিচ্ছিলেন।

বেলেমে ছিলাম আমরা পাঁচদিন। সেখানে আমাদের মোটর মেরামত হচ্ছিল। পারারাষ্ট্রের রাজধানী বেলেমনগরী বিষুবরেখার একশো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সে মাসেও সেখানে গরম পড়েনি। চাদর আর কম্বলের আড়ালে সুমধুর শীত রাত্রিতে তখন মিষ্টি আরাম।

ভোরের দিকে আবহাওয়া উষ্ণ না হয়ে উঠতেই ক্রমশঃ মেঘ এসে সূর্য্যকে ঢেকে দেয়। প্রায় সারাক্ষণই মৃদুমন্দ বাতাস বয়। অপরাহ্নের প্রথম দিকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমরা যতদিন ওখানে ছিলাম, প্রতিদিনই বৃষ্টি হ'ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন বর্ষকাল কি না? উত্তর পেলাম, "না, সেতো জানুয়ারী থেকে সুরু হয়।" তখন গ্রীষ্মকাল। সামাজোনিয়ায় আসার আগে কল্পনায় যে সকল পোকামাকড়ের সাথে নিয়তই পরিচয় হত আসার পর তাদের চাক্ষুষ দেখতে পেলাম না। বেলেমে আমি মশার বংশও দেখিনি, কোন মশার দংশনও ভোগ করিনি। চিড়িয়াখানায় আমি পিঁপড়েখেকো দেখতে পেলাম! কিন্তু আমেরিকার শহরগুলির চাইতে বেশী পিঁপড়ে বা মাছি সেখানে দেখলাম না। শহরের বিভিন্ন পার্কে এমন কোন আবর্জ্জনারই অস্তিত্ব নেই, যাতে পিঁপেড়ে বা মশামাছি আকৃষ্ট হতে পারে।

আমি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হলাম সে জায়গার প্রাচীন উন্নত

কৃষ্টিময় পরিবেশ দেখে। অজ্ঞতাবশে আমার ধারণা ছিল সেখানে দেখব বাঁশের খুঁটির ওপর খড়ের সব ঘর, গ্রীষ্মমণ্ডলের বসতি সাধারণতঃ যেমন হয় আর ধূয়ার কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠছে! ১৬১৫ সালের বড়দিনের আগের দিন (এটা আমি একটা শহর-পঞ্জিকায় দেখেছিলাম) পর্তুগীজ নাবিক ফ্রানসিসকো ক্যালডিরো ক্যাষ্টিলো ব্রাঙ্কো প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটা ক্যাথিড্রাল, অনেকগুলি পাথুরে গীর্জ্জা, বহু স্কুল ও সরকারী বাড়ী আছে। প্রশস্ত রাজপথগুলি গোল কোবল্-পাথরে বাঁধান, আর ছোট রাস্তাগুলি সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী। ট্রলি ও বাসের বন্দোবস্ত আছে। অধিকাংশ রাজপথের দুধারেই বিরাট বিরাট প্রাচীন গাছ আছে। ঐসব গাছের পাতাগুলি পরস্পর মিশে ছায়া তৈরী করে। এখানকার উদ্ভিদজীবন এত প্রাণবন্ত যে, একেবারে গাছের বাকল থেকেই পাতা জন্মায়।

আমাজোন অঞ্চলে গবেষণার ব্যাপারে হামবোল্ট, এগাসিজ, মার্টিন প্রমুখ বিখ্যাত পর্য্যটকগণ বেলেম অঞ্চলেই প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। নদীর ছয়শো মাইল উজানে অবস্থিত বেলেমই আজ ফোর্ডের রবার আবাদের বন্দর। মার্কিণ ভাইস কন্সালের মতে রবারচাষে নিযুক্ত আমেরিকানরা গহণ অরণ্যের মধ্যে বসেও গৃহের সকল সুখ-সুবিধাই ভোগ করেন।

আমাজোনিয়া রবারের জন্মভূমি। কিন্তু এখানকার অধিবাসীগণ রবারের চাষ উপেক্ষাই করতেন। ব্রাজিলবাসীরা বলেন, একজন "দুঃসাহসী ইংরেজ" রবারবীজ রপ্তানীর বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে ফাঁকি দিয়ে সত্তর হাজার বীজ নিয়ে আমেরিকা থেকে সড়ে পড়েন। সেই বীজগুলি প্রথমে লণ্ডনের কিউ উদ্দ্যানে রোপন করা হয়, তারপর মালয়, সুমাত্রা, জাভা, সিংহল প্রভৃতি স্থানে চারাগাছগুলি রোপিত হয়। এভাবে এক বিরাট শিল্প গড়ে

উঠল। আজ আমেরিকার মূলধনের সাহায্যে ব্রাজিল রবারজগতে একটু স্থান করে নেবার চেষ্টা করছে।

ডাক্তার অরলেণ্ডো লিমা আমার কলেরা ও পারাটাইফয়েডের বাকী টীকা গুলি দিয়ে গেলেন। "এইসব হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরা লোকগুলি কারা?" তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞেস করলেন। ডাক্তারের পরিধানে ছিলো নিখুঁত শাদা কাপড়ে তৈরী স্যুট, আর ছিলো বোতামে-বাঁধা নেকটাই। তাঁর চোখে "উত্তর আমেরিকাবাসীরা" অদ্ভুত, বেলেমে তারা হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরে। ডাক্তারমশায় নিউইয়র্কে এদেরই দেখেছেন জামার হাত গুটিয়ে হাতে করে জ্যাকেট বয়ে নিতে। প্রথমদিন সন্ধ্যায় হোটেলের খাবার-ঘরে জ্যাকেট না নিয়েই আমি ঢুকলাম। প্রধান পরিবেষক সাদা কালা ডোরার টুক্সেডো পোষাকে সজ্জিত ছিল। সার্ট-পরিহিত ক্রেতাদের খাদ্য পরিবেষণ করা হয়না, বিনীতভাবে এই কথা বলে আমাকে সে ফিরে যেতে বললে। লাটিনদের মতই ব্রাজিলবসীদেরও বাইরেকার ঠাটের ওপর খুব নজর।

ডাক্তার লিমা আমাকে বললেন যে, তিনি রিও-ডি-জেনিরোতে ডাক্তারী পড়েছিলেন এবং ১৯০১ সালে জার্ম্মানী থেকে গ্রাজুয়েট উপাধি লাভ করেন। আমি বললাম, "আপনার বয়স তো এত মনে হয় না!"

তিনি বললেন, "আমার বয়স সাতান্ন।" তাঁর মাথায় ঘন কালো চুল। আমি যখন বললাম যে তাঁর মাথায় একটাও পাকা চুল নেই। তিনি তখন গর্ব্ব প্রকাশ করে বললেন, "খুবই স্বাভাবিক। এর কারণ এই যে আমার রং তামাটে। আমার মধ্যে ভারতীয় রক্তও রয়েছে। আমরা রক্তের মিশ্রণ ঘটাই। রক্তের মিশ্রণ ঘটান ভালোই।" রাস্তায় নিগ্রোর শারীরিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্বেতাঙ্গ এবং তামাটে মুখে চৈনিক চোখ প্রায়ই দেখা যায়। কারণ

পর্ত্তুগীজদের সুদূর প্রাচ্যে পর্য্যটন করার যুগেই প্রথম ঔপনিবেশিকগণ ব্রাজিলে আগমন করেন। দীর্ঘকায় বেলেমাইট বা গৌরাঙ্গী রমণী কদাচিৎ দেখা যায়; রমণীরা টুপি ব্যবহার করেন না।

বিষুবরেখার সন্নিহিত বেলেম আমাকে একটিমাত্র কারণেই রুশিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। সে কারণ হল প্রেসিডেণ্ট গেওলিয়ো ভার্গোর ফটোর কুটিলতা। হোয়াইট হাউসে রুজভেল্ট আর স্যার ভার্গো একসাথে ভোজন করছেন—অনেকগুলো ছবির মধ্যে এটি অন্যতম। ওয়াশিংটনের নামজাদা ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে এখানে মর্য্যাদা বাড়ে। লাটিন আমেরিকার ডিক্টেটারগণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ও সমর্থনে প্রায়ই পুষ্ট হয়েছেন। এর ফলে রিও-ডি-জেনিরোর দক্ষিণস্থ অধিবাসীদের মধ্যে উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়নি।

যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধজয়ে সাহায্যকারী দক্ষিণ আমেরিকার ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটারী গভর্ণমেণ্টগুলিকে সাহায্য করেছিল, বিরোধী ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটারী গভর্ণমেণ্টগুলিকে তা' করেনি। এতে করে লাটিন ফ্যাসী-বিরোধীদের এ ধারণা জন্মায়নি যে যুক্তরাষ্ট্র ডিক্টেটারী শাসনপ্রথার বিরোধী।

ক্লিপার বেলেম থেকে নাটাল যাত্রা করল। নাটাল হ'ল ব্রাজিলের নিকটতম আফ্রিকামুখী ভূমি। আর সেখান থেকে অনায়াসে চৌদ্দ ঘণ্টা আটলাণ্টিক-আকাশের বুকে পাড়ি দিয়ে নাইজিরিয়ার লাগোসবন্দরে আমাদের নাবিয়ে দিলে। এই বৃটিশ উপনিবেশের লোকসংখ্যা দু'কোটি দশলক্ষ। আমাদের চিন্তাধারায় এঁদের স্থান কতই না নগণ্য! তাঁরা ভিন্ন ভাষাভাষী তিনটি উপজাতী। কেবলমাত্র উষ্ণ লেমনেডই মেলে বিমান ঘাঁটির নিকটবর্ত্তী এমন একটা ক্যাণ্টিনে উপজাতি তিনটির তিনজন পরিচারক আদিম ইংরাজীতে কথা বলছিলেন। লাগোসে কয়েকটি

ইংরাজী দৈনিক আছে, তার মধ্যে একটি সোস্থালিষ্ট দৈনিক। মিশনারী পরিচালিত একটি স্কুলও আমি দেখে এসেছি। পাঁচছয় বৎসরের চকোলেটবর্ণা বুদ্ধিমতী মেয়ের দল—তাদের মজবুত চুল অগণিত শক্ত বেণীতে পাকান, বেণীগুলি মাথার ওপর থেকে সূর্য্য-রশ্মির মত বিচ্ছুরিত—মাতৃভাষায় "যীশুখৃষ্ট জলের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন" পড়তে শিখছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তারা তবে তাদের চোখে মুখে কেমন যেন একটা বিহ্বলতার ভাব!

লাগোসে মার্কিণ ফেরী কর্তৃপক্ষ আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে ক্যানোর উত্তরে নাবিয়ে দেন—পাঁচশো চল্লিশ মাইল যেতে দু'ঘন্টা সাতমিনিট লাগল। ক্যানো এক মুসলিম রাজ্যের রাজধানী। এখানকার আমির বা রাজা বৃটিশের কাছ থেকে একটা বাৎসরিক ভাতা পান; প্রতিদানে তিনি বৃটিশের মর্জ্জিমত চলেন। তাঁর প্রজাবৃন্দকেও সেভাবে চল্‌তে বাধ্য করেন। অধিবাসীগণ দেখতে আরবদের মত, আমি তাঁদের সাথে প্রাথমিক আরবীতে কিছুক্ষণ কথাবর্ত্তাও বলি। আমরা ক্যানোর বৃটিশ ব্যারাকে ঘুমিয়ে নিয়ে পরদিন ভোর পাঁচটায় মাইদুগুরির অন্তর্গত এক নূতন মার্কিণ বিমান-ঘাঁটি থেকে রওনা হয়ে বেলা সাতটায় সেখানকার আর একটা নূতন মার্কিণ ঘাঁটিতে এসে পৌছলাম। এখানে একটা বালুঝটিকায় আমরা একেবারে আছন্ন হয়ে গেলাম—মানুষ, যন্ত্রপাতি, মাঠ, কুটীর সবকিছুই বালুতে একাকার হয়ে গেল। অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। একজন অফিসার আমাদের জানালেন যে সারাদিন সারারাত আমাদের মাইদুগুরিতেই কাটাতে হবে। আফ্রিকার এই অরণ্যনিবাসে চব্বিশ ঘন্টা কাটাবার সম্ভাবনায় আমি আনন্দিত হতে পারিনি। তবে, মন খারাপ করে আর লাভ হত কি? আমরা একটা কঙ্কালসার বাসে চড়ে বসলাম। সে বাসটা ঘর্ঘর শব্দে একটা গভীর চক্রচিহ্নিত-পথে চল্‌তে

লাগল। যখনই এই প্রবীণ বাসটা কোন গরুর গাড়ীকে পথ করে দেবার জন্যে থামত, তখনই উনিশ কুড়ি বছরের কোন একজন মার্কিণ বৈমানিক—তাঁরা মাত্র তিনমাস হয় কানসাস্, ভার্জিনিয়া বা মিডওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এসেছেন—চীৎকার করে উঠতেন, "এই জার্সি সহর এসে পড়েছে পরের স্টপই হচ্ছে টাইমস স্কোয়ার" বা "ইউনিয়ন স্টেশন, সবাই নেমে পড়ুন।" তাঁরা স্বীকার করলেন যে গৃহে ফিরে যাবার জন্যে তাঁরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

মাথায় বড়ো বড়ো খড়ের টুপী দিয়ে নগ্নপ্রায় নিগ্রো স্ত্রীপুরুষরা প্রখর রৌদ্রের মধ্যে তুলাক্ষেত্রে কাজ করছিলো। সবকিছুই অতি সাধারণ শ্রেণীর ও আদিম বলে মনে হচ্ছিল। বিমানটি আমাদের সেই সুদূর অতীতের নোহের যুগে নিয়ে গেল।

ফেরী কর্ত্তৃপক্ষের অতিথি হিসেবে আমাদের স্থান হল তাঁবুতে। এই তাঁবু হল বড়ো বড়ো কতগুলি কাঠের কুটীরের সমষ্টি, কুটীরগুলির প্রত্যেক জানালায় একটি করে পর্দ্দা, দরজায় ডবল পর্দ্দা। প্রত্যেকেরই একটি করে বিছানা ও মশারি সঙ্গে ছিল। প্রত্যেক কুটীরেই ছিল উষ্ণ ও শীতল জলের ফোয়ারা, বড়ো বড়ো মার্কিণ সাবানের আধুনিক প্রসাধন দ্রব্য, ইলেক্‌ট্রিক ক্ষুরের প্লাগ, ইলেক্‌ট্রিক লাইট আর ছিল একটা রেফ্রিজারেটার—কয়েকটা তামাটে রংএর হিম-শীতল সিদ্ধজলের বোতলে ভরা। একজন নিগ্রো পরিচারক অনবরত শূন্য বোতলগুলি পূর্ণ করে দিচ্ছিলো।

একটা পেটা-ঘড়ির শব্দ শুনে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসলাম। আমরা কুটীর ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই জনকয়েক ছোকরা এসে বাতাসে ও আনাচে কানাচে সর্ব্বত্রই মশা মাছির উদ্দেশ্যে ফ্লিট ছুঁড়তে থাকে। মেসের কুটীর অন্ধকার ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ইলেকট্রিক পাখা ঘুরতে লাগল। মাছির বংশও সেখানে ছিলনা। সদ্য অরণ্যবাস

থেকে আগত স্থানীয় পরিচারকগণ সাদা স্যুট ও সাদা তুলার গ্লোভ পরে খালি পায়ে নিঃশব্দে ঘুরে ঘুরে সবাইকে টাইপকরা মেনু দিয়ে যাচ্ছিল।

পরদিন ভোরে ঐ মেসে নূতন সাদা কাপড় ও গামছা দেওয়া হল। একজন আমেরিকান নিগ্রো পরিচারক এসে শুধালে, "কর্ণফ্লেক দেব না ওট্‌মিল?" দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আমাকে দেওয়া হল ডিম, তারপর মাখন সহযোগে কেক এবং সিরাপ, শেষে চিনি ও ক্রীমসহ অতি চমৎকার কফি। ভেবে দেখুন, এসব জিনিস পাচ্ছিলাম মাইদুগুরিতে একেবারে মহাশূন্যের অন্তরতম স্থানে। যুদ্ধজয়ের কাজে মর্কিণ যুবকদের যেমন গৃহ ত্যাগ করে দূর বিদেশে কাল কাটাতে হচ্ছিল উদ্বিগ্ন মার্কিণ সরকারও তেমনি দেশ থেকে জিনিসপত্র এনে আফ্রিকার গহণ বনে তাঁদের জন্যে গৃহের সুখভোগের যথাসম্ভব ব্যবস্থাই করেছিলেন। নাইজিরিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক নূতন মার্কিণ ফেরী কর্ত্তৃপক্ষের তাঁবুতেই একই রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দক্ষিণ ইউরোপ, ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকার উপকূলের কোন কোন অংশে জার্ম্মানী ও ইটালী কায়েম হয়ে বসেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয় ও ব্রহ্মদেশ জাপানের কর্ত্তৃত্বাধীনে গিয়ে পড়েছে—এ অবস্থায় আমরা আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে মিশর তুরস্ক, রাশিয়া, ইরাণ, ভারত ও চীনদেশে যাবার একমাত্র নিরাপদ বিমানপথেই ভ্রমণ করছিলাম।

এই পথে ভ্রমণরত বিমানগুলি স্থলবাহিনীর যান হিসেবেই কাজ করছিল, সুখ সুবিধার কোন ব্যবস্থাই তাতে ছিল না। যাত্রীরা অগভীর এলুমিনিয়াম পাত্রে বসে বিমানের কম্পমান পিঠে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এভাবে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিমানের মেঝে বা বন্দুক ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামের আধারগুলিতেও বসা যেত।

বালুকাময় পতিতভূমি ও প্রস্তরময় শৈলমালায় পূর্ণ মরুভূমির ওপর দিয়ে আমরা মাইদুগুরি থেকে বিষুবরেখা অঞ্চলের ফরাসী আফ্রিকার অন্তর্গত 'চাঁদহ্রদে' এবং সেখান থেকে সুদানের অন্তর্গত খার্তুমে গিয়ে পেঁীছলাম। বিমানের চাকা ঘোরাতে প্রয়োজন হয় এমন সব ছোট ছোট রবারের টায়ারের আবরণে বিমানটি ভর্ত্তি ছিল। এই টায়ারগুলি হ'ল রুশিয়ার ঋণ ইজারার মাল। কতকগুলি বাক্স ফেটে যাওয়ায় আমাদের কয়েকজন লম্ফমান বিমানের মেঝেয় টায়ারের ওপর বসবার বিলাসিতা ভোগ করে নেন। আমি বসে বসে ভারত সম্বন্ধে লেখা সুষ্টার ও উইণ্টের একটা বই পড়ছিলাম।

টেক্সাসের অন্তর্গত সান এনজেলোর টি, এফ, কলিন্স্ (টেক্সানরা সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে ছিলেন) ও পেনিসিলভেনিয়ার ছোট রেমণ্ড ওয়াইজ পরিচালিত এক বিমানে আমি খার্টুম থেকে কায়রোতে উপনীত হলাম। তাঁরা আমাদের জানালেন যে বিমানটি কোথাও না থেমে সোজা নয়শো মাইল দূরে কায়রোতে গিয়ে নামবে। একথা শুনে আমরা খুশীই হলাম; কারণ কোথাও থামার অর্থই হল দুঃসহ গরমের দুর্ভোগ সহ্য করা আর গন্তব্যস্থানে পেঁীছুতে দেরী হওয়া। কিন্তু যাত্রার ঠিক আগেই ওয়াইজ বল্লেন, "কায়রোর প্রায় মধ্যপথে ওয়াডি-হালফায় আমাদের একবার থামতে হবে। সেখানকার হাঁসপাতালে আমাদের একজন পরিচিত লোক আছেন, তাঁর হাত শূন্য বলে আমরা তাঁর জন্যে একশো পঞ্চাশ ডলার নিয়ে এসেছি।" ওয়াডি-হালফা মরুভূমির মধ্যস্থিত খেজুর গাছের ক্ষুদ্র একটা ঝাড়—তার মধ্যে কতকগুলি কুটীর—দেশ থেকে এগারো হাজার মাইল দূরে সেখানকার একমাত্র মার্কিণ বাসিন্দা হলেন আমার অপরিচিত এই ভদ্রলোক। আমরা তাঁর পড়ার জন্যে কতকগুলি সাময়িক পত্রের বাণ্ডিলও তৈরী করে ফেললাম।

কায়রোর সভ্যতা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। কিন্তু এবার

ভ্রমণকালে কায়রোর সভ্যতা বলতে আমরা বুঝলাম চমৎকার সব হোটেলের ঘর, শীতল পানীয়, স্নানের টাব, চমৎকার খাদ্য আর ট্যাক্সি, বিদেশস্থ সংবাদদাতা ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল। আলেকজাণ্ডার কার্কের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় রোমে, তারপর মস্কোতে। তিনি তখন যুক্তরাষ্ট্রের মিশরস্থ রাষ্ট্রদুতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। নাৎসী সেনাপতি রোমেলের হাতে তখন কায়রো বিপন্ন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সাহসী হলেও শক্তিহীন। কার্কের একটা বক্তব্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ইটালী আক্রমণ করতেই হবে—তাহলেই কেবল মিশর ও সুয়েজখাল রক্ষা পাবে। কার্ক সাতিশয় বিত্তশালী লোক। তাঁর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই তাঁকে তাঁরা অভিজাত মার্কিণ কূটনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিভাগের "গ্রোটন হার্ভার্ড" দলের একজন বলেই মনে করেন। তিনি প্রচুর পান ভোজন দ্বারাই আপ্যায়িত করতে খুব ভালবাসেন কিন্তু তিনি তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। আর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁর দৃষ্টিও প্রখর। তাঁকে দাম্ভিক মনে হতে পারে এবং মাঝে মাঝে তাঁর ভাব-ভঙ্গিমাও ওধরণেরই হয়, আসলে তিনি নির্লিপ্ত নন। তিনি যেসব নীতিতে বিশ্বাসী, সেগুলির জন্যে সংগ্রামও করেন। রুমানিয়ার তৈলখনি অঞ্চলে বোমা বর্ষণ করার জন্যে তিনি ক্রমাগত জোর দিতে থাকেন।

বিখ্যাত সেফার্ডস হোটেলে এসে পুরানো বন্ধু মরিস হিন্দাসের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিনি বিমানযোগে সদ্য মস্কো থেকে ফিরছিলেন। কর্ম্মব্যপদেশে বহুদিন নিকট প্রাচ্যে কাটাবার ফলে সে অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল ঢের। তারপর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক বিশেষ দূত হিসেবে ভারতে প্রেরিত কর্ণেল লুই জনসনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইণ্ডিয়ানপলিসের শিল্পপতি কর্ণেল আর্থার ডব্লিউ হ্যারিংটন। হ্যারিংটনের সাহায্যে জনসন ভারতের অবস্থা অনুধাবন করছিলেন এবং ১৯৪২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসের মিশন বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন। জনসন্ সহকারী সমর-সচিব থাকাকালে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম—তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত। আমাকে সাহায্য করতে নির্দ্দেশ দিয়ে রাষ্ট্রবিভাগ তাঁকে এক পত্র দেন। সে পত্রখানাও আমার সঙ্গেই ছিল। তাঁর সাহায্যে ভারতবর্ষের সহিত সংযোগ ও তার সংবাদ লাভের আশায় আমি উন্মুখ ছিলাম। কিন্তু ভারতের জলবায়ুতে গুরুতর পীড়িত হয়ে আরোগ্য লাভের আশায় তিনি তখন দেশের মুখে ছুটছিলেন। তিনি আমাকে বল্লেন যে, ভারতে থাকার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি সেখানকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা জওহরলাল নেহেরুর সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনা সহকারেই কথাবার্ত্তা বললেন।

পূর্ব্বাভিমুখী বিমানের প্রতীক্ষায় কায়রোতে চারদিন অপেক্ষা করলাম, আমি একজন মার্কিণ সাংবাদিকের সঙ্গে হোটেলের বারান্দায় বসে থাকতাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, "ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে কি ঘটেছিল জানেন কি ?" আমি নেতিবাচক উত্তর দিলে তিনি রহস্যময় ভাবে ফিসফিস করে একটা গোপনীয় কথা যেন বললেন। আলেকজাণ্ডার কার্ক বললেন যে ফেব্রুয়ারী মাসে কায়রোতে যা ঘটেছিল তা আমার ভাল করে অবশ্যই অনুধাবন করা উচিত। আমি প্রশ্ন করলাম, "ব্যাপারটা কি বলুন তো ?" সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন। এইভাবে আমি সে সব টুকরো টুকরো কথা সংগ্রহ করলাম। পরে তা-ই একটা কাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। কায়রো থেকে তারযোগে কারুর পক্ষে তা জানান সম্ভব ছিলনা, কারণ কঠোর ব্রিটিশ সেনার কর্ত্তৃপক্ষ এ কাহিনীর গোপনতা রক্ষার জন্য আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার কোন ইচ্ছা আমার

ছিলনা। কিন্তু কৌতূহল বশতঃ ব্যাপারটা জানবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে পড়লাম। এজন্যে আমি বৃটিশ রাজদূত স্যার মাইলস্ লাম্পসনের সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করলাম। মোটাসোটা আমুদে স্বভাবের লোক ইনি। একটার পর একটা অনেক বিষয়ই আমরা ভাসা ভাসা আলোচনা করলাম, কিন্তু কোনটাই এঁটেসেটে ধরলাম না। শেষ পর্য্যন্ত আমি বললাম, "ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্বন্ধে আমরা এতটা জানি যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে সব কিছুই আমরা ভুল বলব না, তবে আমার খবরাখবরের কিয়দংশ অপর্য্যাপ্ত বা ভুল হয়ত হবে।"

আমি ঠিক কি ধরণের সংবাদ পেয়েছিলাম, তিনি তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে তা বলার পর তিনি মন্তব্য করলেন। তিনি বলতে লাগলেন: ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিশরের রাজা ফারুক এবং বৃটিশ সরকারের গুরুতর অবনতি ঘটে। রাজা আদৌ বৃটিশ ঘেঁসা ছিলেন না। যুদ্ধেরও তিনি মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। অক্ষশক্তির জন্যে কিছুটা সহানুভূতি থাকা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিলনা। জার্ম্মানী দূরে থাক, ইটালীর প্রতিও যে তাঁর বিশেষ কোন প্রীতি ছিল তা নয়, তবে তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে বৃটিশের পরাজয়ে তাঁর পূর্ণতর স্বাধীনতালাভের সুযোগ ঘটবে। গোল বাঁধল তখনই যখন ভিসি সরকারের মন্ত্রী বৃটিশ সমরসজ্জা বিষয়ে গোপনে পেঁত্যা কর্তৃপক্ষকে সংবাদ প্রেরণ করছেন বলে সন্দেহ করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ দাবী করে বসলেন যে ভিসি মন্ত্রীকে সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হোক। রাজা ফারুক ভিসির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদন করতে অস্বীকার করেন। সুতরাং স্যার মাইলস্ ও লেফটেনান্ট জেনারেল রবার্ট জি টোন রাজা ফারুকের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ফেব্রুয়ারী মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে বৃটিশ ট্যাঙ্ক ও সেনাদল রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে, তারপর ল্যাম্পসন ও ষ্টোন

রাজার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন। আলাপ আলোচনায় শিষ্টাচার ও বিনয়ের অভাব ছিলনা। ইংরাজদ্বয় বিনীতভাবে জানালেন যে বিমানঘাঁটিতে মহামান্য রাজার জন্যে বিমান প্রস্তুত আছে, এবং সেই বিমানে আরোহণ করে দূরবর্ত্তী যে কোনও স্থানে নেমে তিনি বহুদিন কাটাতেও পারেন—তবে তিনি যদি ভিসির ব্যক্তিটির সম্বন্ধে বিশেষ একটা আদেশ জারী করা সঙ্গত মনে করেন ও তাঁর প্রধান মন্ত্রী পরিবর্ত্তন করেন, তাহলে আর তা প্রয়োজন হবে না। রাজা ফারুক ইংরাজদের কথা রাখা সঙ্গতই মনে করলেন।

নাৎসীরা কায়রোতে বোমাবর্ষণ করেনি। মিশরবাসীদের জীবনে কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয়নি। তারা যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকে যুদ্ধের কারবারে লাভ গুণতে থাকে।

২১শে মে আমি কায়রো ত্যাগ করি। আমাদের বিমান বহুদেশ অতিক্রম করে চলল সুয়েজ, দক্ষিণ পালেস্টাইন, মরুঅঞ্চলের রাফা (সেখানে ১৯১৯ সালে কয়েকমাস আমি বৃটিশ সৈনিকরূপে কাজ করেছি), গাজা—যুদ্ধের ফলে গাজা আজ আরও বিস্তৃত সবুজ সাগরের তীরবর্ত্তী শেতাঙ্গ-অধ্যুষিত ইহুদী নগরী, তেল আভিভ, জুডার তৃণগুল্মহীন পর্ব্বতমালা, সর্পিল জর্ডন, এবং শেষে অনুর্ব্বর তামাটে মরুভূমির ওপর দিয়ে বাগদাদের নিকটবর্ত্তী হ্যাবানিয়া হ্রদের উপকূলে এসে আমাদের বিমান অবতরণ করলে। সময় লাগল সাড়ে চার ঘণ্টা। ১৯৪১ সালে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধচালনা-কালে রসিদ আলীর বিদ্রোহী সেনাদল বিমান ঘাঁটির নিকটস্থ যে পাহাড়ে পরিখা খনন করে ঘাঁটি প্রস্তুত করেছিল ইরাকী সৈন্যরা আমাদের তা দেখিয়ে দিলেন।

মেসের কুটীরে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিয়ে আমরা দুঘণ্টার মধ্যেই বিমানযোগে বসরা পৌঁছলাম। এখানে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের সম্মিলিত ধারা সাত-অ্যল-আরব নাম ধারণ করে হোটেলের বহিস্থ উদ্যানের কোল ঘেঁসে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। হোটেলটিতে

তাপনিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক পাখা চলছে অবিরাম। আমার কিছুই গায়ে দিয়ে শুতে হলনা, সারারাতই ঘুমুতে পারলাম নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নে। বসরার তুলনায় আফ্রিকা ঠাণ্ডা বেশী।

বসরার নিকটে রুশদের একটা ঋণ ইজারার বিমানঘাঁটি ছিল। সেখানে অবতরণ করে সোভিয়েটের জন্য নির্দ্দিষ্ট রবারের টায়ারগুলো নাবিয়ে দিলাম। তারপর অমরা পুনরায় রওনা হয়ে আরবের অন্তর্গত স্বাধীন ওমান রাজ্যে অবস্থিত সারজাতে গিয়ে পৌঁছলাম। সারজায় বৃটিশ ইষ্টার্ণ এয়ারওয়েজের একটা হোটেলে রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে সাতশচাল্লিশ মাইল—বেশীর ভাগ সাগরের ওপর দিয়ে—ছয় ঘণ্টায় পার হয়ে ভারতের পূর্ব্বদ্বার করাচীতে এসে পৌঁছলাম। আমরা একমাত্র আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত একটা সামরিক বিমানঘাঁটিতে এসে নাবলাম। যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন বৃহৎ সামরিক বিমানঘাঁটির সঙ্গেই এ বিমানঘাঁটির তুলনা চলে। আমেরিকানদের ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। একজনও আমার ছাড়পত্র বা কোন কাগজপত্র দেখতে চাইলেন না। বিমানঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্ণেল ম্যাসনকে জিজ্ঞেস করলাম, "নয়াদিল্লীগামী বিমানের ব্যবস্থা কতক্ষণে করতে পারবেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই পাবেন।" আমি ক্যান্টিন থেকে স্যাঁতসেঁতে বিস্কুটের একটা বাক্স কিনে এরোপ্লেনে উঠে বসলাম। মে মাসের ২৩ তারিখ সন্ধ্যার দিকে আমি আমার গন্তব্যস্থান ভারতের রাজধানী দিল্লীতে এসে পৌঁছলাম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন

হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় মহারাজার জাঁকজমক আর কিষাণের কুটিরের মালিন্য এ দুই-ই পূর্ব্বদেশের রূপ। এই পূর্ব্বদেশই ব্যাঘ্র-শীকারের লীলাভূমি, রুটি-সংগ্রহের সংগ্রামক্ষেত্র। এই দেশেই বস্ত্রের বর্ণবৈচিত্র্য ও জীবনের বর্ণহীনতার অস্তিত্ব পাশাপাশি। এ-দেশ একদিকে রহস্য ও রোমান্সে ভরপুর, আর অন্যদিকে অনাহার, দারিদ্র্য ও অকালমৃত্যুর লীলাভূমি। পূর্ব্বদেশ হচ্ছে প্রকৃতির মায়াময় সৌন্দর্য্যের নিকেতন। আর এই পূর্ব্বদেশই কুৎসিত জীবনের প্রতিকৃতি।

পশ্চিম প্রাণ-চঞ্চল। পূর্ব্বদেশ জীবনের তাৎপর্য্য সন্ধান করে চলেছে। পশ্চিম উদ্দামগতি, পূর্ব্ব ধৈর্য্যশীল। পশ্চিম নূতনের পিয়াসী—পুরাতন তার কাছে একটা আভরণ মাত্র। পূর্ব্বদেশ অতীতকে নিয়ে বাঁচতে চায়। পশ্চিম পড়ে বেশী, ভাবে কম। পূর্ব্বদেশ পড়ে কম, মনে করে তপশ্চর্য্যাই আদর্শ বস্তু।

পশ্চিমদেশে ছন্দ আছে একমাত্র যন্ত্রেরই। পূর্ব্বদেশে মানুষই জীবনের ছন্দ। পশ্চিম ধন-দৌলত, শক্তি-সামর্থ্য, ও সৌন্দর্য্যের সন্ধানী আর পূর্ব্বদেশ এ-সবের শক্তি মেনে নেয়, কিন্তু শ্রদ্ধা জানায় বিনয়, সরলতা, নম্রতা ও স্বার্থত্যাগকে।

পূর্ব্ব আর পশ্চিম পৃথক। কিন্তু পার্থক্য স্থানের না কালের? এতে করে কি এই বুঝায় যে এশিয়া আর ইউরোপ মূলতঃই পৃথক, না একথাই বুঝায় যে এশিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই পড়ে আছে, বিংশ শতাব্দীতে পা দেয়নি? চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইউরোপ ছিল এশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থায়, বর্ত্তমান ইউরোপের অবস্থায় ছিল না।

এশিয়া পশ্চিম দেশের শত শত বৎসর পূর্ব্বে অবস্থিত।

বর্ত্তমানের মধ্যে বাঁচতে সুরু করাই এশিয়ার সমস্যা।

ভারতের সমস্যা হ'ল বিংশ শতাব্দীতে উপনীত হওয়া।

ভারতের সংঘর্ষ পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে নয়। তার সংঘর্ষ হল সপ্তদশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যে।

আমি ১৯৪২ সালের মে মাসে নিউইয়র্ক ত্যাগ করে ১৯৪৬-এর গ্রীষ্ম অনুভব করলাম। সে যাই হোক, তিন মাইল ট্যাক্সি-ভ্রমণ বা তিন মিনিটের হাঁটা আমাকে তিন শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে গেল—বৃটেনে তৈরী এক পৃথিবীতে। পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও বৃটিশ ভারতে পশ্চিমী ভাবধারা আমদানী করেছিল। পশ্চিমী প্রভাব ভারতের সাথে অচ্ছেদ্য হয়ে রইল। কিন্তু বৃটিশ কোনদিন ভারতের অঙ্গাঙ্গী হয়ে পড়েনি; তাঁরা ভারতে বাস করেন, কিন্তু ভারতের কেউ নন। ভারত বৃটিশের দান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাকে গ্রহণ করেনি। বৃটিশও ভারতকে কখনও আপনার বলে গ্রহণ করেনি। "পূর্ব্ব আর পশ্চিম স্বতন্ত্র, এ দুইয়ের মিলন অসম্ভব," রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর এ-কথার অর্থ হল এই যে ইংরাজ ও ভারতীয়দের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা চলতে পারে না। কারণ প্রভুভৃত্যের মধ্যে মেলামেশা সম্ভব নয়।

ভারতের দ্বার করাচীতে পৌঁছে সেখানকার মার্কিণ বিমানঘাঁটিতে কোন ভারতীয় বা ইংরাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। নয়াদিল্লীর রাস্তায় এবং ইম্‌পিরিয়েল হোটেলে কয়েকজন ভারতীয়কে দেখতে পেলাম। কিন্তু নয়াদিল্লী হল সরকারী আমলাদের প্রয়োজনে তৈরী ভারতীয় পটভূমিকায় এক বৃটিশ নগরী। ভারতে পৌঁছবার প্রথম দিনে ভারতবর্ষ না দেখে শয্যা গ্রহণ করা আমার মনঃপুত হল না। তাই ভারতীয় নগরী পুরাতন দিল্লী দেখবার ইচ্ছায় আমি হোটেলের কেশিয়ারকে কয়েকটা ডলার ভাঙ্গিয়ে কিছু টাকা দিতে বলি। কয়েক

ঘণ্টা পর জবাব পেলাম যে এ বিষয়ে তাঁকে ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হবে। ম্যানেজার হলেন একজন ইংরাজ। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বল্লেন, "আপনার রাত করে দিল্লী না যাওয়াই ভাল। আপনি হয়ত বের হওয়া মাত্রই গুপ্তঘাতকের হাতে ছুরিকাহত হবেন।" সে যাই হোক, তিনি আমাকে চল্লিশটি টাকা দিলেন এবং আমি মোটরে করে পুরাতন দিল্লীর দিকে ছুটলাম। দেখলাম, পথের উপর ঘুমিয়ে আছে গরু ও বলদ, ঘুমিয়ে আছে ফুটপাথের ওপর অর্দ্ধোলঙ্গ ভগ্নস্বাস্থ্য মানুষের দল। স্থানীয় একটা নাচের আসরে অনেকগুলি কাপড় চোপড় পরে একটি মেয়ে গলা থেকে কোমড় পর্য্যন্ত সমস্তটা দেহ আন্দোলিত করে নাচ্‌ছিল—আমি একা বসে বসে তাই দেখলাম, তারপর অক্ষত দেহে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরলাম। উত্তাপ, আবর্জ্জনা, ধূলা ও আদিমতা— এই হল আমার মনে প্রথম ছাপ।

বিদেশের জনসাধারণের জন্যে গভীর মমতা জান্মান অসম্ভব নয়। স্পেন, ইংলণ্ড ও সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের জন্যে আমি সেরূপ মমতা অনুভব করেছি, ফ্রান্স ও ইটালীর মত সৌন্দর্য্যের জন্যেও বিদেশকে ভালবাসা যায়। কিন্তু ভারতের জনগণ বা আমি যে সব স্থান দেখেছিলাম সে সব স্থানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা ভারতের জাতীয় কৃষ্টি কোনটাই আমাকে আকৃষ্ট করেনি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমার স্মৃতিতে যা ছিলো, তা হলো সেখানকার কয়েকজন ব্যক্তি, যাঁদের সঙ্গেএকদা আমার পরিচয় হয়েছিলো, আর সে-সমস্ত সমস্যা যাদের অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। সেসব লোকই ঐসব সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। ভারতবর্ষে আলোচনার মাত্র একটা বিষয়ই আছেঃ ভারতবর্ষ। প্রায়ই আমেরিকা, রুশিয়া কিংবা যুদ্ধের দিকে আমি আলোচনার মোড় ফেরাতে চৈষ্টা করতাম। কিন্তু বৃথাই। ভারতের সমস্যাগুলি এতই জরুরী ও বেদনাদায়ক যে সেসব সর্ব্বক্ষণই মন অধিকার করে থাকে। ভারত রোগশয্যায় শায়িত

এবং রোগক্লিষ্ট দুর্ব্বল হৃদ্‌পিণ্ডের মত তার অবস্থা। নীরোগ না হওয়া পর্য্যন্ত তার কথা ভোলা অসম্ভব।

ভারত দুটি ভাগে বিভক্ত। একদিকে কোটি কোটি বহুজাতীয় হীনবীর্য্য জনগণ শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এতই পিষ্ট যে তাঁরা দুঃখ-দুর্দ্দশা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারছে না, আর একদিকে কয়েক লক্ষ উচ্চস্তরের মানুষ—তাঁরা জাতিগত দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং পরাধীনতাজনিত সদাজাগ্রত হীনমন্যতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অস্থির ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ভারতের অতীত দুর্য্যোগময়। এহেন অনগ্রসর দেশে সার্থকতার পথে কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে তা বজায় রাখতে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই সম্পদ, শক্তি ও ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতাও অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিযোগিদের মধ্যে তীব্র উত্তম ও আবেগ দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, তাঁদের ধারণা, ছুটে চললেই বুঝি সময়ের ক্ষতিটুকু পূরণ করা যাবে। ব্যর্থতার ভয় তাঁদের মনে উদ্দাম আবেগ ও গভীর তিক্ততা সৃষ্টি করে। ব্যর্থতার ফলে তাঁরা এমনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠেন যে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতিও তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেন না, তবু, এই সব লোকই শ্লথচিত্ত হয়ে উঠতে পারেন। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন বলে মনে হয়—ঘনিষ্ঠ আলোচনায় তাঁরা এতই মনখোলা যে মুগ্ধ হতে হয়।

দরিদ্র আদর্শবাদী ছাত্র, কোটিপতি, উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্ম্মচারী এবং কঠোর পরিশ্রমী বণিক—প্রত্যেকের মুখেই আমি "নৈরাশ্যের" কথা শুনলাম,—তাঁদের মুখে যে ধরণের "নৈরাশ্যের" কথা শুনলাম, তা নাকি বৃটিশ রাজত্বের ফল। কিন্তু আমি দেখলাম, চলার পথে যে অনিবার্য্য বাধার সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে দায়ী জাতিভেদ প্রথা, এবং অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার অভাব। বাস্তবিকই ভারতবাসীরা নৈরাশ্যের কবলে পড়ে আছে এবং তাঁদের মধ্যে যে সম্মিলিত ব্যবহার

তাও যেন অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে কি একটা রোগের বীজাণু জন্মলাভ করেছে, যার জন্য প্রয়োজন একজন চিকিৎসকের।

গান্ধীজীকে লোকে আধা দেবতা বলে মানে এবং তিনি একজন ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞ—তাঁর অনুগামীদের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে এসব কারণ দর্শান হয়। তিনি একজন সন্ন্যাসী না রাজনৈতিক নেতা তা নিয়ে বিতর্ক চলে। সবচেয়ে বড়কথা, তিনি ভারতের চিকিৎসক। নয়াদিল্লীতে পৌঁছবার পরদিন আমি জওহরলাল নেহেরুর সাথে এ সম্বন্ধে আলোচনা করি। তিনিও একথার ওপরেই জোর দেন। জওহরলাল ভারতের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করেছেন। নেহেরু-গান্ধীর বন্ধনের এও একটা যোগসূত্র। কারণ, এ মানুষ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, পূর্ব্বদেশে পশ্চিমের সক্রিয় একটি অংশ হচ্ছেন নেহেরু। ১৯৪১ সালে তাঁর বয়স ছিল বাহান্ন। এই সময়ের প্রায় দশবৎসর তাঁর কেটেছে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে। তাঁর জীবনের একটা অংশ কেটেছিল হ্যারো ও কেমব্রিজে। ব্রিটিশ কারাগার ও বিদ্যালয়ের ছাপ নেহেরুর মধ্যে সুস্পষ্ট, দেশ যন্ত্রপাতিহীন অবস্থায় অনগ্রসর হয়ে পড়ে আছে বলে নেহেরুর অসীম ক্ষোভ। আর গান্ধীর এতেই আনন্দ।

পোষাক পরিচ্ছদ, ভোজন এবং যেসব ধর্মীয় প্রসঙ্গের তিনি উল্লেখ করেন, সব দিক থেকেই গান্ধী প্রাচীন ভারতের প্রতিনিধি। কিন্তু নেহেরু প্রাচীন ভারতের ততটুকুই মেনে নেন, যতটুকু মেনে নিলে তার পরিবর্ত্তন ঘটান সম্ভব হতে পারে।

আমি নেহেরুকে জেনেভা, প্যারিস ও লণ্ডনে ইউরোপীয় পোষাকে দেখেছি। এখানে আমি দেখলাম তিনি পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত লম্বা আঁটসাট সাদা সুতির পায়জামা পরা। পরেছেন আজানুলম্বিত সাদা একটা সার্ট, আর একটা বদরীফল-রঙা ওয়েষ্ট

কোট। তাঁর পাদুটি ছিল অনাবৃত। তবে, আমাদের সোফার পাশে কালো চামড়ার একজোড়া জুতো রাখা ছিল। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলেন। এঁর গৃহেই তিনি বাস করছিলেন। তিনি এক আই, সি, এস-এর স্ত্রী, পরেছিলেন একটি শাড়ী, তাঁর কপালে জ্বলজ্বল করছিল একটা লাল রঙএর ফোঁটা—তিনি বিধবা নন এইটেই এই ফোঁটার তাৎপর্য্য। তিনি আমাদের কমলালেবুর সিরাপ খেতে দিলেন। টেরেসের বাহিরের দেয়ালস্বরূপ পুরু একটা খড়ের পর্দ্দার ওপর কিছুক্ষণ পর পর ঝলকে ঝলকে জল নিক্ষেপ করার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শুকনো বাতাস খড়ের ভেতর দিয়ে আসার সময় শীতল হয়ে ঘরে ঢুকছিল—আর বাইরের বাতাসে-ভরা ধূলোও এতে ভেতরে ঢুকতে পারছিল না। ঘরটি ছিল নীচু, তবে ঘরটি ছিল মোটামুটি ইউরোপীয় ধরণে তৈরী, আসবাবপত্রও ছিল ইউরোপীয় ধরণের। একমাত্র ব্যতিক্রম হল এর আশ্চর্য্য ধরণের প্রাচ্য দেশীয় চিত্রসজ্জা।

লম্বা একটা হোল্ডারে নেহেরু অসংখ্য সিগ্রেট নিঃশেষ করে চলছিলেন। বারবার তিনি স্মিতভাবে হাসছিলেন—হাসবার সময় তাঁর শুভ্র দাঁতের পাঁতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। তাঁর গায়ের রঙ হচ্ছে কটাবাদামী রংএর। যদিও তাঁর মাথায় টাক এবং কানদুটি লোমযুক্ত, তবুও তাঁকে অত্যন্ত সুপুরুষই বলতে হবে।

এক প্রশ্নোত্তরে নেহেরু বললেন, "হ্যাঁ, বৃটেন ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছে। কিন্তু তাঁরা আমাদের দুর্ব্বলও করেছে, দুর্নীতিপরায়ণও করেছে! গান্ধীজি গত বাইশ তেইশ বৎসর ধরে তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেছেন (গান্ধীজির "জি" কথাটা সম্মানসূচক)। মাত্র সে সময় থেকেই ভারতবাসীগণ জাতীয় গর্ব্ব ও অনুভূতি ফিরে পেয়েছেন। আগের দিনে হলে কোন পুলিশ কোন কিষাণকে আক্রমণ করলে অন্য সবাই পালিয়ে যেতো।

আজকে এ অবস্থায় তারাই কিষাণকে রক্ষা করতে ছুটে আসে। ভারতবাসী আজ সাহসী। এটা শুধু একটা রাজনৈতিক অস্ত্রই নয়। এদিয়ে আমরা উঁচুহারের খাজনাও রদ করতে পেরেছি।"

ভারতের প্রতিরোধশক্তির জনক গান্ধী—তার প্রতীকও তিনিই। কোন ব্যক্তি তাঁর নিজের জন্য লবণ তৈরী করতে পারবেন না। লবণের একচেটিয়া ব্যবসা থাকবে সরকারের হাতে। সরকারের কাছ থেকেই সবাইকে লবণ কিনে খেতে হবে—বৃটিশের তৈরী এ আইন অমান্য করে ক্ষীণদেহ কটিবাস-পরিহিত গান্ধী স্যাণ্ডেল পায়ে সাগরপারে চললেন লবণ তৈরী করতে। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর অনুগামী হলেন। এ এক জনপ্রিয় তীর্থযাত্রা হয়ে দাঁড়াল। একে পুষ্ট করল যুবসম্প্রদায়ের আদর্শবাদ, পুষ্ট করল নেতৃবিহীন জাতির নেতৃ-আকাঙ্ক্ষা। লবণযাত্রা ভারতের জনতাকে শারীরিক ভাবে এক নেতাকে অনুসরণ করবার সুযোগ এনে দিল। এজন্য গান্ধীকে ধন্যবাদ। তিনি তাঁর অনুগামীদের ঘর বেদখলকারী এক বিদেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা জাগিয়েছেন। গান্ধী যখন বড়লাটের মার্ব্বেলে-তৈরী বিরাট প্রাসাদের সোপান অতিক্রম করেন, তখন ভারতীয়গণ নূতন এক মর্য্যাদার সন্ধান পান। গান্ধীর অনশনে সমগ্র সাম্রাজ্য কেঁপে ওঠে। গান্ধী-পরিচালিত এক অসহযোগ আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করায় আন্দোলন বন্ধ করার জন্যে তিনি অনশন করেন। হিংসার তাণ্ডব থেমে গেল। শাস্তি বা পুরস্কার দিতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁর নেই। ক্ষমতার অধিকারী না হয়েও তিনি বল্গা টানতে পারেন। দুর্ব্বলদের মধ্যে থেকেই শক্তিধরের জন্ম হয়। শক্তিহীন যাঁরা তাঁরা গান্ধীর শক্তির গৌরব করেন। তাঁর শক্তি তাঁরা নিজের ব'লে মনে করেন। হাজার হাজার লোক তাঁকে পিতার ন্যায় গণ্য করে 'বাপু' বলেই সম্বোধন করে। তিনি স্বাক্ষরও করেন 'বাপু' নামে। আমার নিকট এক পত্রেও তিনি সেভাবে স্বাক্ষর করেছেন।

গান্ধী ভারতে নৈরাশ্যের প্রতিষেধক। গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত-বাসীগণ অধিকতর দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলেছেন। এজন্য নেহেরু কৃতজ্ঞ। নেহেরু গর্ব্বিত, ভাবপ্রবণ ও উদ্দাম প্রকৃতির। তিনি বললেন, "আমরা ডমিনিয়ন ষ্টেটাস চাইনে। কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত আমরা কন্যাদেশ নই। আমরা নিজেরাই মাতৃদেশ। ভারতের সভ্যতা বহু শতাব্দীর। বৃটিশরা আমাদের এমন এক বৃটিশ কমনওয়েলথে যোগ দিতে বলেন, যে কমনওয়েলথের মধ্যে যে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমুখ কয়েকটি দেশ ভারতীয় অধিবাসীদের স্বার্থবিরোধী ব্যবহার করেছেন। আমি বরঞ্চ এমন এক রাষ্ট্রপরিবারে যোগ দেব, যে রাষ্ট্রপরিবারে শুধু বৃটেনই থাকবে না, থাকবে চীন, আমেরিকা, রুশিয়া এবং পৃথিবীর সকল মানুষ।

আমি নেহেরুকে গান্ধীর সম্বন্ধে কিছু বলতে বললাম। তিনি বললেন, "গান্ধী হচ্ছেন ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা, তবে সমগ্র বিশ্বের জন্যই তাঁর বাণী। তিনি একেবারে খাঁটি ভারতীয়। তবে তাঁর আধ্যাত্মিকতা সার্ব্বজনীন।"

নেহেরু ঈষৎ হাস্যে স্বীকাব করলেন, "গান্ধীর মধ্যে একটু ডিক্টেটারী ভাব আছে। তাঁর এক একটা অনশন হিটলারের সন্ত্রাস থেকেও শক্তিশালী। গান্ধী ধর্ম্মঘটে বিশ্বাসী নন। তিনি শালিসি ব্যবস্থাই বেশী পছন্দ করেন। তবু তিনি একবার কয়েকজন সূতাকলের শ্রমিক ধর্ম্মঘট করায় মিল মালিকদের মীমাংসা করতে বাধ্য করার জন্য অনশন করেন। তাঁরাও অবশ্য তাড়াতাড়ি মীমাংসার জন্য অগ্রসর হন। ভারতে এমন কে আছেন যিনি গান্ধীর জীবন বিপন্ন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বা একদিনের জন্যও তাঁর বেদনা বাড়িয়ে তুলবেন?"

আমি সেবাগ্রামে সপ্তাহকাল গান্ধীর সঙ্গে ছিলুম। সেবাগ্রাম

হচ্ছে ভারতের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের একটি গ্রাম। সেই সপ্তাহের শেষ তিন দিন নেহেরুও সেখানে ছিলেন।

আমি মেঝেহীন মাটির কুটীরে থাকতাম, চালা ছিল খড়ের। মশারী খাটান কাঠের এক চারপায়ায় তারাখচিত আকাশের তলে ঘুমাতাম, গান্ধী যা খেতেন, তাই খেতাম। বেশ খানিকটা ঢেরস সেদ্ধ আর কচি শাক, আলু সেদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ, গরুর দুধ, আম, চা, মধু ও বিস্কুট—রোজ এইসব খেতাম। রোজ একই রকম খাওয়া হত। আমার কাটত ভালই। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন ও নৈশ ভোজনের সময় আমাকে ঢেরস সেদ্ধ ও কচি শাকের ব্যঞ্জন দেওয়া হল। তৃতীয় দিন যখন আমাকে এগুলি দেওয়া হচ্ছিল, আমি বললাম, "ধন্যবাদ, দয়া করে ওগুলো আমাকে দেবেন না।" খাদ্য সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীর অশেষ কৌতূহল। তিনি আমার খাওয়া দাওয়ার ওপর নজরও রাখতেন খুব। বললেন, "আপনি দেখছি তরিতরকারী পছন্দ করেন না।"

উত্তরে আমি বললাম, "এই তরিতরকারীগুলির স্বাদ আমার ভাল লাগেনা।"

তিনি বললেন, "বেশ খানিকটা লবণ ও লেবু মিশিয়ে নিন।"

আমি হেসে উত্তর দিলাম, "অর্থাৎ আপনি আমাকে তরকারীগুলির স্বাদটিকে মেরে ফেল্‌তে বলছেন।"

তিনি বললেন, "তা নয়। আমি এগুলির স্বাদ সমৃদ্ধ করতে বলছি।"

আমি বললাম, "আপনি এত অহিংস যে কোন কিছুর স্বাদ পর্য্যন্ত হত্যা করবেন না।"

বাস্তবিকই গান্ধী শান্তিবাদী, কিন্তু তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা করে, তাঁর জীবন পর্য্যালোচনা করে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে তাঁর শান্তিবাদের উৎস ধর্ম্মভাব নয়, এ শান্তিবাদ সম্পূর্ণ

রাজনৈতিক। তিনি পূর্ণ শান্তিবাদীও নন। আধুনিক জগতের জাতিসমূহ রাজ্য ও প্রভুত্বলাভের জন্য যে সব যুদ্ধ বাধায়, তার ওপর গান্ধীর কোন আস্থাই নেই। তিনি যদি পারতেন তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও বন্ধ করতেন। কারণ, যুদ্ধজয়ের দ্বারা বিজয়ী গভর্ণমেণ্টগুলি যে মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গান্ধীর অহিংসা শান্তিবাদ নয়, এ অহিংসা যুদ্ধবিমুখতাও নয়। এ অহিংসা হচ্ছে গান্ধীজীর সংগ্রামের হাতিয়ার। অনশনও অস্ত্রের কাজ করে। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্য কোন হাতিয়ার নেই কারণ জনগণ নিরস্ত্র। গান্ধী কি ভাবে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের কৌশল উদ্ভাবন করলেন, তাঁর কাছে তা শুনলাম। সমগ্র কাহিনীটাই খাঁটি ভারতীয় ধরণের। তিনি বললেন, "এর স্থরু ১৯১৬ সনে। আমি কংগ্রেসের কাজে লক্ষ্ণৌ ছিলাম, ভারতের সাধারণ এক রুগ্ন চাষী আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে বলল, "আমার নাম রাজকুমার শুক্ল, নিবাস চম্পারণ। আমাদের জেলায় একবার আস্থন।" গান্ধী বলে চললেন, "সে তার জেলার চাষীদের দুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করে আমাকে তাদের দেখে আসতে অনুরোধ করল। লক্ষ্ণৌ থেকে চম্পারণ শ কয়েক মাইল দূর। কিন্তু সে এমন নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পড়ল যে আমাকে যাব বলে কথা দিতেই হল।"

গান্ধী অবশ্য তখনতখনই রওনা হতে পারলেন না। তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ চাষীটিকে গান্ধীর সাথে সারা ভারত পরিক্রমা করতে হ'ল এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯১৭ সালে গান্ধী তাঁর সাথে ট্রেনযোগে কলকাতা থেকে চম্পারণ যাত্রা করলেন।

গান্ধী সে-অঞ্চলের চাষীদের তাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু গান্ধী আরও বললেন, বিষয়টার অপরদিক জানবার জন্যে আমি

এ-অঞ্চলের ব্রিটিশ কমিশনারের সাথেও সাক্ষাৎ করতে চাই। কমিশনারের কাছে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ভয় দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ সে-জেলা ছেড়ে যেতে বললেন। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করে অবস্থা জানবার জন্যে আমি হাতীর পিঠে চড়ে একটা গ্রামের দিকে রওনা হলাম।

গান্ধী বললেন, "পথে পুলিশের এক চর আমার নাগাল ধরে আমাকে চম্পারণ ত্যাগের আদেশ দেন। পুলিশ আমাকে আমার বাসভবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আমি এতে কোন আপত্তি করিনি। জীবনে এই আমি প্রথম আইন অমান্য করি। আমি সেই জেলা ত্যাগ করতে অস্বীকার করলাম। সেই বাড়ীর চারদিকে বহু লোকের ভিড় জমল। জনতা নিয়ন্ত্রণে আমি পুলিশের সাথে সহযোগিতাই করি।"

স্মৃতি মন্থন করে গান্ধী বলে চললেন, "তারপর বিচারের জন্যে আমাকে আদালতে হাজির করা হল। গভর্ণমেন্টের এটর্ণী ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলাটা স্থগিত রাখতে বললেন। কিন্তু আমি মামলা চালিয়ে যেতেই বললাম। আমি কোর্টে বলতে চাই যে আমি স্বেচ্ছায়ই চম্পারণ ত্যাগের আদেশ অমান্য করেছি। আমি তাঁকে বলি যে কিষাণদের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যেই আমি এসেছি। এ-জন্যেই আমার ব্রিটিশের তৈরী আইন ভঙ্গ করতে হয়েছে। এ আইন অমান্য করে আমি তার চেয়েও উচ্চতর আইন, আমার বিবেকের নির্দ্দেশ পালন করেছি।"

গান্ধী বলেন, "এই প্রথম অমি ব্রিটিশ-আইন অমান্য করি। আমার দেশের কোন অংশে শান্তিপূর্ণ কাজে কোন ব্রিটিশেরই আমাকে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই, এই নীতিটাই আমি স্থাপন করতে চাই। আমি আমার দোষ স্বীকার করি।"

সরকারী কর্ম্মচারীরা গান্ধীকে দোষ স্বীকার করতে নিষেধ করেন।

গান্ধীকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা তাঁদের ছিলনা। গান্ধী কথা ফিরিয়ে নিতে রাজি হলেন না। শেষ পর্য্যন্ত মামলা ডিস্‌মিস্ করে গান্ধীকে অব্যাহতি দেওয়া ছাড়া গভর্ণমেন্টের গত্যন্তর ছিল না।

গান্ধী বললেন, "আইন অমান্য করে জয়ী হলাম।"

১৯১৭ সালের সেদিন থেকে গান্ধী তাঁর আইন অমান্য আন্দোলনের পদ্ধতির উৎকর্ষ করে চলেছেন। ভারতে একদল বিক্ষোভপ্রদর্শন-কারীর ওপর পুলিশ লাঠি চালায়। শোভাযাত্রীরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে মার খেতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা এত বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায় যে ব্রিটিশরা পুলিশ সরিয়ে নেয়। ভারতবাসীরা বিদেশী কাপড়চোপড় কেনা বন্ধ করলেন। খাজনা দেওয়াও বন্ধ করেন। রাস্তায় শুয়ে পড়ে তাঁরা মোটরারোহী ব্রিটিশ অফিসারদেরও পথ রোধ করেন।

সুকৌশলে গান্ধী ভারতবাসীদের নিস্ক্রিয়তা ও আলস্যকে সংগ্রামের অস্ত্রে রূপান্তরিত করেন। ব্রিটিশ-শাসনসৃষ্ট বশানুগতকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হ'ল। শুধুমাত্র সাহসের সংযোগ ঘটান হয়। গান্ধীর অবদান হচ্ছে এইখানেই।

একবার আমি গান্ধীকে বলি যে ইংলণ্ড এক উন্নতধরণের গণতান্ত্রিক দেশ। তিনি তার উত্তরে বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে ইংলণ্ড একাধারে ঘরে গণতান্ত্রিক ও বাইরে সাম্রাজ্যবাদী হতে পারেনা। সাম্রাজ্যবাদ বাস্তবিকই গণতন্ত্রের বিপরীতধর্ম্মী। কোন দেশের পক্ষে বিনা অধিকারে কেবলমাত্র শারীরিক শক্তির বলেই অপর কোন দেশকে দীর্ঘদিন পদানত রাখা গণতন্ত্রবিরোধী। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে এমন ধরণের এক শক্তি যাতে অধিকারের অনুমোদন নেই। এই কঠোর সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বৃটেন ভারতে অসংখ্য গণতন্ত্রসম্মত আইন মেনে চলে। যে কোন একনায়কশাসিত ইউরোপীয় রাষ্ট্রে একদিন রাত তিনটায় গান্ধীর মত লোককে নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলা হত—তাঁর কাছ থেকে বা তাঁর সম্বন্ধে কেউ আর একটি কথাও

শুনতে পেতনা। নাৎসী জার্ম্মানীতে কোন গণ-আইনঅমান্য আন্দোলন সম্ভব ছিলনা—আর সোভিয়েট রাশিয়ায় কোন গণ-আইন অমান্য আন্দোলনের কথা কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু গান্ধী জানেন যে ভারত, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে জনমতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত বৃটেন তাঁকে হত্যা করবেনা, তা করা সম্ভবও নয়। এ সমস্ত দেশে জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকার ফলেই গান্ধীর পক্ষে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অহিংস সংগ্রাম চালানো সম্ভব হয়েছে। যে এক সপ্তাহ আমি গান্ধীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, সে সময় আমি শুধু অবাক হয়ে গান্ধীর শক্তির রহস্যের কথাই চিন্তা করতাম।

যে-কংগ্রেসের পরিচালক গান্ধী ও নেহেরু, যার সভাপতি মুসলিম ধর্মাবলম্বী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সে-কংগ্রেস হচ্ছে একটি ঢিলেঢালা প্রতিষ্ঠান, বৎসরে আট সেণ্ট চাঁদা দিলেই সে প্রতিষ্ঠানের সভ্য হওয়া যায়—কোন কিছু করা বা শৃঙ্খলানুগত্যের কোন বাধ্য-বাধকতাই নেই। গান্ধীর না আছে অর্থ-সম্পত্তি, না আছে বাধ্য-বাধকতা সৃষ্টির কোন উপায় বা প্রতিষ্ঠান। তাঁকে কোন দিন চোখেও দেখেনি এমন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী তাঁর অনুগত। তাঁর আহ্বানে তাঁদের অনেকেই বিরাট স্বার্থত্যাগে নেমে আসবেন, এমনি অনেকে তাঁদের স্বাধীনতা ও জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করবেন। গান্ধী যখন অনশন করেন, লক্ষ লক্ষ লোক তখন সর্ব্বক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। কেন এমন হয়?

আংশিকভাবে এর কারণ ধর্ম্ম। ভারতের জনগণ অত্যন্ত ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন এবং হিন্দুদের মধ্যে বিশেষভাবে তাঁরাই গান্ধীর অনুগামী। ভগবান সম্বন্ধে ধারণাও তাঁদের বিশেষ ধরণের। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে সব কিছুরই স্থান আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃস্টধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা সবকিছুই এর মধ্যে আছে। গান্ধী নিজে খাঁটি হিন্দু। তিনি কোরাণ পড়েছেন।

ইসলামের কোন কোন নীতিতেও তিনি বিশ্বাসী। গান্ধীর মাটির কুটীরের একমাত্র সজ্জা হল ফ্রেমে বাঁধান যীশুখৃষ্টের একটি ছবি! তার নীচে লেখা "তিনিই আমাদের শান্তি।" গান্ধী আমাকে বোঝালেন "আমি যীশুর অনুগামী।" হিন্দুধর্ম্ম সকল মতকেই নিজের মধ্যে টেনে নেয়, কোন মতকেই ধ্বংস করেনা। তাই হিন্দু-ধর্ম্মের মূলসূত্র বলে কিছু নেই। হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্রগুলি সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে অর্থাৎ এই ধর্ম্মের মূলসূত্র বলেই কিছু নেই।

অজ্ঞেয়বাদ, একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতা সবকিছুকেই বুকে স্থান দেবার মত প্রসারতা হিন্দুধর্ম্মের আছে। হিন্দুরা মূর্ত্তির কাছে নাচে, প্রার্থনা করে। কিন্তু তাঁদের যখন প্রশ্ন করা যায় তাঁরা মূর্ত্তিতে বিশ্বাসী কিনা তাঁরা উত্তর দেন—না, আমরা একেশ্বরবাদী। নেহেরু বল্লেন, ভারতে হলে নায়গ্রা জলপ্রপাতও দেবতা বলেই গণ্য হত। তাকেও লোকে ভগবানের বিকাশ বলেই মানত। অগণিত ভারতবাসী গান্ধীকে ভগবানের বিকাশ বলেই মনে করেন। আবার তাঁরা তাঁকে মানুষ বলেও গণ্য করেন। এক হিন্দু ব্যবসায়ী আমাকে বল্লেন যে তিনি কংগ্রেস পার্টিকে ঘৃণা করেন, রাজনীতির ধার ধারেন না। তবু তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন যে সহস্র বৎসরেও গান্ধীর মত লোক জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁর জন্যে স্বর্গের দ্বার খোলা।

তাহলে, যে গান্ধীর সম্বন্ধে জনগণের ধারণা এরূপ, সেই গান্ধীকে মুসলিম ও অবিশ্বাসীরা কেন নেতা বলে মেনে নেন? গান্ধীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী স্বর্গীয় মহাদেব দেশাই দশ বৎসরের অধিক কাল সেবাগ্রামে ছিলেন। আমি তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। আমি বলি, "আমি এ কদিন ধরে গান্ধীর বিরাট প্রভাবের উৎস নির্ণয় করতে চেষ্টা করছি। আমি আপাততঃ এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে গান্ধীর এই প্রভাবের প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর আবেগ।"

দেশাই বল্লেন, "তা ঠিক।" আমি প্রশ্ন করি, "এই আবেগের

মূলে কি ?" তিনি বললেন, "রক্ত মাংসের শরীরে যে সকল আবেগের অস্তিত্ব থাকে, এ আবেগ সে সব কিছুরই চরম বিকাশ। আমি প্রশ্ন করি, "যৌন ভাব ?" দেশাই বল্লেন, "যৌনভাব, ক্রোধ ও ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ। গান্ধীর ভুল স্বীকার করার ক্ষমতা আছে। তিনি আত্মপীড়নও করতে পারেন, অপরের ভুলভ্রান্তির দায়িত্বও নিজের কাঁধে নিতে পারেন। গান্ধী সম্পূর্ণ সংযত। তার ফলে তাঁর মধ্যে অত্যধিক শক্তি ও আবেগের স্ফুরণ হয়।"

সকল মহাপুরুষের অপরিহার্য্য উপাদানই আবেগ। আবেগ ঘনীভূত হলে হিটলারের মত ব্যক্তি সৃষ্টি হতে পারে। হিটলারের আবেগ ছিল প্রচুর। এই আবেগ বুদ্ধিবৃত্তিঘটিত হতে পারে, পাশবিক বা ধর্ম্মভাবঘটিতও হতে পারে। কিন্তু আবেগ থাকতেই হবে।

গান্ধীর মহত্বের উৎস খুঁজতে গিয়ে আমি স্বয়ং গান্ধীকেই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা স্থির করলাম। সূর্য্যোদয়ের সময় প্রাতে ও সূর্য্যাস্তের সময় সন্ধ্যায় আমি তাঁর সাথে ভ্রমণ করতাম। একদিন সন্ধ্যায় আমি তাঁকে বললাম, "এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, রাজনৈতিক প্রশ্ন। এত বেশী লোকের ওপর আপনার প্রভাবের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন ?"

উত্তরে গান্ধী বললেন, "আমার প্রভাবের কারণ সম্বন্ধে আমার ধারণা—আমি সত্যের সাধক। সত্যই আমার লক্ষ্য। কিন্তু সত্য শুধু কথার কথা নয়। সত্যের পথে চলাই আসল কথা।" আমার এই ধারণা হলো যে তিনি তাঁর সরল জীবনযাত্রা-প্রণালীর কথাই বলছেন। ইচ্ছা করলেই উপহার হিসাবে অজস্র জিনিষ তিনি পেতে পারতেন। ভারতের চাষীরা—তারাই দেশের শতকরা নব্বুইজন যে খাদ্য খায়, যে রকম ঘরে বাস করে, যে পোষাক পরে, বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া তিনি সে রকম খাদ্যই গ্রহণ করতেন, সে রকম ঘরেই বাস করতেন, সে রকম পোষাকই পরতেন। অনেকে বলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এটা তাঁর একটা ভাণ। তাঁর পক্ষে

এভাবে জীবন যাপন করবার কোন প্রয়োজনই নেই। এজন্যেই মনে হয় এটা একটা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ত্যাগেরই রূপ এই। গান্ধী বাস করেন মাটির পৃথিবীতে ও ত্রিশ কোটির অধিক ভারতবাসী তাঁরই স্তরে জীবন যাপন করেন। তাঁর মধ্যেই তাঁরা নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। তাঁর জীবনযাপনের এমনি ধারা যে তাঁরা তাঁর সাম্নে নিজেদের একাকার করে দেখতে পান।

আমি এ সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। গান্ধীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে প্রশ্ন করলাম, "এটা কি ঠিক নয় যে আপনি যখন স্বাধীনতার কথা বলেন বহু ভারতবাসীর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তখন তা আলোড়ন তোলে? ভারতবাসীরা শুনতে চায় এমন সুরের ঝঙ্কারই আপনি তোলেন না কি? আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে চলতি প্রিয় কোন সুর শুনলেই লোকে সর্ব্বাধিক বাহবা দেয়। আপনার দেশবাসী যে কথা বলতে চায়, যে কাজ করতে চায়, আপনি কি তাই করেন বা বলেন না?

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তা হতে পারে।"

গান্ধীর প্রভাবের কারণ এক জটিল বিষয়—তার কারণ অনেক। একটা কারণ হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা হিসাবে তাঁর আবির্ভাবকালের গুরুত্ব। ১৯১৯ সালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বঞ্চিত জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ঢেউ খেলে গেল—তেমনি সময় তিনি নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। সেই সময়েই প্রথম মহাযুদ্ধের বিরাট লোকক্ষয়ের পর স্বাধীনতার পক্ষে অত্যন্ত অকিঞ্চিতকর অপ্রগতি দেখে ভারতে নৈরাশ্যের ঢেউ খেলে গেল। প্রয়োজন ও প্রার্থনার ফল হিসাবেই তিনি আবির্ভূত হন।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ভারতে আর একবার নৈরাশ্যের ঢেউ খেলে গেল। মার্চ মাসে স্যার ষ্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপস্ যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে চার্চ্চিল সরকারের এক লিখিত

প্রস্তাব নিয়ে ভারতে উপস্থিত হন। বিভিন্ন কারণে ভারতের সবগুলি দলই ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ভারতে ক্রীপসের ব্যর্থতার ফলে বিরাট হতাশা জেগে উঠল—ঘটনার মোড় পরিবর্ত্তন ও অবশ্যম্ভাবী হল।

গান্ধীর প্রকৃতিতে নৈরাশ্য বলে কিছু নেই—তিনি যোদ্ধা। যাঁরা কিছু করেন না তাঁরাই বেশী নিরাশ হয়ে পড়েন—যাঁরা সক্রিয়ভাবে নিরাশার প্রতিরোধ করেন তাঁরা ততটা হন না। গান্ধীর সঙ্গে ১৯৪২ সালে আমার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁর বয়স তিয়াত্তর। তখনও তাঁকে উদ্যোগী সক্রিয় ও প্রফুল্ল দেখলাম তিনি অতীত নিয়ে মত্ত হতেন না। কখনও তিনি অতীতের কথা ভাবতেন না, লয়েড জর্জ সর্ব্বদাই তা করতেন। তাঁর জীবনের সাধনা—ভারতের মুক্তি তখনও অর্জ্জিত হয়নি।

ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ক্রীপস্-প্রস্তাবের কালে গান্ধীর কর্ম্মোদ্যম সক্রিয় হয়ে উঠল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে। তিনি কর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তিনি বিশ্বাস করেন লক্ষ্যে পৌঁছল রোগ নির্ম্মূল হবে। গান্ধী আমাকে বললেন, "চীনের আমেরিকা ও ইংলণ্ডকে বলা উচিত—আমরা তোমাদের সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই আমাদের স্বাধীনতার লড়াই লড়ব। এটা বিজ্ঞজনোচিত মনোভাব। পরনির্ভর হয়ে যে স্বাধীনতা লাভ হয়, তা স্বাধীনতাই নয়। লক্ষ্যে পৌঁছবার পন্থা ও সাফল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ষ্টালিনের রাশিয়াতে ভালমন্দ সবকিছুই নেতৃত্বের কাছে। একনায়কত্বের পিরামিডের চূড়ায় সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—সে সিদ্ধান্ত সাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয়। নির্ব্বিবাদে আদেশ পালন করবার অভ্যাসের ফলে তাঁরা সবকিছুই এমনিতেই মেনে নেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে যে কোন উপায়ই যেখানে গৌরবজনক বলে স্বীকৃত হয়, সেখানে উপায়গুলির নৈতিক বা শিক্ষামূলক

কোন মূল্যই আর থাকেনা—এরই ফলে সততায় অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক অসাধুতা জন্মায়। কিন্তু নিজেকে গণতন্ত্রের যোদ্ধা বলে ঘোষণা না করলেও গান্ধী অস্থিমজ্জায় গণতন্ত্রবাদী, কারণ পন্থা সম্বন্ধে তিনি সতর্ক। তিনি কাচের তৈরী ঘরে বাস করেন। গোপনীয় বলে তাঁর কাছে কিছুই নেই, তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে তিনি অকপট, তিনি বিশ্বাস করেন নেতা এবং অনুগামীদের একই সঙ্গে কাজ করা উচিত। বস্তুতঃ মনে হয়, তাঁর আদর্শ হচ্ছে নেতৃবিহীন ঐক্যতানের সুর-সমন্বয়। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি ভারতের জাতীয়তা-বাদীদের সন্ত্রাসমূলক বা গোপন কার্য্যকলাপে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করেন। দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে তিনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তাঁর প্ল্যান জানিয়ে দেন। আন্দোলন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রধান নেতারা প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে তাঁদের অহিংস অসহযোগ অন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ কংগ্রেস-প্রধানদের গ্রেপ্তার করেন। তারপর, কংগ্রেসের সদস্য হোন বা না হোন, নেতৃবিহীন জনসাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে—সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে অসহযোগ সুরু হয়। তাঁরা খাজনা দিতে বা শস্য বিক্রয়ে অস্বীকৃত হন। সরকারী আইন অমান্য করে চলেন। আন্দোলন নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বা যে পর্য্যন্ত না উদ্দেশ্য আংশিক বা সম্পূর্ণ সফল বা ব্যর্থ হয়, সে পর্য্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকে।

ক্রীপসের ব্যর্থতার উত্তরে ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট গান্ধীর আইন অমান্য আন্দালন সুরু হল—গান্ধী, নেহেরু এবং আরও বহু সহস্র লোক বন্দী হলেন। নেহেরু পঁয়তাল্লিশ সালে কারামুক্ত হন।

আমি গান্ধীর সঙ্গে থাকাকালেই গান্ধীর মস্তিষ্কে আগামী অসহযোগ আন্দোলনের ধারণা দানা বাঁধছিল। এক সাপ্তাহিক মৌনব্রতের দিনে

এই বীজ স্বতোৎসারিতভাবে জন্মলাভ করে। তাঁর মনে জেগে উঠল—"বৃটিশদের যেতেই হবে"। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তা লিখে ফেললেন এবং উৎসুক সবাইকেই কথাটা বলেন। আমিও বাদ গেলাম না। এই নূতন আইন-অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল বৃটিশদের চলে যেতে বাধ্য করা।

প্রতিদিন অপরাহ্নে সাক্ষাতের জন্য গান্ধী একঘণ্টা করে সময় দিতেন। ঠিক এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হলেই তিনি তাঁর কোমড়ের কাপড়ে গোঁজা প্রকাণ্ড নিকেল প্লেটেড্ ঘড়ি বার করে মৃদু হেসে বলতেন, "আচ্ছা এখন তবে....।" এই সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই আমি বিদায় নিতাম। তিনি কাঁটায় কাঁটায় সময় মেনে চলতেন। তৃতীয়দিন আমি যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তিনি তাঁর মাটির মেঝোতে বসে ছিলেন।

আমরা দুজনে তাঁর "বৃটিশদের চলে যেতেই হবে" ধারণাটার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম।

আমি বললাম, "আমার মনে হয় সম্ভবতঃ বৃটিশ একেবারে সম্পূর্ণভাবে চলে যেতে পারে না। তা হলে জাপানের হাতে ভারতকে উপহারই দেওয়া হবে—বৃটিশেরা কোনদিনই তাতে সম্মত হবে না, যুক্তরাষ্ট্রও তা মেনে নেবে না। আপনি যদি বৃটিশকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যেতে বলেন, তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা অসম্ভব দাবী বলেই বিবেচিত হবে। আপনার পক্ষে সে কথা বলা গাছের সঙ্গে কথা বলারই সামিল হবে। আমার মনে হয় আপনি চান না তাঁরা তাঁদের সেনাদল নিয়ে সরে পড়ুন, আপনি কি তাই চান?"

গান্ধীর মন উজ্জ্বল এবং দ্রুত সঞ্চরণশীল। কিন্তু একথা শুনে তিনি অন্ততঃ দুমিনিট নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। সেই নৈঃশব্দ যেন কান পেতে শোনা যায়। অবশেষে তিনি বললেন: "আপনি ঠিকই বলেছেন? না, বৃটেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ

এখানে তাদের সেনাদল রাখতে পারবে। ভারতবর্ষকে তারা সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। জাপান যুদ্ধে জয়ী হোক, এ আমি চাইনে। এক্সিসের জয়ও আমার কাম্য নয়। কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে ভারতের জনগণ স্বাধীন না হলে বৃটিশের জয়লাভ সম্ভব নয়। যতদনি বৃটেন ভারতে প্রভু হয়ে থাকবে, ততদিন বৃটেন দুর্ব্বল থেকে দুর্ব্বলতরই হবে, নীতির দিক থেকেও হবে সমর্থনের অযোগ্য। আমি ইংলণ্ডকে অপদস্থ করতে চাইনে।"

পরের দিন গান্ধীর বন্ধু ভারতের ক্রোড়পতি "বস্ত্ররাজ" জি, ডি, বিড়লা আমাকে বলেছিলেন যে, এ বিষয়ে আমি তাঁর মনের পরিবর্ত্তন সাধন করেছি। গান্ধী একথাটা রাজা গোপালাচারীকেও বলেছিলেন। কথাটা আমি শুনি রাজা গোপালাচারীর কাছ থেকেই। গান্ধীর বহু ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী তাঁর মূল প্ল্যানের এই মীমাংসামুখী পরিবর্ত্তন অনুমোদন করেন নি এবং এ বিষয়ে উত্তেজিতভাবেই তাঁদের বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

গান্ধী আমাকে বললেন, "আমি মূলতঃ মীমাংসাপ্রবণলোক, কাজটা যে আমি ঠিকই করছি এ বিষয়ে কখনও নিশ্চিত হতে পারি না।" এই বিশিষ্ট জটিল ব্যক্তিটির এটা হচ্ছে একটা দিক। তারপর তিনি বললেন, "কিন্তু কঠোর ভবিষ্যতই এখন আমার মন জুড়ে আছে।" এটা হচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় দিক। তিনি জটিল আইন-অমান্য আন্দোলন পরিহার করতে রাজি হলেন না। আমি জোর দিয়েই বললাম "যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কি এটা মুলতুবি রাখা উচিত নয় ?"

উত্তরে তিনি বললেন, "না, উচিত নয়, কারণ আমি কাজে নাবতে চাই এখনই, এবং যুদ্ধ চলার কালেই আমি তা করতে চাই।" তারপর, আমার মনে হয়. তিনি তাঁর বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর ধারণা ছিল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে এটাই হবে তাঁর শেষ বৃহৎ কাজ। যা'হোক তিনি বললেন, "আপনি প্রেসিডেণ্টকে

বলবেন, আমি চাই কেউ আমাকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করুন।" এটা তাঁর চরিত্রের তৃতীয় দিক। তিনি ছিলেন বাস্তব রাজনীতিবিদ। তিনি জানতেন যে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের স্বার্থবিরোধী বলে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যদি তাঁকে আন্দোলন মুলতুবি রাখাতে পারেন, তাহলে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করার সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা এসে যাবে।

ভারতে পরিবর্ত্তন ঘটাবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব বিস্তার করবে আশা করে নেহেরু প্রথমদিকে গান্ধীর বিয়াল্লিশ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন প্রস্তাবের বিরোধীই ছিলেন। তিনি হচ্ছেন একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। তিনি ।ফ্যাসী-বিরোধী, যুদ্ধপূর্ব্ব ফ্যাসিষ্ট-অভিযানের শত্রু হিসাবে তাঁর কার্য্যকলাপও নিখুঁত। নেহেরুর আশঙ্কা হল যে ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাহত করবে। কিন্তু গান্ধীর দৃষ্টিকোণ প্রধানতঃ একজন ভারতীয়ের দৃষ্টিকোণ। বোম্বের এক গৃহিণী আমাকে বলেছিলেন, "এটা হচ্ছে আপনার গৃহে এমন একজনের উপস্থিতি, প্রথমতঃ যাঁর সেখানে স্থান হবার কোন কথাই উঠতে পারেনা, তার ওপর চলে যেতে সে অনিচ্ছুক।" তাঁরা বৃটিশের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে এতটা ব্যাকুল যে প্রায়ই অন্য কিছু তাঁদের চোখে পড়েনা। নেহেরু এবং তাঁর সমদৃষ্টি-সম্পন্ন ক্রমবর্দ্ধমান দলটির দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর উদার, সমস্ত পৃথিবীর কথা স্মরণ রেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ১৯৪২ সালে নেহেরুর নেতৃত্ব জয়ী হয়নি। গান্ধীর কাছে নেহেরুকে পরাভব স্বীকার করতে হ'ল—আইন-অমান্য-আন্দোলনের ব্যাপারে গান্ধী নেহেরুর সমর্থন আদায় করলেন।

প্রবল ব্যাকুলতা ও অধীরতা সত্ত্বেও গান্ধী সহনশীল ও কোমল-

মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। পঁয়তাল্লিশ কোটি চীনবাসী ও সার্ব্বজনীন প্রগতির ওপর সাম্রাজ্যবাদের হানিকর প্রভাব সম্বন্ধে নেহেরু সচেতন। এটা তিনি জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধকে ফলপ্রসূ করতে পারবে না, শান্তিরও সমাধি ঘটাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ না ঘটলে শান্তিপর্ব্বের শেষে নূতন সাম্রাজ্যবাদ জন্মলাভ করবে। এ ধরণের চিন্তাধারার ফলেই আমি ভারতের ব্যাপারে আকৃষ্ট হলাম। মুক্ত ও শ্রেষ্ঠতর পৃথিবীলাভের প্রথম সোপান হিসাবে আমি ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে আকৃষ্ট হই। নেহেরুর জাতীয়তাবাদের স্থান আন্তর্জ্জাতিকতার মধ্যেই। কিন্তু বাধ্য না করলে বৃটিশ কিছুই করবেনা।—নেহেরুকে একথা বোঝাতে গান্ধীর আদৌ বেগ পেতে হয়নি। বন্ধু ক্রীপ্‌সের ভারতে থাকাকালীন ও ভারত ত্যাগের পরের ব্যবহারে নেহেরু তিক্ত হয়ে উঠেছিলেন—ফ্যাসিষ্টপন্থীদের জয়ের মহা আশঙ্কার ফলেই কেবল তিনি সংযত হন। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের ফলে বৃটিশ ভারতবর্ষকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের অধিকারদানে বাধ্য হলে ভারতে, চীনে ও সমস্ত পৃথিবীতে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে বিপুল উদ্যম জেগে উঠবে, জয়লাভও তাতে ত্বরান্বিত হবে—গান্ধীর এ-যুক্তির বিরুদ্ধে নেহেরুর কিছু বলবার ছিল না।

"তরবারি হস্তে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করাই আমার ইচ্ছা, কিন্তু আমি তা কেবল স্বাধীন মানুষ হিসাবেই করতে পারি"—১৯৪২ সালের জুনমাসে বোম্বের এক বিরাট জনসভায় নেহেরুকে এরূপ বলতে আমি শুনেছি।

কাজেকাজেই, মূলতঃ গান্ধী ও নেহেরু একমত ছিলেন। যুদ্ধকালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ অক্ষশক্তির জনসাধারণের কাছে এই বাণীই বহন করত: যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় হলেও শ্রেষ্ঠতর এক পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে তোমরা। অক্ষশক্তিবিরোধী জনসাধারণের

কাছে বল্‌তঃ যুদ্ধে জয়লাভ শান্তি ও মানব-প্রগতি সম্ভব করে তুলবে।

সে সময় আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা সম্বন্ধে নেহেরুর কোন দ্বিধা থাকলেও তা গান্ধীর চাপে ভেসে গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধানতম সম্বলই ছিলেন গান্ধী। তিনিই ছিলেন সেই মূলধন যা নেহেরুই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতেন। যে যুদ্ধ ছিল ভারতের জনগণের কাছে অপ্রিয় এবং যে ব্যাপারে তিনি নিজেও ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত—সে যুদ্ধকে সমর্থন জানিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরিয়ে নিজেকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা নেহেরুর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব ছিলনা।

সেবাগ্রামে গান্ধী ও নেহেরুর মধ্যে এ বিষয়ে বিতর্ক হওয়ার সময় নেহেরুকে খুবই অসুখী দেখাত। কিন্তু গান্ধী যখন একবার তাঁকে স্বমতে আনলেন, তখন তিনি গান্ধীর চেয়েও দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠলেন। গ্রাম ত্যাগ করবার সময় গান্ধী ও তাঁর সেক্রেটারী দেশাই আমাকে বলেন, আমি যেন মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে ভাইসরয়ের কাছে প্রস্তাব করি। গান্ধী তখনও বেদনাদায়ক আইন অমান্য আন্দোলন এড়াবার আশা করছিলেন। কিন্তু পরে বোম্বাইএ আমি যখন নেহেরুকে জিজ্ঞেস করি গান্ধী-ভাইসরয় আলোচনা মঙ্গলজনক হবে কিনা, তখন তিনি ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দেন, "না, কেন গান্ধী তা করতে যাবেন ?" নেহেরু তখন মনস্থির করে ফেলেছেন।

গান্ধীর মধ্যে কোন তিক্ততা নেই। বৃটিশ পক্ষ নেহেরুর চেয়ে তাঁর সঙ্গেই আলোচনা চালান অনেক সুবিধাজনক মনে করেন। ভারতে যত বৃটিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তাঁরা সবাই নেহেরুর নিন্দা করেছেন—কিন্তু গান্ধীর কোন নিন্দাই তাঁরা করেননি। গান্ধীকে না বুঝেও বৃটেনবাসীরা তাঁর ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত

সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সন্তান নেহেরু। তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করাই নেহেরুর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি হলেন তাঁদের এত বিরোধী—এজন্য তাঁরা তাঁকে আরও বেশী অপছন্দ করেন।

তীক্ষ্ণধার মন ও সুন্দর লিখন-ক্ষমতার অধিকারী নেহেরু। তিনি পরিচ্ছন্ন, সত্যনিষ্ঠ, আত্মসমালোচক ও বিনয়ী। তাঁর অনন্যসাধারণ গুণ হচ্ছে সম্ভ্রমজ্ঞান ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ। আধুনিক জীবন মানুষকে যে সব অবমাননার আবর্তে ফেলে, তাঁর মনপ্রাণ তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়ে আছে।

নেহেরু তাঁর জীবনের প্রথমভাগ কাটান এক মহাপুরুষের ছায়ায়—তিনি তাঁর পিতা মতিলাল নেহেরু। তাঁর দ্বিতীয় অংশ কাটে আর এক মহাপুরুষের ছায়ায়—তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই ছায়ার বাইরে না আসা পর্য্যন্ত তাঁর নিজ-মহত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটবেনা।

ইতিহাস নেহেরুর উপর এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে একা থাকবার আদিম প্রেরণা। এখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আবির্ভাব ঘটছে এবং তার ফলে তার নূতন সমস্যারও উদ্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর বাকী অংশের পক্ষেও তা একটা জটিল সমস্যার কারণ হয়ে উঠবে। পশ্চিম দেশেরও চিকিৎসকের প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিল একটা ব্যাধি। শান্তিলাভে ব্যর্থকাম পৃথিবী রুগ্ন অবস্থাতেই থেকে গেল। মানবজাতির ভাগ্যে কি জুটবে—চিকিৎসক না একনায়ক? একজন যোগী জুটবে, না জুটবে একজন কমিশার? ১৯১৮ সালের পর জার্ম্মানী ডস্টয়েভস্‌কীর রহস্যবাদ এবং ভারতীয় ও চীনদেশীয় দার্শনিকদের দিকে ঝুঁকেছিল। জার্ম্মান সাংবাদিক আর্থার হোলিৎ-সারের সঙ্গে লেনিনের পরিচয় ছিল। তিনি গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করে 'লেনিন ও গান্ধী' নামে একখানা বই লিখেছিলেন। সেই বিভ্রান্তিকর সময়েই মহাত্মার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেহেরু রুশিয়া পরিদর্শন করেন। আর কেউ না হলেও অন্ততঃ নেহেরু রুশিয়া ও ভারতের একটা সংমিশ্রণের—কমিশার ও যোগীর সংমিশ্রণের সন্ধান করছিলেন।

আজকের দিনে নেহেরুসহ বহু ভারতীয় এবং পার্লবাক ও অন্যান্য বহু পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তি এরূপ মনে করছেন (না ওটা শুধুই আশা?) যে ভারতবর্ষেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা সংযোগ সাধিত হবে।

পশ্চিম অসংযত ও বল্গাহীন হয়ে উঠ্‌ছে; ক্ষমতা ও সম্পদের লোভের রাশ সে টান্‌তে পারছেনা। যোগীর সাধনা নিজের পূর্ণতার জন্যে; কমিশার ও পুঁজিবাদীর সাধনা সঞ্চয়ের জন্যে। জীবনের উদ্দেশ্য যেখানে নিজেকে গড়ে তোলা, ত্যাগ ও সন্ন্যাস সেখানে স্বাভাবিক। জীবনের উদ্দেশ্য যেখানে সম্পদলাভ, সেখানে সম্প্রসারণ, সাম্রাজ্যবাদ, একনায়কত্ব ও একচেটিয়া ব্যবসা স্বাভাবিক। যোগী হচ্ছেন গণতন্ত্রবাদী; পথের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। কমিশার যে কোন সম্ভাব্য পথে চলাতেই আগ্রহশীল। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি মনকে নিয়োজিত করা হয়, বাক্যের প্রয়োগ হয়,—মন বা বাক্য সেখানে মুক্ত থাকবে কি করে?

পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রয়োজন আরও অধিক সংখ্যক যোগীর।

পূর্ব্বদেশে যোগীর সঙ্গে যন্ত্রের মিলন ঘটাতে হবে। গান্ধী তা করতে প্রস্তুত নন। নেহেরু তা চেষ্টা করে দেখবেন।

ভারতের সমস্যা

ভারতবর্ষে এসে প্রথম সাতদিন—এ সাতদিনই আমি নয়াদিল্লীতে কাটিয়েছি—অতিবাহিত হবার পর দেখলাম যে. একটি ট্যাক্সি থেকে নেমে ফুটপাতটুকু অতিক্রম করে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করা ছাড়া আর আমার হাঁটা হয়নি। স্থির করলাম, কিছু হাঁট্‌বো। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বাড়ীঘর, ফুটপাত এবং হাওয়া তখনও এত উত্তপ্ত যে, আর পা টান্‌তে না পেরে কনট্‌ সার্কাসের বড় পার্কটিতে প্রবেশ করলাম আমি। সেখানে দাঁড়িয়ে একবার দেখে নিলাম চারদিক, তারপর কয়েক পা এগিয়ে বসে পড়লাম। এত গরমে শরীরচর্চ্চা করা যায়না।

পার্কটির মধ্যে এক জায়গায় ঘাসের উপর বারোটি পরিচ্ছন্ন তামাটে যুবককে বসে থাক্‌তে দেখলাম; তাদের চক্ষু উজ্জ্বল এবং প্রত্যেকের হাতেই একটি করে হকি ষ্টীক্; বোঝা গেল নিজেদের খেলা নিয়েই তারা আলোচনা করছে। অন্যত্র, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সবেমাত্র যে দীর্ঘ পরিখাগুলি খোঁড়া হয়েছে, ছেলেরা তারি ভিতরে-বাইরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিলো। বড়রা বিরলসন্নিবিষ্ট শুক্‌নো ঘাসের ওপর বসে রয়েছেন। মাঝে মাঝে মেয়েদের কাঁচা লেবুর মতো সবুজ, গোলাপী অথবা লাল টম্যাটো-রঙা শাড়ী চোখে পড়ে।

পার্কের এক ধারে পথের ওপরে কাঠের একটি ছোট মঞ্চ রয়েছে, তার ওপরে দুটি বড় বড় মাটির কলস। পাশেই বৃদ্ধ একজন ভারতীয় বসে আছে, এবং জল খেতে যারা আসৃছে সেখানে কলসী থেকে ব্রোঞ্জের একটি পাত্রে জল তুলে তাদের

অঞ্জলিতে সে ঢেলে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ ধরেই আমি এই দৃশ্যটি লক্ষ্য করছিলাম; সাদা স্যুট-পরা অন্য এক ভদ্রোলোকও লক্ষ্য করছিলেন। একটু হেসে মাথা নাড়লেন তিনি—আমি জল খাবো কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। ইংরিজীতে তিনি আমাকে জানালেন যে, তিনি একজন ডাক্তার। জল বয়ে নিয়ে এসে সেই জল বিতরণ করার জন্য বৃদ্ধ ভারতীয়টিকে তিনি কিছু টাকা দিয়ে থাকেন। সেখানে কয়েক মাইলের মধ্যেও পথচারীদের জল পাওয়ার কোন উপায় নেই দেখেই তিনি এই ব্যবস্থা করেছেন। তিনি এবং তার অন্য পাঁচজন বন্ধু কনট্ সার্কাসে এইভাবে জল বিতরণ করে থাকেন। এতে প্রতিমাসে তাঁদের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা, অর্থাৎ প্রায় ১৫ ডলার করে ব্যয় হয়; বছরের যে পাঁচ ছয় মাস সব থেকে বেশী গরম পড়ে—সেইসময়েই তাঁরা এই জল-বিতরণের ব্যবস্থা করেন। তিনি জানালেন যে, নয়াদিল্লীর আরো বহু স্থানেই এইভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জলবিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরো বল্‌লেন, "কাল বরফ থাক্‌বে—নলের ব্যবস্থা থাকায় কলসী ঢেকে রাখা যাবে।" যতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন, পথচারীরা আস্‌ছিলো আর জল খেয়ে যাচ্ছিলো।

"কর্ত্তৃপক্ষ জল সরবরাহ করেননা কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তরে তিনি বল্‌লেন, "সে প্রশ্ন আমিই আপনাকে করছি। সরকারের কাছে আমরা দরখাস্ত করেছি, কিন্তু তাঁরা বলেন, জলের নল এবং ফোয়ারা বসাতে গেলে পার্কটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হবে। অনুমতি ছাড়াই আমরা এ কাজ করে যাচ্ছি, সরকারী কর্ম্মচারীরা আমাদের এ কাজ করতে বারণ করছেন; এর জন্যে আমাদের গ্রেপ্তার করা হতে পারে।" তিনি আরো বল্‌লেন যে, তিনি

কংগ্রেস-দলের সদস্য, এবং ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধৃশ্রেণী; ব্রাহ্মণদের পরেই তাদের স্থান। তিনি বল্‌লেন, "কিন্তু আজ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আমরা আর যুদ্ধ করতে পারিনা।"

আমার হোটেলের দোতলার ঝুল-বারন্দার পাঁচিলে ভর রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমান বাহিনীর ক্যাপ্টেন কুলার এবং আমি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মার্কিণ সৈন্যদের থাক্‌বার অট্টালিকা তৈরী করবার জন্যে যে সমস্ত ভারতীয় পুরুষ আর মেয়েদের নিযুক্ত করে হয়েছিলো—তারা পুরোনো দিল্লীতে যে যার বাড়ীর দিকে হেঁটে ফিরছিলো। পুরুষদের পরণে শুধুমাত্র লেংটি, তা ছাড়া তাদের প্রায় উলঙ্গই বলা চলে,—তবে মেয়েদের পরণে বেদেনীদের মতো নানারঙের ঘাঘ্‌রা। মেয়েদের মধ্যে অনেকের কোলেই ছোট শিশু। চড়া রৌদ্রে দশ থেকে বার ঘণ্টা খেটে তারা এখন চার পাঁচ মাইল দূরের পুরোনো সহরে হেঁটে ফিরছে। দুঃখের বিশীর্ণ প্রতীক বলে তাদের মনে হলো।

"নিদারুণ নয়?" ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বল্‌লেন, "আমি একে দাসত্ব বলি, দাসত্বই বলি।" ক্যাপ্টেনের বাড়ী দক্ষিণ ক্যারোলিনায়।

এর কয়েকদিন পরে, বড়লাটের শাসন-পরিষদের একজন বৃটিশ সদস্যের সঙ্গে আমি আহার করছিলাম। এদের যাতায়াতের জন্য নয়াদিল্লীতে পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই কেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বল্‌লেন, "বাসের ভাড়া দেবার ক্ষমতা নেই এদের।"

দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের শাসনকর্ত্তা নিজাম; তাঁকে পৃথিবীর ধনীশ্রেষ্ঠ বলা হয়। এই হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদে রেলগাড়ীর কামরায় আমার সঙ্গে জনৈক ভারতীয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভদ্রলোক মুসলমান, ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসার।

নিজের বিমানবহরের জন্য একখানা নতুন বিমান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি পুণা যাচ্ছিলেন। ব্রহ্মদেশে তিনি জাপানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ভদ্রলোক স্বেচ্ছাতেই বৃটিশের অধীনে তিন বৎসর সামরিক চাকুরী করেছেন,—কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে সমস্ত ভারতীয়কে আমি বৃটিশের নিন্দা করতে শুনেছি, তাদের সকলের থেকে কঠোরভাবে তিনিই বৃটিশের নিন্দা করলেন। জানালার বাইরে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "এদের দিকে তাকিয়ে দেখুন এরা পশুর মতন জীবনধারণ করে।" আমরা তখন অগণ্য গ্রামের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। এখানকার লোকজন কুঁড়েঘরে থাকে—ঘরগুলি তৈরী করা হয়েছে বাঁশ অথবা কাদামাটি অথবা তালগাছের ডালপালা দিয়ে। বড় বড় ছেলেরাও সম্পুর্ণ উলঙ্গ; মেয়েদের পরণে ছেঁড়া কাপড়, পুরুষদের লেংটি। অফিসার ভদ্রলোক বল্‌লেন, "বৃটিশরা ভারতবর্ষকে শোষণ করেছে। জন গান্‌থার-এর "ইন্‌সাইড এশিয়া" পড়বার আগে এ সম্পর্কে আমি বেশী কিছু জানতামনা। আমাদের অজ্ঞ এবং দরিদ্র করে রেখে বৃটিশরা আমাদের দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে রাখে।"

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য যে হৃদয়বিদারক এবং সমস্ত দল, ধর্ম্ম এবং শ্রেণীভুক্ত লোকরাই যে তীব্রভাবে বৃটিশবিরোধী—একথা জান্‌বার জন্য দু-এক দিনের বেশী ভারতবর্ষে থাক্‌বার প্রয়োজন হয় না।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের শ্রমবিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার ফিরোজ খাঁ নূন আমাকে বলেছিলেন, "এশিয়া বা আফ্রিকার কোনখানেই বৃটিশরা স্থানীয় অধিবাসীদের বন্ধুত্বও অর্জ্জন করেনি বা সেখানে আধুনিক জীবনধারণ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেনি।" তিনি আরো বল্‌লেন, "নিউ ইয়র্কের কথা ছেড়েই দিলাম, লণ্ডনে বা প্যারিসে যা কিছু, লোকে দেখে তা গত দেড়শো বছরেরই সৃষ্টি,

কিন্তু গত দেড়শো বছরে ভারতবর্ষের প্রায় কোন পরিবর্ত্তনই ঘটেনি।” সেই ছেঁড়া কাপড় এবং দারিদ্র্য। যাই হোক, ভারত-বাসীরা বেশী খায়না বটে, কিন্তু মরে আরো কম,—কারণ, বৃটিশরা একটি স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রবর্ত্তন করেছেন। নূন একজন মুসলমান জমিদার, তিনি বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং তিনি গান্ধী-বিরোধী।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের সরবরাহ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার হোমি মোদী আমাকে বলেছিলেন, ভারতে বৃটিশরা “সামাজিক দম্ভ এবং অর্থনৈতিক শোষণ”-এর জন্য দায়ী। মোদী একজন কোটিপতি পার্শী।

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো আমাকে বলেছিলেন, “ভারতবর্ষ আজ যতখানি বৃটিশ-বিরোধী, এতখানি বৃটিশবিরোধী সে আগে আর কোনও দিন ছিলনা।”

বোম্বাইতে ‘ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি’ আমাকে তাঁদের এক সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমি ঠিক করে নিলাম যে, সেখানে কোনও বক্তৃতা না দিয়ে আমি ঘরোয়াভাবে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবো। একটি প্রশ্নের উত্তরে আমি যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলাম; ফ্যাসীবাদের জয় হলে ভারতবর্ষ এবং আমাদের কারোরই পরিণতি যে ভালো হতনা এ কথাও আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম।

জনৈক সাংবাদিক বল্‌লেন, “ভারতবর্ষের কাছে জাপানী ফ্যাসীবাদ এবং বৃটিশ ফ্যাসীবাদের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই।”

আমি বল্‌লাম, “দেখুন, ইংলণ্ড ফ্যাসীপন্থী নয়; ইংলণ্ড খুবই গণতান্ত্রিক দেশ, বহু রাজনৈতিক বিষয়ে সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অপেক্ষাও বেশী গণতান্ত্রিক।” আরো বল্‌লাম, “আমি জানি যে, বৃটিশরা মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে যে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে

থাকেন তা আপনারা পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে এসে পৌঁছুবার পর থেকে এখানকার প্রায় প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের কাছে শুনেছি যে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। রুশিয়া এবং জার্ম্মানীতেও আমি বেশ কয়েক বছর ছিলাম। সেখানে জেল-ফেরৎ লোকদের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয়না। আসলে তারা কারারুদ্ধই রয়েছে, তাদের মধ্যে অনেককেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।"

দ্বিতীয় একজন সাংবাদিক উঠে বল্‌লেন, "বৃটিশরাও আমাদের মেরে ফেলে, তবে সে জন্যে গুলি করবার দরকার বোধ করেনা।"

কি অর্থে তিনি একথা বল্‌ছেন—জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বিশদ্ করে বল্‌লেন, "ভারতবাসীদের গড়পড়তা আয়ু ২৭ বৎসর।" পরে সরকারী হিসাবেও আমি তাই-ই দেখেছিলাম। ইংলণ্ডে গড়পড়তা আয়ু প্রায় ৬০ বৎসর, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৬৩।

তৃতীয় একজন সাংবাদিক দৃঢ়ভাবে জানালেন "ভারতবর্ষে শতকরা ৪৫টি শিশু পাঁচ বৎসর বয়সের আগেই মারা যায়।" বৃটিশ আদমসুমারিতেও তা-ই রয়েছে।

এই শতকের তৃতীয় দশকে রুশিয়া বা পোল্যাণ্ডে এবং এই শতকের চতুর্থ দশকে স্পেনের বুভুক্ষুতম গ্রামাঞ্চলে যে দারিদ্র্য আমি দেখেছি, তার চেয়ে, বোম্বাইর চালাঘরগুলিতে এবং বোম্বাইর অদূরবর্ত্তী থানা জেলার গ্রামগুলিতে যে দারিদ্র্য আমার চোখে পড়েছে তা তুলনাহীনভাবে বেশী মারাত্মক। পার্ল বাক্ বলেন, "ভারতীয় চাষী চীনা চাষীর চেয়েও দরিদ্র। কারখানা-মজুরদের অবস্থা এর থেকে সামান্য কিছুমাত্র ভালো। লণ্ডনের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকায় বলা হয়েছে, "ভারতীয় শ্রমিককে যে অর্থে সারা বছর চালাতে হয়, বৃটিশ শ্রমিক সারা বছরে শুধু সিগারেটের পিছনেই সে অর্থ ব্যয় করে।" বৃটিশ সেন্‌সাস্ ব্যুরো-র কর্ত্তা মিঃ জে এইচ হাটন্ তাঁর ১৯৩১ সালের আদমসুমারির বিবরণীর প্রারম্ভে লিখ্‌ছেন যে, বোম্বাইতে "২৫৬, ৩৭৯

জন লোকের মধ্যে ৬ জন থেকে ৯ জন করে লোক এক একটি ঘরে থাকে।....বোম্বাইর লোকসংখ্যার বৃহত্তর অংশই থাক্‌বার জন্যে মাথাপিছু ৬ বর্গ ফুট করে জায়গা পায়।" বোম্বাইর লোকসংখ্যা তার পরে আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের কয়েক কোটি অধিবাসী সর্ব্বসময়েই ক্ষুধাপীড়িত। এখানে আক্ষরিক অর্থেই 'সর্ব্বসময়ে' কথাটির প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ক্রমক্ষয়কারী ক্ষুধা যে শুধুমাত্র শারীরিক সামর্থ্যেরই হানি ঘটায় তা নয়, এই ক্ষুধায় মস্তিষ্কেরও বিনাশ ঘটে। কোন্ কোন্ পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চল্‌ছে বা কোন্ পক্ষের হয়ে বৃটেন যুদ্ধ করছে—ভারতীয় গ্রামীণরা তা জানতো না। যুদ্ধের গতিবিধি সম্পর্কে তাদের ধারণা কি—একথা জিজ্ঞেস করায় তারা আমাকে উত্তর দিয়েছিল, "আমরা ক্ষুধার্ত্ত।" বৃটিশদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি একথা জিজ্ঞেস করতেও তারা উত্তর দিল, "আমরা ক্ষুধার্ত্ত।"

এই ক্ষুধা থেকেই ভারতের রাজনীতির জন্ম।

যে সামান্য সংখ্যক লোক শিক্ষিত বা রাজনীতি সম্পর্কে যাদের কিছুটা চেতনা আছে এই অবস্থা তাদের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে একটা নিদারুণ শত্রুভাবের সৃষ্টি করে।

অগাধ ঐশ্বর্যশালী মহারাজ বা কোটিপতি ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনাকালে, তাঁরা যে জনসাধারণের দুর্দ্দশালাঘবের জন্য অধিকতর চেষ্টা করছেননা এ জন্যে তাঁদের আমি ভৎর্সনা করেছিলাম। তারা আরও অনেক কিছু করতে পারেন, কেউ কেউ কিছু করবার চেষ্টাও করছেন। কিন্তু চল্লিশ কোটি লোকের অবস্থার এক তিল উন্নতিসাধনও একটা বিশাল ব্যাপার; তা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপার যতখানি সামর্থ্যসাপেক্ষ একা বৃটেনের বোধ হয় ততখানি সামর্থ্য নেই। যে আন্তর্জাতিক সামর্থ্যসমাবেশের

ফলে পরমাণু-বোমা তৈরী বা চক্রশক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল—ভারতের সমস্যাসমাধানের জন্যও তারি প্রয়োজন।

ভারতের লোকসংখ্যা প্রতি বৎসরে ৫০ লক্ষ করে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৩১ সালের সরকারী আদমসুমারির বিবরণীতে মিঃ হাটন্ লিখেছিলেন, "জন্মহার ও সম্পদের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা নেতিবাচক।" তিনি আরো লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষ চীন ও রুশিয়ার জন্মহার যে বেশী তাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক বা ধর্ম্মগত কারণে সরকার যদি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-ও করেন তা হলেও জন্মনিয়ন্ত্রণের সাফল্য বেশ কিছু পরিমাণে শিক্ষা, পরিমাপক্ষমতা এবং সাধারণ একজন ভারতীয়ের পক্ষে যা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য সেই যান্ত্রিক সাজসরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং, ভারতের জন্মহার হ্রাস করতে হলে তার পূর্ব্বে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন আবশ্যক। একথাও অবশ্য সত্য যে, জন্মহার হ্রাসপ্রাপ্ত হলে জীবনধারণের মানও উন্নত হবে, কিন্তু এ কথা বলা, অন্ততঃ ভারতবর্ষের ব্যাপারে, ঘোড়ার সাম্‌নে গাড়ী জোতারই সামিল।

বৃটিশ সরকারের আদমসুমারি অনুসারে ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ, ১৯৪১ সালে লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষতে। অর্থাৎ, দশ বৎসরের মধ্যে ৫ কোটি লোক বেড়েছে। ভারতের মূল সমস্যা এইখানেই।

উপর্য্যুপরি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণকালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে যখন অভূতপূর্ব্বভাবে শিল্পের প্রসার এবং দেশব্যাপী বিরাট নূতন নগর ও কারখানার পত্তন হচ্ছে তখন প্রতি বৎসর সেখানে মাত্র ১০ লক্ষ করে নূতন লোককে কর্ম্মনিযুক্ত করতে হয়েছে। কিন্তু যেখানে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ করে লোক বাড়ে, সেখানে সাম্প্রতিক কয়েক দশকের মধ্যে শিল্পের যা প্রসার হয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য।

১৯৩৩ সালে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তাতে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস্-এর ডিরেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল স্যার জন মেগ' লিখেছিলেন, "এ কথা পরিষ্কার যে, জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন যে-হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ইতিমধ্যেই তাকে ছাড়িয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটানো না হলে এর ফলে জীবন-যাত্রার বর্ত্তমান অবনত মান অবনততরই হতে থাক্‌বে। এর ভবিষ্যৎ পরিণতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মেগ' যে নৈরাশ্যময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পরবর্ত্তীকালীন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তা যথার্থ বলেই প্রমাণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই অবনত হচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ইস্পাত ও অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল বটে, কিন্তু ভারতের মোট শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ নেমে যায়।

ভারতবর্ষে আমি বৃটিশ সরকারের কিছু নথিপত্র এবং কিছু সরকারী বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহ করেছিলাম, পরে সেগুলিকে আমি প্রকাশিত করেছি। এগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে শিল্পপ্রসারকে বাধাদানই করেছেন। নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমি জেরুজালেমে অবতরণ করেছিলাম। সেখানকার বন্ধুদের আমি এ-কথা বলি। তাতে তাঁরা বল্‌লেন যে, প্যালেষ্টাইনেও বৃটিশ সরকারের ঐ একই নীতি। উপনিবেশগুলিকে কাঁচামাল এবং আধা-তৈরী মালের ক্ষেত্র করে রাখাই সাম্রাজ্যবাদী নীতি, সর্ব্বত্র। 'ফরচুন' পত্রিকার পরলোকগত রেমণ্ড লেসলী বুয়েল লিখেছিলেন, "মার্কিণ-বিপ্লব প্রধানতঃ হচ্ছে সওদাগরী অর্থগৃধ্নুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; নৌচালন, গুড়, চিনি এবং শুল্ক সম্পর্কীয় আইনগুলির মাধ্যমে যে শোষণ চালানো হতো, মার্কিণ-বিপ্লব তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বৃটিশ বণিকদের অর্থবৃদ্ধির সরাসরি সম্ভাবনা না থাক্‌লে সেক্ষেত্রে বৃটেন বানিজ্য, পণ্যোৎপাদন-

প্রণালী এমন কি ভূমি উন্নয়নের ব্যাপারেও উপনিবেশগুলির অধিকার অস্বীকার করে এসেছে।" ১৭৭৬ সালের টোরী-দৃষ্টিভঙ্গী এখনও বর্ত্তমান। যতটুকু না বদ্‌লালেই নয়, সাম্রাজ্যবাদের মাত্র ততটুকু বদ্‌লায়। সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক প্রগতির প্রতিবন্ধক।

ভারত, চীন—নামমাত্র স্বাধীনতা সত্ত্বেও চীনকে এখনো আধা-উপনিবেশ বলা যায়—এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশের সঙ্গে লাটিন আমেরিকার অধিকাংশ অঞ্চলকে যুক্ত করলে দেখা যাবে যে, অর্থনৈতিক দিক্ থেকে তা একটা মরুভূমিরই সামিল। এই মরুভূমিতে দেড়শত কোটি লোকের বাস। এরা খেতে পায়না, পরতে পায়না। এদের মাথা গুঁজবার ঠাঁইও নেই। এদের উৎপাদন এবং ক্রয়ক্ষমতার মান অত্যন্ত নীচু। মানবজাতির তিন-চতুর্থাংশ এরাই। বাকী চতুর্থ অংশকেও এরা টেনে নামাচ্ছে।

প্রাচ্যদেশগুলি এই অতলস্পর্শ খাদে নিমজ্জিত হয়ে থাক্‌বার ফলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আত্মিক দিক্ থেকে পাশ্চাত্ত্য-জগৎকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। দরিদ্র, রুগ্ন এবং অপরাধীরা যে কোনও সমাজেই সকলের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীও একটি সমাজই।

যুদ্ধকালে মানবসমাজ যে পরিমাণে উৎপাদন বাড়িয়েছিল, সেই পরিমাণে দ্রব্যোৎপাদন সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও, পৃথিবীতে যে আজ কোটি কোটি নরনারী এবং শিশুকে বেকার, বুভুক্ষু এবং আশ্রয়হীন হয়ে কাটাতে হচ্ছে—এ ব্যবস্থা সুস্থ মস্তিষ্কপ্রসূত নয়; এ ব্যবস্থা অসুস্থ, অপরাধমূলক, খৃষ্টীয় আদর্শবিরোধী এবং গণতন্ত্রবহির্ভূত।

যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতির সুযোগ গ্রহণ করলে আমরা যে-পথে বাঁচতে পারতাম তার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারার সামঞ্জস্যবিধানের প্রশ্নটিই হল এ যুগের মহাজিজ্ঞাসা। অনাবিষ্কৃত বহু ঐশ্বর্য্য এখনও ভূগর্ভে নিহিত রয়েছে। যদি আরো প্রয়োজন থাকে, তবে সৃষ্টির

যাদুবলে সমুদ্রজল, সামুদ্রিক উদ্ভিদ, কয়লাগুঁড়ো এবং বালির মধ্যেই সে ঐশ্বর্য্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বিদীর্ণ পরমাণু অকল্পণীয় সম্পদের সন্ধান দেবে আমাদের। এই সম্পদকে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিতে রূপান্তরিত করবার জন্য অফুরন্ত শ্রমিক রয়েছে, প্রতিটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। জনবল, উদ্ভাবনীশক্তি এবং উপাদানের অফুরন্ত প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও যে সভ্যতা দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এবং নিরক্ষরতাকে মেনে নেয় সে সভ্যতা প্রহসনেরই নামান্তরমাত্র।

শতাব্দীগুলির অতিরিক্ত পরমায়ুতেই যতো গলদ। শতাব্দী অতীত হয় বটে, কিন্তু তার ভাবধারা, তার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কাঠামো এবং তার নৈতিক মান বেঁচে থেকে আমাদের জীবনকে কলুষিত করে তোলে। বিজ্ঞান আমাদের একবিংশ শতাব্দীর আভাষ দিয়েছে। প্রাচুর্য্য এবং স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি তার হাতে। মানুষকে সে অভিকর্ষ ও স্থানের গণ্ডীবদ্ধতা থেকে মুক্তির আশ্বাস জানিয়েছে। অথচ যে যুগে বাষ্পীয় কল, বিদ্যুৎ অথবা বিমান আবিষ্কৃত হয়নি—রাজনীতি এখনও সেই প্রাচীন যুগসীমাতেই আবদ্ধ। মধ্যযুগীয় পঙ্কে নিজেকে নিমজ্জিত করে রাজনীতি মানুষকে অভাব ও ভয়ের দাসত্বে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। ভৌগোলিক সীমারেখা, জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের ভিত্তিতেই রাজনীতিকরা শান্তি স্থাপন করেন।

বিজ্ঞান যতখানি অগ্রসর হয়ে এসেছে রাজনীতিরও আজ ততখানি অগ্রসর হয়ে আসা প্রয়োজন। নইলে, বিজ্ঞানশক্তির ওপর সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায়, বিজ্ঞান এই পৃথিবীকে চূর্ণবিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবে।

জীবন ভারতবর্ষকে যা দিতে পারতো এবং কার্য্যতঃ যা দেয় তার প্রকট ও তুমুল পার্থক্যের মাপকাঠিতেই ভারতবর্ষের হতাশা, নিরানন্দ এবং অসন্তোষের যথার্থ পরিমাপ করা যেতে পারে। ভারতবাসীরা

সমগ্র মানবজাতির একপঞ্চমাংশ। সমগ্র মানবজাতির অর্দ্ধাংশই এশিয়ার অধিবাসী। গত পঞ্চাশ বৎসরে এশিয়ার লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এশিয়া আজ জাগ্রত। সেও স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং মর্য্যাদা দাবী করে। মানুষেরই তৈরী কতকগুলো প্রতিবন্ধক না থাক্‌লে এশিয়ার শতকোটি এবং অন্যান্য অঞ্চলের আরো কোটি কোটি লোক যে আশীর্ব্বাদের অংশ নিতে পারতো—তা যতক্ষণ তারা না পারছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক দিক্ থেকে পৃথিবীর অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আস্‌তে পারেনা।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ধর্ম্মগত—সমস্ত সমস্যাকেই একমাত্র তার নিঃস্বতা এবং বাধাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক বিকাশের কলঙ্কিত পটভূমিতেই উপলব্ধি করা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে এত দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অনগ্রসরতাই তার কারণ। ভারতীয় সহরগুলিতে কর্ম্মসংস্থানের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় সরকারী চাকুরীগুলিই সেখানে কর্ম্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস। সরকারী চাকুরীলাভের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা চলে; বৃটিশদের একটি বিরাট আই-সি-এস বাহিনীর প্রয়োজন ব'লে বহু ভারতীয় এতে রয়েছেন। বৃটিশদের ভারতশাসনব্যবস্থাও অলৌকিক; তাঁদের সরকারের অস্তিত্ব চর্ম্মচক্ষে ধরা পড়েনা বল্‌লেই চলে। বড়লাটের গোপনীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী স্যার জন থর্ণের সঙ্গে আমি এক ভোজসভায় মিলিত হয়েছিলাম; সেখানে আমি তাঁর কাছে ভারতের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত বৃটিশ কর্ম্মচারীদের সংখ্যা জান্‌তে চাই। তাতে ১৯৪২ সালের ১৩ই জুলাই তিনি আমাকে লেখেন যে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে পাঁচ শ' তিয়াত্তর জন বৃটিশ রয়েছেন; ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে যে বৃটিশ অফিসাররা রয়েছেন তাঁদের সংখ্যা তিন শ' ছিয়াশী,—তা ছাড়া যে সমস্ত সাধারণ বৃটিশ কর্ম্মচারী রয়েছেন তাঁদের সংখ্যা সাড়ে চার শ'র

বেশী নয়। স্যার জন লিখেছিলেন, যে ক'জন ইংরেজ ভারতের শাসনকার্য্য চালাচ্ছেন তাঁদের "মোট সঠিক সংখ্যা চৌদ্দ শ' বলেই ধরা যেতে পারে।" বৃটিশ নৌ ও স্থলবাহিনী এবং, অতোটা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, বৃটিশ ব্যবসায়ও বৃটিশ শক্তিরই প্রতিনিধি। তা হলেও, আসলে ঐ চৌদ্দশ' বৃটিশই সরকারী শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন,—বাকী সব ভারতীয়।

আই-সি-এস এবং শাসনসংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগে বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার ভারতীয়কে ভর্ত্তি করে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেণী এবং সর্ব্বধর্ম্মের লোকই রয়েছেন—তবে সংখ্যায় হিন্দুরাই বেশী। ভারতবর্ষে এর কারণ হিসেবে সাধারণতঃ শুনতে পাওয়া যাবে যে, হিন্দুদের ধীশক্তি তীক্ষ্ণতর এবং তাদের শিক্ষার মানও উন্নততর। আমার মতে, এর কারণ অন্য। বৃটিশরা ভারতবর্ষে এসে ভারতের মুসলমান শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করেন। বিশেষতঃ, ১৮৫৭ সালের বিরাট বিদ্রোহে মুসলমানরাই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় এর পর বৃটিশরা মুসলমানদের সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। সুতরাং বৃটিশ সরকারের চাকুরীতে মুসলমান-নিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহের অভাব ঘটলো। কোরাণে কুশীদগ্রহণ নিষিদ্ধ; তা ছাড়া আরো নানা কারণে মুসলমান সম্প্রদায় তেজারতী, শিল্প-উৎপাদন ও ব্যাপকতর বানিজ্যক্ষেত্র পরিহার করায় সেগুলিতে হিন্দুদেরই একাধিপত্য স্থাপিত হলো। তারি ফলে, মুসলমানরা হয় বড় জমিদার, নয়তো সাধারণ কৃষক। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদের মধ্যে নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্বই নেই।

নাগরিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনী হিন্দু ও পার্শী শিল্পপতিরা দেখলেন যে, বৃটিশরা তাদের অর্থনৈতিক দিক্ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সামাজিকভাবে কোনঠাসা করে রাখছে। কাজে কাজেই তাঁরা ভারতের মুক্তিকামী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে

দাঁড়িয়ে তাকে আর্থিক সাহায্য করতে লাগলেন। কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলিম ধীমানদের মধ্যে অধিকাংশেরই সহানুভূতি অর্জ্জন করলো।

হিন্দু মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণী বৃটিশবিরোধী হয়ে দাঁড়াবার ফলে, বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই বৃটিশরা মুসলমানদের তোয়াজ সুরু করে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের প্রতিযোগিতা ও হস্তক্ষেপের অবসান ঘট্‌লে হিন্দু পুঁজিপতিদের ফেঁপে ওঠা সম্ভব হবে বলেই তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতা চান। ওদিকে মুসলমান জমিদারদের আশঙ্কা যে, ভূমিব্যবস্থার সংস্কারই হবে স্বাধীন ভারতের প্রথম কাজ; তাতে তাঁদের ভূমিস্বত্ব এবং সম্পদের ক্ষতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। এই-জন্যেই মুসলিম উচ্চশ্রেণী স্বাধীনতার জন্য আগ্রহান্বিত নন। মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নার মুসলীম লীগ এই উচ্চশ্রেণীর জমিদার দিয়েই বোঝাই।

মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শতকরা হারে সরকারী চাকুরীগুলির কিছু অংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে—তা তাঁরা যদি হিন্দু প্রার্থীদের অপেক্ষা কম যোগ্য হন—তবুও। ১৯০৯ সালে বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বা ধর্ম্মের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনপ্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিপ্রেরণের ব্যাপারে হিন্দুরা কেবলমাত্র হিন্দু প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারে, মুসলমানরা মুসলমান প্রার্থীকে, অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। এ প্রথা মুসলমান রাজনীতিকদের ক্ষমতালিপ্সাতেই ইন্ধন যোগালো, মুসলমানদের ঐক্যবর্দ্ধনকে দৃঢ়তর করলো এবং ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে ব্যবধান ছিলো তাকে আরও বড় করে তুল্‌লো।

সহরাঞ্চলে নবোদ্ভূত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রাচীন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা সুরু করলো। রাজনীতিক্ষেত্রে

মুসলমানদের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যেই বৃটিশরা মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। এতে হিন্দুরা আরও বেশী বৃটিশবিরোধী হয়ে উঠলো; হিন্দু-মুসলিম বৈরীভাবও তীব্রতর হয়ে দাঁড়ালো এর ফলে।

বড়লাট স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল, প্রধান প্রধান যে সমস্ত বৃটিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি তাঁরা, জিন্না, গান্ধী, নেহেরু, কংগ্রেসের মুসলমান সভাপতি আজাদ—প্রকৃতপক্ষে যাঁদেরই সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকেই আমাকে দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই; আর, ভারতবর্ষের শতকরা নব্বুই ভাগই হলো এই গ্রাম। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা মানুষেরই তৈরী, এ সমস্যা সহরের; কর্ম্মসংস্থানের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা যেখানে নেই এই সমস্যায় সেই সহরজীবনই প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

জিন্না আমাকে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের শতকরা ৭৫ জনই কয়েক শ' বছর পূর্ব্বেও ছিলেন হিন্দু, বিজয়ী মুঘলরা তাঁদের ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। নেহেরুর কাছে শুনেছি যে, তাঁদের শতকরা ৯৫ জনই হিন্দু ছিলেন। সে যাই হোক্ না কেন, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় সমগ্র অংশই জাতিগতভাবে একই মূল থেকে উদ্ভূত। চেহারা ও ভাষার দিক থেকে বাঙালী হিন্দু এবং বাঙালী মুসলমানের মধ্যে কিছুমাত্রও পার্থক্য ধরা যাবে না। জাতিতত্ত্বের বিচারেও দেখা যাবে যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র অথবা সুইজারল্যাণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষ ঢের বেশী একজাতিক; বোধ হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের থেকেও।

ভারতীয় জীবনধারায় ধর্ম্মের স্থান অনেকখানি। তবু, হিন্দুরা গোপূজা ও মুসলমানরা গোভক্ষণ করা সত্ত্বেও, গ্রামাঞ্চলে এই দুই ধর্ম্মের বিরোধ অতি সামান্যই। সহরে এসে এ বিরোধ ঘনীভূত হয়;

গোঁড়া হিন্দুদের খাদ্যাখাদ্যবিচার থেকে যে বিচ্ছেদের আরম্ভ এবং প্রাক্‌বিবাহ ও বিবাহকালীন আচার থেকে যে পার্থক্যের সূচনা—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে তা আরও ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। জীবনের দরোজায় দাঁড়িয়ে যুবকরা যদি শিল্পক্ষেত্রে কর্ম্মসংস্থানের আরো ব্যাপক সুযোগ পেতেন—তা হলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের প্রতিযোগিতা এত তীব্র হয়ে দাঁড়াতো না।

নবোদ্ভূত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে মুসলমান রাজনীতিকদের সাম্‌নে নতুন পথ খুলে গেল। মোহাম্মদ আলী জিন্না কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসে সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরই স্থান রয়েছে; এ জন্যে কংগ্রেসই হলো ভারতবর্ষের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল। অন্যান্যদের, যথা—হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগ—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাক্‌লেও সেগুলি ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানমাত্র।

১৯৪২ সালে মুসলীম লীগের সদস্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন জমিদার। সহরগুলিতে হিন্দু-মুসলীম বিরোধ দানা বেঁধে উঠ্‌ছিলো; সেইসঙ্গে বৃটিশ সরকারের সাহায্যে মিঃ জিন্না যখন তাঁর স্বধর্মী মুসলমানদের চাকুরী করে দেওয়ার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিলেন—তখন সামাজিক চাপ এবং স্বর্থের খাতিরে বহু গোঁড়া এবং বুদ্ধিজীবী মুসলমানই কংগ্রেসে যোগদানে বিরত রইলেন। তবে একই সময়ে তাঁরা দেখলেন যে, লীগের বড় বড় জমিদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। মুসলমান কৃষকসম্প্রদায়ও জমিদারদের সঙ্গে তাদের বিরোধ ভুলে গিয়ে লীগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারলনা।

শুধুমাত্র ধর্ম্মগত ঐক্য দিয়ে যখন মুসললান সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিরোধ মুছে ফেলা গেলনা, জিন্না তখন এমন একটি উপায় খুঁজতে লাগলেন য্যাতে মুসলমান জমিদার, কৃষক এবং নাগরিক

মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একসূত্রে বেঁধে দেওয়া যাবে। তিনি দেখলেন, সে উপায় জাতিবাদ। ১৯৪০ সালে জিন্না সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় মুসলমানদের একটি জাতি বলে ঘোষণা করে তাদের লক্ষ্যহিসেবে 'জিয়ন'-এর মত স্বতন্ত্র এক বাসভূমি দাবি করলেন। তিনি এর নামকরন করেছেন পাকিস্থান; এতদ্‌সম্পর্কিত পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাংলা এবং আসামকে নিয়ে পাকিস্থান গঠিত হবে। প্রথম পাঁচটি প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, তবে আসামে তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ।

ধর্ম্ম এবং জাতীয়তাবাদ একত্রিত হলে তা বড় সাংঘাতিক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়; এ যোগাযোগের ফলে জিন্না আরও বেশী জনসমর্থন পেলেন। ১৯৪২ সালের ক্রীপ‌্স্ প্রস্তাবে পাকিস্থান-দাবীর বৈধতা স্বীকৃত হওয়ায় জিন্নার পালে হাওয়া লাগলো।

মোহাম্মদ আলী জিন্না ভারতবর্ষের ৯ কোটি ৯২ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে প্রধানতম পুরুষ। বোম্বাইর সমুদ্রোপকূলে এক জমকালো প্রকাণ্ড বাড়ীতে তিনি থাকেন। বাড়ীর ছাদটিও বিরাট—শ্বেতপাথরের তৈরী। তাঁর আকৃতি দীর্ঘ, অত্যন্ত কৃশ; মুখমণ্ডল সুন্দর, শীর্ণ; দাঁতগুলি খারাপ, ছোপ-ধরা। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারে সময় তিনি ঘাস-রঙা আচ্‌কান এবং সাদা আঁটো চোস্ত্‌-পাজামা পরে ছিলেন, অস্থিসার পায়ের সঙ্গে তা এঁটে রয়েছে। পায়ে কালো পেটেণ্ট্ চামড়ার পাম্প্‌স্; মোজা নেই। সূতোয় বাঁধা একটি মনোক্‌ল্ ঝুলছিল। ভারতীয়েরা তাঁকে কর্ম্মদক্ষ এবং অনড় বলে মনে করেন।

তাঁর যুক্তি এই:—মুসলমানরা চিরকালের জন্যে সংখ্যালঘু হয়ে থাক্‌তে চায়না, তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চায়। এ-কথা অবশ্য সত্যি যে, অধিকাংশ মুসলমানই আগে হিন্দু ছিল; কিন্তু ইস্‌লাম

হলো জীবনচর্য্যারই একটি নির্দ্দিষ্ট পথ। লক্ষ্য করুন যে, মুসলিম বেশভূষা, স্থাপত্য শিল্পকলা, খাদ্য এবং ভাষা এ সবই হিন্দুদের থেকে পৃথক। মুসলিম-ভারতকে অতি অবশ্যই হিন্দু-ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে; তাই হবে পাকিস্থান।

আমি বল্লাম—পার্থক্যকে আর না বাড়িয়ে তাকে কমিয়ে আনাই তো সভ্য মানুষের কর্ত্তব্য। উত্তরে তিনি বল্লেন, "আমি বাস্তববাদী, প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান নিয়েই আমার কারবার, কি করা আমাদের কর্ত্তব্য তা নিয়ে নয়।"

অবাধ সুবিধায় ভারতশাসনের জন্যে ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে ভেদসৃষ্টি করাই যে বৃটিশ নীতির উদ্দেশ্য জিন্না সে কথা স্বীকার করলেন। তিনি বল্লেন, বৃটিশরা ভারতের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার যথেস্ট ক্ষতিসাধন করেছে।

এর তিন দিন পরে আমি আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। জিন্না বল্লেন যে, ক্রীপস্-পরিকল্পনায় দেশবিভাগ ও পাকিস্থানের নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে বটে, তবে কার্য্যক্ষেত্রে "একমাত্র সিন্ধু আইনসভাই দেশবিভাগের অনুকূলে ভোট দেবে! উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কংগ্রেসের প্রভাবাধীন, পাঞ্জাব আইনসভাও দেশবিভাগের পক্ষে ভোট না দিতে পারে। সুতরাং নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে বটে, তবে তার পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়।"

আমি মন্তব্য করলাম, "অর্থাৎ বৃটিশ সরকার আপনাকে পাকিস্থান দিলেননা, এবং বহু মুসলমানও এর বিরুদ্ধে। এখন আপনি চান যে, গান্ধী আপনাকে পাকিস্থান দেবেন।"

তিনি বললেন, "গান্ধী তা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মুসলমানরা পৃথক হয়ে যেতে চাইলে কেউই তাদের আটকাতে পারেনা'। এখন হিন্দু ও মুসলমানরা পাকিস্থান সম্পর্কে

একমত হলেই আমরা তা পাই। আমরা প্রতিবেশী হবো—হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান। তা হবে বৃটিশ কমনওয়েলথেরই দুটি ডোমিনিয়ন।”

জিন্না প্যান-ইসলামবাদ অর্থাৎ মরক্কো থেকে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক মুসলীম সাম্রাজ্যগঠন পরিকল্পনার সমর্থন করেন। তাঁর ধারণা, প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে এ পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করতে বেগ পেতে হবে।

নেহেরু ও গান্ধী সম্পর্কে জিন্না উগ্রভাবে অনেক কথাই বল্‌লেন। তিনি বল্‌লেন, “হোমরুল সোসাইটীতে নেহেরু আমার অধীনে কাজ করেছেন; গান্ধীও। হিন্দু-মুসলীম ঐক্যই ছিল আমার লক্ষ্য। ১৯০৬ সালে আমি কাজ সুরু করেছি। আমি কংগ্রেসে ছিলাম। মুসলীম লীগ সংগঠিত হবার পর আমার মনে হয় যে, তাতে স্বাধীনতা অর্জ্জনের সুবিধাই হবে। এ জন্য, কংগ্রেসকে আমি এ সম্পর্কে উৎসাহিতই হতে বলেছিলাম। ঐক্যভাব ফুটিয়ে তুলবার জন্য ১৯১৫ সালে আমি কংগ্রেস ও লীগকে একই সময়ে বোম্বাইতে সম্মেলন আহ্বান করতে রাজী করি। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ ঐক্যের বিপদ বুঝতে পেরে বলপূর্ব্বক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন ভেঙে দেন; তবে উভয়ের রুদ্ধদ্বার অধিবেশন চল্‌তে থাকে। ১৯১৬ সালে আমি আবার লক্ষ্ণৌতে এ দুটি প্রতিষ্ঠানকে মিলিত করি; সেখানে হিন্দু-মুসলীম সহযোগিতার ভিত্তিতে লক্ষ্ণৌ-চুক্তির খসড়া প্রস্তুত হয়। গান্ধী পাদপ্রদীপের সম্মুখে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২০ সাল অবধি, এইভাবেই চল্‌ছিলো। তারপরেই অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝলাম যে, ঐক্যের আশা সুদূরপরাহত। গান্ধী তা চাননা। আমার আশাভঙ্গ হলো; স্থির করলাম যে, ইংলণ্ডেই থেকে যাবো। বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্যেও আমি ভারতে ফিরে আসিনি; এজেন্টের মারফৎই আমি

তা করি। প্রীভি-কাউন্সিলে আমি আইন-ব্যবসায় সুরু করলাম এবং অভাবিতভাবে আমার পসারও হলো। ভারতে ফিরে আসবার কোনও ইচ্ছাই আমার ছিলনা। কিন্তু প্রতি বৎসরই ভারত থেকে বন্ধুবান্ধবরা এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ভারতের অবস্থা আমাকে জানিয়ে সে সম্পর্কে আমি যে কতখানি করতে পারি তাও তাঁরা আমাকে বল্‌তে লাগলেন। অবশেষে আমি ফিরে আসতে সম্মত হলাম।" উপসংহারে জিন্না বললেন, "গান্ধী যে স্বাধীনতা চাননা আপনাকে তা বোঝাবার জন্যেই আমাকে এত কথা বলতে হলো। বৃটিশরা চলে যাক্ এ তিনি চাননা। তিনি চান হিন্দুরাজ। সর্ব্বাগ্রে তিনি হিন্দু।"

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলীম লীগের লাহোর-অধিবেশনের সভাপতিরূপে জিন্না যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন—তাজমহল হোটেলে আমার ঘরে ফিরে এসে আমি তা পড়ে দেখলাম। তাতে তিনি বলেছিলেন, "কাউকে খুব বেশী বিশ্বাস না করাই বিজ্ঞজনোচিত কাজ।"

জিন্নার অন্যান্য কয়েকটি বক্তৃতা এবং তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ডন'ও আমি পড়ে দেখ্‌লাম। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করে তিনি তুচ্ছ বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি নূতন অথবা মহৎ কোন চিন্তার অবতারণা করেনইনা। নূতন কোনও পথেরও তিনি সন্ধান দেননা। তাঁর পুঁজি সামান্য, তিনি অল্পমতি ব্যক্তি। তাঁর একটি-মাত্র কথা—মুসলমানরা পাকিস্থান চায়। অথচ, পাকিস্থানকে তিনি ইসলামের নব জাগরণ অথবা সাংস্কৃতিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে কোনও নূতন এবং মহান পদক্ষেপের সূচনা হিসেবে দেখাননি। কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্থান গঠিত হবে বা তা কী পদার্থ হবে সে সম্পর্কেও তিনি সঠিক কোনও কথা উচ্চারণ করেন না। তিনি শুধু দর-কষাকষি করেন আর বলেন: আমার দাবী আধাআধি মেনে না নেওয়া পর্য্যন্ত পাকিস্থান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমি আপনাদের কিছুই

বলব না। তিনি রাজনৈতিক বানিয়া মাত্র—রাষ্ট্রনীতিবিদ্ নন্। "শাসনতন্ত্র এবং আইনের দিক থেকে"—এই কথাটিকে তিনি প্রায়ই ব্যবহার করেন এবং এর থেকে তাঁর চরিত্র অনুধাবন করা যাবে। তাঁর দক্ষতা আছে, পরিসর নেই।

জিন্নার সঙ্গে আমার পাঁচ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হয়। কথা বলার সময় তাঁর মতামত সম্পর্কে তিনি আমাকে প্রতীত করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে কোনও প্রশ্ন করে আমার মনে হচ্ছিলো যেন গ্রামোফোন রেকর্ড চালিয়ে কথা শুনছি। সে কথা হয় আমি পূর্ব্বেই শুনেছি, নয়তো মুসলীম লীগের তথ্য পুস্তকাদি থেকে সে কথা জানতে পারতাম। গান্ধীকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করে মনে হয়েছে যেন কোনও সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে আমি চালু করে দিলাম। তাঁর মন কাজ করে যাচ্ছে—তা যেন আমি দেখ্তে পেতাম, শুনতে পেতাম। জিন্নার ক্ষেত্রে গ্রামোফোন-পিনের আঁচড়টুকুর পর্য্যন্ত শব্দ শোনা যেতনা। জিন্না আমাকে শুধু সিদ্ধান্তটুকু দিতেন, আর কিছু নয়। গান্ধী আমাকে বুঝতে দিতেন যে, তিনি সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার যেন মননমার্গের এক উত্তেজনাপূর্ণ বিচিত্র অভিসার। জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকার অত্যন্ত নীরস—তা যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেও হয়—তবু।

জিন্না মুসলমানদের উকীল মাত্র, তাদের নেতা নন। তাদের কথা তিনি একনাগাড়ে এবং নিপুণভাবেই উত্থাপিত করে আসছেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে মহান প্রাণৈশ্বর্য্য এবং আন্তরিকতা রয়েছে জিন্নাকে দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। মুসলমানদের প্রতি আকৃষ্ট হবার মতো অনেক কিছুই রয়েছে; নানাদিক্ দিয়ে তারা মস্তিষ্কপ্রধান হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয়। তারা উদ্যমশীল, তারা জীবনকে ভালবাসে; তাদের সঙ্গীত এবং কাব্য রয়েছে। কিন্তু জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেউ তা বুঝবেন না।

নয়াদিল্লীতে 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্‌'-এর সম্পাদক ও মহাত্মাজীর পুত্র দেবদাস গান্ধীর বাড়ীতে আমার সঙ্গে অপর একজন মুসলমান ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর নাম খান আবদুল গফুর খান—'সীমান্ত-গান্ধী' নামেই সুপরিচিত। ইনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান-নেতা, জিন্নাবিরোধী এবং গান্ধীপন্থী। যে বিরাট সংখ্যক মুসলমান চাষী তাঁর এলাকায় কংগ্রেসকে সমর্থন করে, তিনিই তাদের সংগঠক। ভারতবর্ষের যে ক'জন ব্যক্তি গভীরভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছেন—শারীরিক মানসিক এবং আত্মিক দিক থেকে তিনি তাঁদের অন্যতম। দৈর্ঘ্যে তিনি ছ-ফুটেরও অধিক, তাঁর দেহ বলিষ্ঠ; মাথার গড়ন লম্বাটে গোল এবং দৃঢ়। মাথায় ছোট ছোট কাঁচাপাকা চুল, মুখও কাঁচাপাকা ছাঁটাদাড়িতে ঢাকা। তাঁর বয়স ষাট বছরের ওপরে; অথচ তাঁর কালো উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখদুটিকে ত্রিশ বছরের যুবকের চোখ বলে মনে হবে। তবে মনের উপর তিনি যে ছাপ ফেলে যান সে তুলনায় তাঁর আকৃতি দশভাগের একভাগ মাত্র। তিনি মুখ খুলবার আগেই আমি তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলাম। পেশোয়ারের এক গ্রামে তাঁর বাড়ী; সেখানে তিনি কৃষকদের মতই জীবনযাপন করেন। তাঁর পিতা এবং তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সে ধনসম্পত্তি তিনি পরিহার করেন। তিনি একটি ফ্যাকাসে নীল-রঙা ঝুল-কোর্তা এবং ঢোলা সালোয়ার পরে ছিলেন; এ সালোয়ার সীমান্তের পাঠানদের বৈশিষ্ট্য। খদ্দরের কোর্তাটির রঙ, ধুয়ে মুছে গেছে, তার উপরে ঘাড়ের কাছে তালি-দেওয়া। তাঁর হাত দুটি দীর্ঘ, ধব্‌ধবে সাদা—পা সুগঠিত। আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করে তিনি তাঁর হাতখানি বুকে ছোঁয়ালেন।

জিন্নার পাকিস্থান সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি—একথা জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিলেন, "আমার এদেশে যারা পাকিস্থানকে সমর্থন

করে তাদের দিয়েই আমি এর বিচার করি। সেখানে ধনী খান, বিত্তশালী নবাব ও প্রগতিবিরোধী মোল্লারাই পাকিস্থানের সমর্থক। যে মুসলমানদের হাতে চাষী সম্প্রদায় নিপীড়িত—পাকিস্থান শুধুমাত্র তাদেরি শক্তি যোগাবে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "এতে কি ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি হবে?"

উত্তরে তিনি সক্রোধে বললেন, "জিন্না অতি নিকৃষ্ট মুসলমান; তিনি পয়গম্বরের নিষ্ঠাবান অনুসারী নন।"

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, প্রতিদিন আমি মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ি। ঈশ্বরের একনিষ্ঠ সেবকের মতই আমি জীবনযাপন করি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আমাদের আন্দোলনের নাম খুদাই-খিদমৎগার আন্দোলন। তার অর্থ ঈশ্বরের সেবক। এ আন্দোলনকে কখনো কখনো লালকোর্ত্তা আন্দোলনও বলা হয়। তবে আমাদের ভাবনাধারণার সঙ্গে লাল রঙের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা চাই উদার শিক্ষা এবং মহত্তর আদর্শ। তিন বৎসর পূর্ব্বে আরও অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করায় বৃটিশ সরকার আমাকে কারারুদ্ধ করেন; মোল্লারাও আমার বিরোধিতা করেছিলেন।"

তিনি আমার সঙ্গে ইংরিজীতে কথা বলছিলেন এবং প্রত্যেকটি শব্দই তিনি সাবধানে বেছে বেছে ব্যবহার করছিলেন। সুদূর ভারতবর্ষের দুরান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্যাঞ্চলের এই মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার, এবং পরমুহূর্ত্তেই আমাদের এই ঘনিষ্ঠতাবোধ—একে যে আমার কী বিচিত্র বলে মনে হলো! মহাত্মা গান্ধীকে যদি ভারতবর্ষের মৃত্তিকার, তার বালুরাশির প্রতীক বলি, তবে গফুর খানকে তার পাহাড়ের, তার শৈলশিখরের, তার প্রবল বন্যার প্রতীক বলতে হয়।

ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্ত্তী উপজাতীয় অঞ্চলসমূহের

জঙ্গী আফ্রিদী এবং ওয়াজিররা বৃটিশের বিরুদ্ধে, এবং নিজেদের মধ্যেও যে যুদ্ধবিগ্রহ চালাচ্ছিলো তা থেকে তাদের বিরত করবার উদ্দেশ্যে সেখানে যাওয়ার জন্যে তিনি একবার বৃটিশ সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, গান্ধীজীর শান্তি-বাণী দিয়ে তাদের জয় করা যাবে। তিনি বল্‌লেন, "তাতে তাদের মধ্যে আমার প্রতিপত্তি বাড়তে পারে এই ভয়ে বৃটিশ সরকার আমাকে অনুমতি দেননি।"

তিনি আরো বল্‌লেন—"আমার অঞ্চলের লোকরা গান্ধীজীর প্রতি আস্থাশীল; তার কারণ গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা চান।"

জিন্না মুসলমান চাষীদের বোঝান যে, তারা শুধুই মুসলমান, মুসলমানদের একটি পৃথক জাতিহিসেবে গড়ে তোলাই তাদের কর্ত্তব্য। গফুর খান, নেহেরু এবং অন্যান্যরা তাদের বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা চাষী, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে মুসলমান এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয়। হিট্‌লার জার্ম্মানদের বুঝিয়েছিলেন যে, তারা শুধুই জার্ম্মান। তিনি ভেবেছিলেন যে, এই জাতীতায়বাদ শ্রমিকদের মন থেকে উচ্চতর শ্রেণীর প্রতি তাদের বিদ্বেষকে মুছে ফেলে তাদের শুধুমাত্র অন্যান্য জাতি, যথা প্রথমে জার্ম্মানীরই ইহুদী এবং পরে সমগ্র বিশ্বের প্রতিই বিদ্বেষপরবশ করে তুলতে পারবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে জিন্না যে জাতিবাদের ধুয়া তুলেছেন তাও সমান পরিমাণেই বিপজ্জনক।

গান্ধীজীর স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ব্যাহত করবার উদ্দেশ্যে তার উল্টোদিকে ভারসাম্যবিধানের জন্য বৃটিশ সরকার দিনকতক জিন্নাকে তোষণ করে তাঁকে শক্তি যুগিয়ে চললেন। সাম্রাজ্যের সঙ্কটকে তাঁরা প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন; তাতে সমগ্র এশিয়ার জন্য নতুন এক সঙ্কট সৃষ্টি করতেও তাঁদের আটকায়নি।

গান্ধীজীর মতে ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও হিন্দুস্থানে বিভক্ত

করবার কথা বলা পাপ-উক্তি। বাস্তব ভাষায় তাকে বেকুবীই বলতে হয়। আয়তনে কিছুটা বড় হলেও পাকিস্থান নতুন এক দরিদ্র ইরাণ বা ইরাকেরই সামিল হবে। ভারতবর্ষকে দুই পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করার অর্থ সমগ্র জগতে অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করা। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি আজ ইউরোপের দুর্ব্বল দেশগুলিতে এবং চীনে যেভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ছলচাতুরী চালাচ্ছে, দেশবিভাগ ও সংঘর্ষের ফলে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে ভারতবর্ষও শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির অনুরূপ এক বিবাদক্ষেত্রে পরিণত হবে।

স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানার্থে প্রথমতঃ প্রদেশসমূহকে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন-অধিকার দেওয়া আবশ্যক; সেই সঙ্গে যে-সমস্ত প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে আইনগত ভাবে সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা, এবং যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনপ্রথা অনুযায়ী নাগরিকরা শুধুমাত্র স্বধর্ম্মী প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারেন তার অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করবার জন্য দৃঢ়সংকল্প প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এবং বিদ্যালয়সমূহে ক্রমেই ধর্ম্মগত বিভেদ এবং খাদ্যাখাদ্যবিচার সম্পর্কিত গোঁড়ামির অবসান ঘটছে। ভারতীয় ছাত্ররা আমাকে জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয় যুবকরা আজ ধর্ম্মগত বিভেদ এবং বর্ণসংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতি তাদের মাতাপিতা অপেক্ষা ঢের কম নজর দেন। ১৯৩১ সালের বৃটিশ আদমসুমারির বিবরণীতে বলা হয়েছে, "মোটামুটিভাবে দেখ্‌তে গেলে, মুসলমান ও হিন্দুদের পক্ষে পরস্পরের সহিত সম্প্রীতিপূর্ণভাবে বসবাস করবার পথে কোনও দুরতিক্রম্য বাধা আছে বলে মনে হয় না। মাদুরা এবং তাঞ্জোরে হিন্দুদের এমন অনেক মন্দির রয়েছে, বংশানুক্রমে মুসলমানরা যার

আছি।” ১৯৩১ সালের আদমসুমারির জনৈক তত্ত্বাবধায়ক লিখেছিলেন, “ইংরিজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই আজ ধর্ম্মসম্পর্কে সম্পূর্ণই উদাসীন এবং অনাসক্ত।”

ধর্ম্মের আওতায় যে রাজনীতিকে লালন করা হয়, ধর্ম্মীয় দুর্ব্বোধ্যতা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং প্রাদেশিকতা তাকে জিইয়ে রাখে। সহরাঞ্চলে যে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বর্ত্তমান—সমৃদ্ধি এবং বাধ্যতামুলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের ফলে তা দূরীভূত হবে। জীবনধারণের মানোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ভারতের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লবসাধনের আশু প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অগ্রগতি তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীও নিয়ে আসবে; এবং এই দুই শক্তির সক্রিয়তায় বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও বর্ণগত সর্ব্বপ্রকার পার্থক্যের অবসান ঘটবে।

যাদের সঙ্গে পার্থক্য ঘটছে—তাদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু মনোভাব পোষণ—এ বড় জটিল সমস্যা; যে-সমস্ত দেশ তাদের সভ্যতা নিয়ে সর্ব্বাধিক গর্ব্বিত, সেখানেও এ সমস্যার ছিঁটেফোঁটা বর্ত্তমান। সরকার কর্ত্তৃক সাধারণের জন্যে প্রবর্ত্তিত যে আবশ্যিক বিদ্যালয়-ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সর্ব্বজনীন ভাষার প্রসারসাধন সম্ভব হয়—ভারতবর্ষে তা নেই। যে অস্পৃশ্য বা পতিত হিন্দুদের—দৈহিক স্পর্শ দূরে থাকুক—সামান্য ছায়ামাত্র স্পর্শেই বর্ণহিন্দুরা নিজেদের অশুচি বলে বোধ করে তাদের সন্তানরা যদি একই বিদ্যালয়ে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী এবং বৃটিশ-সন্তানদের পাশে গিয়ে বসতে পারে, তবে ভারতীয় সমাজের অসংখ্য বাধানিষেধের অসারত্ব প্রমাণ করবার পক্ষে সে ব্যবস্থা যে অনেকখানিই সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই। তেমনি, বিভিন্ন ধর্ম্ম এবং বর্ণের মধ্যে যে অনৈক্য এবং বাধানিষেধের প্রাচীর খাড়া হয়ে রয়েছে—অর্থনৈতিক প্রসার এবং কর্ম্মসংস্থানের' ব্যাপকতর সুযোগসুবিধা থাকলে সে প্রাচীরকে

ধূলিসাৎ করে দেবার পক্ষে তা অনেকখানিই কার্য্যকরী হতো। অস্পৃশ্য বা 'অনুন্নত সম্প্রদায়' আজ মুখ্যতঃ সহরাঞ্চলে ধাঙ্গড় এবং ঝাড়ুদারের কাজ করে; অনেকে চর্ম্মকারের বৃত্তিও গ্রহণ করেছে। গোঁড়া হিন্দুরা এ কাজকে অশুচি বলে গণ্য করে। কর্ম্মসংস্থান-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার দরুণ প্রতিটি ধর্ম্ম বা বর্ণভুক্ত লোকরাই আজ কোনো না কোনো বিশেষ ধরণের কাজকে নিজ নিজ জাত-ব্যবসায়ে পরিণত করতে চেষ্টা করে। অধিকতর লাভজনক বা অপেক্ষাকৃত কম দাসত্বমূলক বৃত্তিগুলিকে এইভাবেই অস্পৃশ্যদের নাগালের বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে।

বর্ণভেদ প্রথার উৎপত্তি প্রাচীনকালে। এ প্রথা যে বর্ত্তমানে দানা বেঁধে গেছে—ভারতের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের গতিরুদ্ধ অবস্থাই তার কারণ।

ভারতবর্ষে ডাঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকেই আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা রুষ্ট ব্যক্তি বলে মনে হয়েছে; সেখানকার অস্পৃশ্য সমাজের মধ্যে ইনিই প্রখ্যাততম পুরুষ। ডাঃ আম্বেদকরের পিতা এবং পিতামহ বহু বৎসর বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করেছেন। সচরাচর এমন সুযোগ ঘটেনা, এবং এরি ফলে তিনি ভারতবর্ষে লেখাপড়া করবার সুবিধে পেয়েছিলেন। পরে বরোদার মহারাজের দেওয়া একটি বৃত্তি নিয়ে তিনি নিউ ইয়র্কে যান এবং সেখানকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ও পি এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। জার্ম্মানীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পড়াশুনা করেছেন। তিনি একজন খ্যাতনামা লেখক, আইনব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ্। তাঁর স্বাস্থ্য নিরেট, সঙ্কল্পও দৃঢ়। ডাঃ আম্বেদকর বড় 'কঠিন খরিদ্দার'; অধিকাংশ হিন্দুই যে পরিমাণে দার্শনিক মনোভাবাপন্ন এবং যুক্তিহীন, তিনি সেই পরিমাণেই ভাবপ্রবণতার ধার ধারেন না, সেই পরিমাণেই যুক্তিবাদী। হিন্দুদের তিনি বিদ্বেষের

চোখে দেখেন; এবং তার কারণও আছে। ভারতবর্ষের পাঁচ ছ' কোটি অস্পৃশ্যের প্রতি যেরূপ আচরণ করা হয়, পৃথিবীর আর কোনখানেই মানুষ মানুষের প্রতি তত বীভৎস আচরণ করেনা। পতিতদের সংস্পর্শে এলেই অপবিত্র হতে হয়—এই ধারণা পোষণ করে, আমার মতে, হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের অপবিত্র করে তুলেছে। এই ধরণের বর্ব্বর বিশ্বাস ধর্ম্মকে অসম্মানিত করে।

অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতির জন্য গান্ধীজী কথায় এবং কাজে চেষ্টা করে আসছেন। তিনি অস্পৃশ্যদের হাতে প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণ করেন; তাঁর আশ্রমে তারা তাঁর কাছাকাছিই বসবাস করে। ফলে অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, এবং তারা বোধ হয় আম্বেদকরের অপেক্ষা গান্ধীজীকেই বেশী চেনে।

আম্বেদকর গান্ধীবিরোধ ও পাকিস্থানপন্থী। ভারতীয়দের মধ্যে বৃটিশের এতবড় সমর্থক আমি আর দেখিনি। ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে অস্পৃশ্য-সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আম্বেদকর বলেছিলেন, "বৃটিশরা আমাদের দুর্দ্দশার অবসান ঘটাবার কিছুমাত্রও উদ্দেশ্য নিয়ে সে দুর্দ্দশার কথা প্রচার করে বেড়ায় বলে আমার মনে হয়না; ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাদানের স্বপক্ষে আমাদের দুর্দ্দশাকে যুক্তিহিসেবে দেখাতে সুবিধে হয় বলেই তারা সে পথ বেছে নিয়েছে।" বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে যে বিরোধ বর্ত্তমান সে সম্পর্কে আম্বেদকর মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, বৃটিশরা ভারতবর্ষে কায়েম হয়ে থাকবার স্বপক্ষে এই বিরোধের মধ্যে নতুন এক যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। তা সত্ত্বেও, ১৯৪২ সালে বড় লাটের শাসন-পরিষদে যোগদান করে আম্বেদকর বৃটিশের সহযোগী হয়ে দাঁড়ালেন। উৎপীড়ক হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁর মনে অসীম ঘৃণা রয়েছে। এবং এরি ফলে, হিন্দুরা যা কিছুকেই বর্জ্জন করে তাকেই তিনি গ্রহণযোগ্য এবং হিন্দুরা যা কিছুকেই গ্রহণ করে তাকেই তিনি বর্জ্জনীয় বলে

মনে করেন। যুগযুগান্তের যে অবিচার এবং যন্ত্রণাভোগ শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদীকেও অযৌক্তিক করে তোলে—আম্বেদকরের মধ্যেই তারই প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যাবে।

অত্যন্ত গোঁড়া একজন হিন্দুর সঙ্গে আমি অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তিনি স্যার এস্ বরদাচারিয়ার, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি। ফেলিক্স্ ফ্র্যাঙ্ক্‌ফুর্টারের কাছ থেকে একখানা পরিচয়-পত্র নিয়ে আমি ভারতের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস গয়ারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তারপর স্যর মরিসেরই চিঠি নিয়ে আমি বরদাচারিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। স্যর মরিসের মতে, বরদাচারিয়ারই হচ্ছেন রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে নয়াদিল্লীর একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি।

আমার ট্যাক্সি বরদাচারিয়ারের বাড়ীতে পৌঁছুবামাত্র আমাকে অভ্যর্থনা করতে তিনি তাঁর সদর দরজায় এগিয়ে এলেন। তাঁর পরণে কলারছাড়া সাদা সার্ট এবং আঁটো পাজামা। গলা এবং হাতের বোতামগুলির সবই সোনার। মাথার উপরে একগোছা লম্বা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা রয়েছে, বাদবাকী চুল ছোট করে ছাঁটা। সব মিলিয়ে চীনাদের মতো। যেখানে চুল শেষ হয়েছে সেখানে কপালের মাঝামাঝি থেকে দু চোখের মাঝখান পর্য্যন্ত সরু একটা রক্তবর্ণ রেখা টানা; সেইসঙ্গে কপালের দুপাশ থেকে দুটি সাদা রেখা নাকের উপর এসে মিশেছে। সাদা রেখা দুটি একটানা নয়, মাঝে মাঝে ভাঙা। রেখাগুলি কিসের তা জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হচ্ছিল। তাঁর বয়স বছর ষাটেক; ভারতবর্ষ ছেড়ে কোনদিনই তিনি বিদেশে যাননি—তা সত্ত্বেও তিনি চমৎকার ইংরাজী বল্‌লেন।

তিনি বলছিলেন, "বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষ; এর কিছু কিছু অধিবাসী এখনও বৃক্ষশাখাতেই বাস করে, ওদিকে অক্সফোর্ডে

শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরাও এখানে রয়েছেন। এখানে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্ম। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে যে ঐক্য আমরা পেয়েছি তা নিছক শাসনতান্ত্রিক। উপরতলায় সে ঐক্যের আরম্ভ, উপরে তার শেষ। আমাদের উন্নতি হয়েছে সত্য, তবে নিজেদের লাভের খাতিরেই অপর পক্ষ সে উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন; তা থেকে যেটুকু সুবিধে আমরা আহরণ করি তা উপজাত পদার্থ মাত্র। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিছক সাহিত্যেরই আওতায় রেখে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ এই যে, কাজকর্ম্ম চালানোর জন্য প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পরে বৃটিশ সরকারের কিছু কেরানীরই মাত্র প্রয়োজন হয়েছিল। বিদ্যায়তন থেকে বেরিয়ে গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের মধ্যে যাঁরা কর্ম্মসংস্থান করে নিতে পারেন না, রাজনীতিতে প্রবেশ করে তাঁরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে থাকেন। অথচ বৃটিশরা একথা বোঝেনা যে, এর জন্যে তাঁরা নিজেরাই দায়ী।"

আমার তরফ থেকে কোনওরকম উস্কানী ব্যতিরেকেই তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন। তিনি আরো বললেন, "বৃটিশরা দু-চার দিনের জন্যে ভারতবর্ষে আসে; যখন তারা কোনও শিল্প গড়ে তোলে তখন নিজেদের স্বার্থেই তারা তা করে, ভারতবর্ষের স্বার্থচিন্তা তখন তাদের মনে অনুপস্থিত। ভারতকে যাঁরা শাসন করেন—তাঁদের জীবনে আরো নানা ঘটনার মত ভারতবর্ষও একটি ঘটনামাত্র। বড়লাটের মতো তাঁরাও বছর পাঁচেক এখানে থাকেন, নয়তো দশ কিংবা কুড়ি বছর। তাঁরা এখানে যা ভোগ করে যান ভারতবর্ষের কথা বলতে তাই-ই বোঝেন তাঁরা। ভারতবর্ষকে এই কারণেই পিছনে বেঁধে রাখা হয়েছে; আধুনিক পৃথিবীতে আজ তার স্থান নেই।"

কপালের সেই চিহ্নগুলি আমাকে বড় কৌতূহলী করে তুলেছিল। ওগুলি কি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন "আমি

ব্রাহ্মণ। হিন্দু কথাটির সংজ্ঞা সমষ্টিবাচক; তাদের মধ্যে এক অংশ ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে কোনও একজনকে বিশেষভাবে উপাসনা করে। তাঁদের মধ্যে একজন বিষ্ণু, অপর একজন শিব। ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুই আমার উপাস্য দেবতা। বিষ্ণুর উপাসকদের এই চিহ্ন ধারণ করতে হয়।"

"সব সময়?"

তিনি বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকাল অনেকে এতে লজ্জাবোধ করেন।"

তিনি অস্পৃশ্য প্রথায় বিশ্বাসী কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

ভর্ৎসনার সুরে তিনি উত্তর দিলেন, "এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, এ প্রথার উৎপত্তি উপলব্ধি করা দরকার। আপনার যদি জন্মান্তরবাদে আস্থা থাকে তা হলে বুঝতে পারবেন যে, আত্মা যদি কোনও এক জন্মে কোনও পাপকার্য্য করে থাকে তবে বারান্তরে তাকে অস্পৃশ্য হয়ে জন্মপরিগ্রহ করতে হতে পারে।"

আমি বল্‌লাম, "আত্মার পূর্ব্বজন্মের পাপের জন্য এ-জন্মে তার দেহকে শাস্তি দেওয়াটা সভ্যপ্রথা বলে মনে হয়না, সে পাপের জন্য এ বেচারা দায়ী নয়।"

প্রতিবাদ করে তিনি বল্‌লেন, "বিষয়টাকে আপনি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। কিন্তু আজ যদি কোনও অস্পৃশ্য লণ্ডনে গিয়ে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ফিরে আসে তবে, একমাত্র তার আত্মার অসামর্থ্য ছাড়া, তাকে আর কোনও অসুবিধারই সম্মুখীন হতে হয়না।"

আমি বল্‌লাম, "তা হোক্—তারা এত দরিদ্র যে, লণ্ডনে যাবার কথা কল্পনাও করতে পারেনা।"

তিনি বল্‌লেন, "কে অস্পৃশ্য আর কে নয়—রেলগাড়ীর কামরায় তা আপনার জান্‌বার উপায় নেই। জীবন তার বাস্তব উপায়েই এ-প্রথার তীব্রতাকে মন্দীভূত করে আন্‌ছে।"

বরদাচারিয়ার গোঁড়া হিন্দু; তা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে তিনি আত্মরক্ষাই করে গেলেন মাত্র। এ সম্পর্কে অন্যান্য ভারতীয়েরাও এইমতই প্রকাশ করেছিলেন যে, বর্ণহিন্দু এবং পতিতদের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ত্তমান, নাগরিক জীবন সে পার্থক্যকে কমিয়েই আন্‌ছে।

এ ছাড়া আরো একটি কৃত্রিম ব্যবধান ভারতবর্ষের ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হলো মহারাজা-শাসিত দেশীয় রাজ্যসমূহ। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর মোটামুটি এক চতুর্থাংশ এই দেশীয় রাজ্যগুলির অধিবাসী। দেশীয় নৃপতিবৃন্দ এর প্রত্যক্ষ শাসক; পরোক্ষ শাসক বৃটিশ সরকার। রাজ্যগুলির আয়তন নানাপ্রকারের। হায়দরাবাদের লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ; আবার এমন সমস্ত ছোট ছোট রাজ্য রয়েছে যার লোকসংখ্যা মাত্র কয়েক শো হবে। সমগ্র দেশ জুড়ে এই রাজ্যগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যেরকম নানা ধরণের লোকের বাস, এখানেও তাই।

১৯৪২ সালে নরেন্দ্রমণ্ডলের সভাপতি ছিলেন বিকানীরের মহারাজা। একদিন বোম্বাইতে আমার হোটেলের ঘরে বসে আছি, এমনসময় তাঁর একজন সেক্রেটারী টেলিফোনযোগে আমাকে জানালেন যে, মহারাজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। এ সাক্ষাৎ আমি প্রার্থনা করিনি; তাই, তিনি আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চান কেন—ভেবে বিস্মিত হলাম। সবেমাত্র গান্ধীজীর কাছে আমি এক সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছি। আসন্ন আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর পরিকল্পনা কি—বিকানীরের মহারাজা কি নিজের এবং বৃটিশ সরকারের জন্যে সেই সংবাদই সংগ্রহ করতে চান? না কি তাঁর ওপরে বড়লাট এবং গান্ধীজীর মধ্যে মধ্যস্থতা করবার ভার দেওয়া হয়েছে?

মহারাজার বোম্বাইপ্রাসাদের নীচু দেউড়ীর সামনে গিয়ে পৌঁছুবা-

মাত্রই সাদা পোষকপরা একদল অনুচর শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো। একজন সেক্রেটারী তৎক্ষণাৎ আমাকে মহারাজার বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দেহ বিরাট, মাথাটি সুগঠিত। পরণে সাদা লিনেনএর সুট; ধূমল রঙের গলা-খোলা সার্ট—তার নীচে ঐ রঙেরই গেঞ্জী দেখা যাচ্ছে। ঘন এবং পাকানো কাঁচাপাকা গোঁফ। ঘন কালো ভুরু, তবে মাথার চমৎকার চুলের সবই ধবধবে সাদা; কর্ণলতা থেকে সমান্তরালভাবে পিছনের দিকে কিছু দীর্ঘ কালো চুল বেরিয়েছে।

বিকানীরের মহারাজার কণ্ঠস্বর কিছুটা ভাঙা ভাঙা শোনালো। তিনি আমাকে জানালেন যে, গলায় অস্ত্রোপচারের জন্যই তিনি বোম্বাইতে এসেছেন; বল্‌লেন, "তেমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়; স্বরতন্ত্রীগুলির একটি কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে—ফলে তারা মিলিত ভাবে কাজ করতে পারছেনা। বাড়তি অংশটুকু কেটে বাদ দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" (এর কয়েক মাস বাদেই তিনি গলকর্কটীরোগে মারা যান।) নিখুঁত উচ্চারণে তিনি চমৎকার ইংরিজী বল্‌ছিলেন।

মহারাজার প্রথম প্রশ্নই হলো: "মহাত্মা আপনাকে কি বল্‌লেন?"

সাতদিনের আলোচনার সংক্ষিপ্ত সারটুকুই তাঁকে জানালাম: "গান্ধীজী অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন, তিনি একটা কিছু পরিবর্ত্তন চান।" আরো বল্‌লাম, "আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ আজ তীব্রভাবে বৃটিশবিরোধী।"

মহারাজা বল্‌লেন, "বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবেই বৃটিশবিরোধী। মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে, বৃটিশরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেই রেখেছে। এখানে এমন সব ক্লাব রয়েছে যাতে ভারতীয়দের যোগদানের অধিকার নেই। যথা 'নৌ-বিহার ক্লাব'। এ ক্লাব থেকে আমাকে বলা হয়েছিল, 'আপনার কথা আলাদা, আপনি অবশ্যই যোগ দিতে পারেন।' তার উত্তরে আমি বলে

দিয়েছি, 'ধন্যবাদ। বাকিংহাম প্রাসাদে আমি রাজার সঙ্গে বসে আহার করেছি, তোমাদের ক্লাবে আমার প্রয়োজন নেই।"

একটু খুঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম, "আপনি নিশ্চয়ই মনে করেননা যে, বৃটিশরা চিরকাল ভারতবর্ষে থাক্‌বে ?"

মহারাজা বল্‌লেন, "ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বৃটেন কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এখন সে কথার খেলাপ করতে পারে না।"

মহারাজাকে বললাম, "সপ্তদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকারের সঙ্গে হায়দরাবাদ ও মহীশূরের যতোগুলি চুক্তি হয়েছে, সম্প্রতি হায়দরাবাদে থাক্‌বার সময় তার সবগুলিরই আমি সারাংশ পাঠ করেছি। তাতে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, রাজ্যদুটির ওপরে বৃটিশ সরকার জোর করেই এই সমস্ত চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন; আর আজ বৃটিশ সরকারই বল্‌ছেন যে, সে চুক্তি ভঙ্গ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।"

তিনি হেসে বল্‌লেন, "মহীশূর রাজ্যের কোনও গুরুত্ব নেই, আর হায়দরাবাদের ব্যাপারটাও একটু আলাদা। মুসলমান নরপতি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ওপরে শাসন চালাচ্ছেন। বৃটিশের সঙ্গে বিকানীরের যে চুক্তি হয়েছিলো তা আপনাকে দেখাচ্ছি।" তিনি ঘন্টি বাজাতেই একটি লোক এসে ঘরে ঢুকলো, তার মাথায় কমলা রঙের বিরাট পাগ্‌ড়ী। প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে দেওয়ার জন্যে তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। এর মুহূর্ত্তকাল পরেই দরজায় করাঘাত শোনা গেল; গলা বাঁচাবার জন্যে মহারাজা শিস্‌ দিতেই সেক্রেটারী প্রবেশ করলেন। মহারাজা ইংরিজীতে তাঁকে কিছু বলবামাত্রই তিনি কক্ষত্যাগ করে আবার একটু পরেই দু-পিঠ ছাপা একটি এক-পাতার দলিল নিয়ে ফিরে এলেন। মহারাজা সেটি আমার হাতে দিলেন; আমি ধীরে ধীরে তা পড়তে লাগলাম, আর তিনি নিস্পন্দ হয়ে বসে রইলেন।

পড়া শেষ করে আমি বল্‌লাম, "এ চুক্তিতে যে দুটি কথা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক তা হলো 'অধীনতামূলক সহযোগিতা'। আপনি বৃটিশ সরকারের অধীন এবং বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপনাকে সহযোগিতা করতেই হবে।"

চুক্তিপত্রে তারিখ দেওয়া রয়েছে—দিল্লী, ৯ই মার্চ, ১৮১৮ সাল। তার ৩ নং সর্ত্তটি হল এই : "মহারাজা সুরত সিং এবং তাঁর বংশধর ও উত্তরাধিকারীরা বশ্যতামূলকভাবে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তাঁরা বৃটিশ সরকারের অধীশ্বরত্ব মেনে নেবেন এবং অন্য কোনও সামন্ত বা রাজ্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবেন না।"

মহারাজা বল্‌লেন, "তা হোক্, তবু এ চুক্তিটি ভাল।" ভারী একটি লাল পেন্সিল তুলে নিয়ে তিনি ১নং সর্ত্তে দাগ দিয়ে বল্‌লেন, "এ সর্ত্তটি ভাল, তারপর এটিও...," বলে তিনি ২নং সর্ত্তে দাগ দিলেন; তারপর ৯নং সর্ত্তে দাগ দিয়ে বললেন, "এ সর্ত্তটিও ভাল।" ১নং সর্ত্তটি মৈত্রী সম্পর্কে একটা সাধারণ গৌরচন্দ্রিকা। ২নং সর্ত্তে বলা হয়েছে, "বৃটিশ সরকার এইসর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তাঁরা বিকানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অঞ্চল রক্ষা করবেন।" ৯নং সর্ত্তটি অবিকল এই : "মহারাজা, তাঁর বংশধর এবং উত্তরাধীকারীরাই তাদের রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হবেন; বৃটিশ এলাকাকে সে রাজ্যের মধ্যে সম্প্রসারিত করা হবেনা।"

মহারাজা বল্‌লেন, "অনুগতভাবেই আমরা এই চুক্তিপত্রের সমস্ত সর্ত্ত মান্য করেছি, বৃটিশ সরকারকে সামরিক সাহায্যও দিয়েছি আমরা; রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রাজার পক্ষ হয়ে আমি নিজেও লড়াই করেছি।"

আমি বল্‌লাম, "গান্ধীজী আমাকে বলেছিলেন যে, বৃটিশ সরকার যদি ভারতীয়দের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হন, তা হলে তৎক্ষণাৎ মুসলমান, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং হিন্দুদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে।"

মহারাজা বল্‌লেন, "বৃটিশ সরকার যেভাবে আমাদের রক্ষা করে এসেছেন, সে সরকারের কাছ থেকেও আমরা সেই ব্যবস্থাই আশা করবো।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "দুটি পৃথক ব্যবস্থাকে পাশাপাশি বজায় রাখাটাকে কি আপনি সম্ভবপর বলে মনে করেন ?"

তিনি বিস্ময়প্রকাশ করে বল্‌লেন, "নিশ্চয়ই করি। কেন করবোনা বলুন ?"

আমি বললাম, "ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা কিন্তু সর্ব্বজনীন ভোটাধিকার-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং আরো নানা গণতান্ত্রিক সংস্কারসাধন করবেন।"

তিনি দৃঢ়ভাবে বল্‌লেন, "আমি নিজে একজন স্বৈরাচারী শাসক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষের জনসাধারণের অপেক্ষা আমার প্রজারা বেশী সুখী। আপনি অবশ্যই একবার বিকানীরে আস্‌বেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ হাসপাতালগুলির মধ্যে কয়েকটি রয়েছে বিকানীরেই। তার মধ্যে একটির ভার জার্ম্মানী থেকে আগত জনৈক ইহুদী আশ্রয়প্রার্থীর উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ওখানে বহু স্কুল এবং সুন্দর সব সড়ক রয়েছে। প্রজাদের সম্পর্কে আমার আচরণও ভাল। বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের তুলনায় স্বভাবতঃই তারা কিছুটা অনগ্রসর। গণতন্ত্রের জন্যে তারা এখনও তৈরী নয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাকে কি হিন্দু-মুসলীম সমস্যার ঝক্কি সামলাতে হয় ?"

তিনি বললেন, "বহু শতাব্দী ধরে আমাদের সে সমস্ত উৎপাৎ ছিলনা। হালে বৃটিশশাসিত ভারতবর্ষ থেকে এর আমদানি হচ্ছে। মোল্লারা রাজ্যের উত্তর অংশে প্রবেশ করে মুসলমানদের বলে বেড়াচ্ছে তারা যেন হিন্দুদেব সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখে। খোলাখুলি-

ভাবেই আপনাকে জানাচ্ছি যে, যখনই কোনও গণ্ডগোল বাধে—সচরাচর তার সূত্রপাত করে মুসলমানরাই। মিঃ জিন্না একজন নোংরা এবং জঘন্য লোক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে আপনাকে দু-একটা কথা জানাচ্ছি। তাঁর যুবাবস্থায় জনৈক পার্শী, তাঁর নাম ধরুন কি এক স্যর পেটিট, তাঁকে সাদরে নিজের গৃহে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন। অতঃপর তিনি আশ্রয়দাতার কন্যার সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিবাহ করলেন। কোনও পরিবারে আশ্রয়গ্রহণ করে সেই বাড়ীরই মেয়ের সঙ্গে কেউ প্রেম করতে যায়না। এ বিবাহ সুখের হয়নি। বর্ত্তমানে তাঁর কন্যাটি আবার পিতাকে পরিত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত জনৈক পার্শীকে বিবাহ করেছে। ভাগ্যের পরিহাস।”

জিন্নার পাকিস্থান সম্পর্কে আমি তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলাম। মহারাজা এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে, এটা একটা অবাস্তব ব্যাপার এবং প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাও পাকিস্থান চায়না। তিনি যুক্তি দেখালেন যে, ভারতবর্ষ এতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। আরো বললেন, “আগা খাঁর ভুল থেকেই এত সব বিপত্তির উদ্ভব। এক মুসলীম প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে তিনি বড়লাট মিণ্টোর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। (এ সাক্ষাৎকার হয় ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর)। আগা খাঁ তখন অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হোক।”

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “বৃটিশ সরকার সে অনুরোধ রাখতে গেলেন কেন?”

তাতে মহারাজা বললেন, “সে প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার একটা ‘মস্ত ব্যাপার’ করে চালানো হয়েছে। বৃটিশ সরকার তো তাই-ই চেয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের কায়দাই হলো এই ঃ “বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন চালাও।”

আলাপ আলোচনায় ততক্ষণ প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হয়েছে। ঘণ্টি বাজিয়ে সেক্রেটারীকে আহ্বান করে তিনি তাঁকে বিকানীর রাজ্য সম্পর্কে একখানা বই আমাকে এনে দিতে বল্‌লেন। বইটির জন্যে অপেক্ষা করছি—এমন সময় মহারাজা বললেন, "বেশ কথাবার্ত্তা হলো; আপনি আসায় আমি খুব খুসী হয়েছি। তবে কি জানেন, 'লাইফ্' এবং 'টাইম্' পত্রিকার বিল ফিশারের জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকবার আমার কথাবার্ত্তা হয়েছে।" আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। মহারাজার সেক্রেটারী ভুল করে আমাকে ডেকেছিলেন।

মহারাজা বললেন, "বৃষ্টি আস্‌ছে, চলুন দেখা যাক্।" সমুদ্রের উপর আকাশ তখন কালোয় কালো হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে তাঁর প্রশস্ত উদ্যানের লনে নিয়ে গেলেন। তার উপরে নীলরঙা বিরাট গালিচা বিছানো। গালিচার মাঝখানে গোল করে বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে। লনের শেষে প্রাচীর; তার নীচেই পাহাড়িয়া উপকূল। প্রাচীরের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে উত্তাল ঢেউ; জলকণা এসে ছুটে ছুটে গায়ে লাগ্‌ছে আমাদের। কালো মেঘ গর্জ্জে গর্জ্জে উঠ্‌ছে; শীগ্‌গীরই বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করবে। প্রাচীরের পাশেই দুজন মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন; মহারাজা তাঁদের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয়: বিকানীরের এক হাসপাতালে চিকিৎসা করেন। অন্যজন হাঙ্গেরীয় ইহুদী; তাঁর চুল সাদা; ইনি মহারাজার ফুট্‌ফুটে তিন নাতির ছবি এঁকে দিয়েছেন। ঠিক এই সময়েই দেখা গেল যে, মহারাজাকে আদর জানাবার জন্য তারা একটি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে।

মহারাজা আমাকে যে বইটি দিয়েছিলেন তার নাম, "বিকানীরের অগ্রগতির চল্লিশ বৎসর"; ১৯৩৭ সালে বিকানীর সরকারের তরফ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। বিকানীরের আয়তন ২৩,৩১৭ বর্গমাইল; হল্যাণ্ড

এবং বেলজিয়মকে যুক্ত করলে যা দাঁড়ায় তার থেকে সামান্য কিছু ছোট। রাজ্যের লোকসংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল ৫৮৪,৭৫৫ ; ১৯৩১ সালে তা ৯৩৬,২১৮-তে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজধানী বিকানীর সহরের লোক-সংখ্যা ৮৫,৯২৭। হিন্দুদের সংখ্যা ৭২৫,০৮৪; মুসলমানদের ১৪১,৫৭৮, শিখদের ৪০,৪৬৯ এবং জৈনদের ২৮,৭৩৩।

রাজ্যে জলের খুব অভাব। বর্ষার উপর নির্ভর করে থাক্‌তে হয়—অথচ সে বর্ষা অনেক সময় ঠিক মতো আসেনা। রাজ্যে কয়েকবার দারুণ দুর্ভিক্ষ ঘটে গেছে।

বিকানীরের মহারাজা ৪৪ বৎসর রাজ্যশাসন করে গেছেন। ভার্সাই শান্তিচুক্তিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে তিনি একজন বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন।

মহারাজারা জানেন যে, সমগ্র বিশ্ব এবং ভারতবর্ষে আজ এক নতুন হাওয়া বইছে। বিশিষ্ট মহিলা-কবি এবং প্রাণ-চঞ্চল স্বাধীনতাকামী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আমাকে বলেছিলেন যে, রাজন্যবর্গের মধ্যে কয়েকজন গোপনে গোপনে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখ্‌ছেন। নরেন্দ্রমণ্ডলের একজন সেক্রেটারী আমাকে বলেছিলেন, "ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের 'আলস্টার' হয়ে দাঁড়াবেনা"; তাদের কাছে স্বাধীন ভারতবর্ষের চাইতে ইংলণ্ডের দাম বেশী নয়। নৃপতিরাও আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। ভারতের যে-ক'জন মহারাজা সর্ব্বাপেক্ষা উদার দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন—ইন্দোরের মহারাজা তাঁদের অন্যতম।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল অ্যাড্‌লার একদিন শিকারের উদ্দেশ্যে ইন্দোরের মহারাজার প্রাসাদে গিয়ে উঠেছিলেন। এর কয়েকদিন বাদে, ১৯৪২ সালের ৩০শে মে, ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে একটি খোলাচিঠি প্রকাশিত হলো; চিঠিখানা লিখেছেন ইন্দোরের মহারাজা—প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের কাছে। তাতে বৃটেন এবং

ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করবার জন্যে প্রেসিডেন্ট রুজ্‌ভেল্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। মহারাজা লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষ বিভক্ত এবং বৈরীভাবাপন্ন।"

মহারাজা আরো জানিয়েছিলেন, "জন্মের উপর হাত নেই, তাই আমি একজন নৃপতি। তবে প্রতীতির দিক্ থেকে আমি আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং গণতন্ত্রে আস্থাশীল।"

এ চিঠি লিখ্‌বার জন্য বড়লাট তাকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছিলেন। মহারাজার আর একটি পাপকার্য্য হচ্ছে এই যে, ইন্দোরের জন্য তিনি একটি আধুনিক এবং গণতন্ত্রসম্মত শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব করেছেন।

ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি হলো মধ্যযুগীয় ভাবধারার মস্ত ঘাঁটী। নিজের অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ বিগত যুগকে চিরস্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করছে। দেশীয় রাজ্যগুলি এই বিগত যুগেরই ধারক। বিংশ শতাব্দীকে ঠেকিয়ে রাখবার কার্য্যে আজ ষোড়শ শতাব্দীর এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে টিঁকিয়ে রাখ্‌বার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী চতুর ফন্দীরই পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিকে দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্যসাধন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অন্ততঃ ছ জন উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্ম্মচারী তাঁদের নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের কথা আমি তুলে দিচ্ছি। অধ্যাপক রাসব্রুক্ উইলিয়াম্‌স্ বহুবারই সরকারীভাবে বৃটিশ সরকার এবং মহারাজাদের যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। ১৯৩০ সালের ২৮শে মে তারিখে লণ্ডনের 'ইভ্‌নিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় তিনি লেখেন: "দাবার ছকের মতো ভারতবর্ষের উপর এই করদ রাজ্যগুলি যেভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তাতে তারা এক শক্তিশালী রক্ষাকবচেরই কাজ করছে। এ যেন এক বৈরীভাবাপন্ন দেশে ব্যাপকভাবে বন্ধু-শিবির প্রতিষ্ঠা করা

হয়েছে। অনুগত এই দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য যে কোনও সাধারণ বিদ্রোহের পক্ষেই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।”

১৮৬০ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বড়লাট লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন, “বহুদিন আগেই স্যর জন ম্যালকম্ একথা বলে গেছেন যে, সারা ভারতবর্ষকে জেলায় বিভক্ত করে ফেল্‌লে আমাদের সাম্রাজ্য পঞ্চাশ বছরও টিঁক্‌তো কিনা সন্দেহ। কিন্তু রাজনৈতিক শক্তিবিহীন কতকগুলি দেশীয় রাজ্যকে যদি আমরা আমাদের হাতের পুতুল করে টিঁকিয়ে রাখি তা হলে, আমাদের নৌবল যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রতিহত থাক্‌ছে, আমরাও ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আমাদের প্রভুত্ব বজায় রাখ্‌তে পারবো। এ অভিমতের সারবত্তা সম্পর্কে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীও এ কথার প্রতি আগের থেকে ঢের বেশীগুণে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।” সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হলো ১৮৫৭ সালের বিরাট বিদ্রোহ।

নির্ম্মলমন যে সমস্ত ব্যক্তি ইংলণ্ডের উদারধরণের গণতন্ত্রের সহিত পরিচিত তাঁদের পক্ষে নিঃসংশয়েই একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, সাম্রাজ্যের বেলায় বৃটিশরা বহু নীতিবুদ্ধিকেই ঠেলে সরিয়ে রেখেছে; উপনিবেশের উপর নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য ধর্ম্মগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করে তাকে তারা উস্কানীই দিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি শাসনযন্ত্র এবং স্থল ও নৌবাহিনীর সাহায্যে ৪০ কোটি লোকের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখা সহজ ব্যাপার নয়। ভারতীয়দের উদগ্র আত্মপ্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সামনে তা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। আর তাই, বৃটিশ সরকার যেখানেই সুবিধা পেয়েছেন সেইখানেই ভারতীয়দের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সাক্ষীগোপাল মহারাজাদের কাছ থেকে তাঁরা সে সাহায্য পেলেন। যুদ্ধকালে কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকেও তাঁরা সে সাহায্য নিয়েছেন; কম্যুনিষ্টরাও বৃটিশশাসকদের কাছ থেকে মোটারকমের সাহায্য গ্রহণ

করে। তার কারণ এই যে, মস্কোর নির্দ্দেশ অনুযায়ী কম্যুনিস্টরাই ছিল ভারতবর্ষের একমাত্র যুদ্ধ-সমর্থক দল। নিজেদের অবস্থাকে ঠিক রাখবার জন্যে বৃটিশরা হিন্দু-মুসলীম এবং হিন্দু-অস্পৃশ্য বিরোধকে কাজে লাগিয়েছে। বিভেদনীতিতে সিদ্ধহস্ত বলেই তারা শাসন চালাতে পারছে। সমৃদ্ধ, শিক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে পারলে ৪০ কোটি ভারতবাসী অতি সহজেই সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করে আন্‌বার উপায় আবিষ্কার করতে পারে। এই কারণেই ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও ঐক্যের পথে নিয়ে যাওয়া বৃটিশের অভিপ্রেত নয়।

বলাই বাহুল্য, বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে রেলপথ, সেচব্যবস্থা, বিজলী ও জনস্বাস্থ্যবিভাগের প্রবর্ত্তন করেছেন। আর যাই হোক্— এটা বিংশ শতাব্দী। তবুও, পিছনের শতাব্দীগুলিকে, খুব সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, সযত্নে জিইয়ে রেখে, যেটুকু অগ্রগতি না হলেই নয়, ঠিক ততটুকুরই মাত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতের বিদ্রোহের মূলে রয়েছে নূতনের আহ্বান।

স্বাধীনতা পেলেই যে ভারতের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে— এমন কথা কেউ মনে করেননা। এতে আরো নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে ; স্বাধীনতা তার সমাধানের পথে দ্বারোদ্‌ঘাটন করে।

স্বাধীনতালাভের পর অবস্থা কেমন দাঁড়াবে—দাসত্বকালীন অবস্থায় তার কোনও হদিশ মেলেনা। দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা— এই সময়টুকুর মধ্যে মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণ—অথবা তার সুপ্ত সদ্‌গুণ ছড়িয়ে আছে। স্বাধীনতা না পেলে তার প্রয়োগবিধি জানা যায়না।

জাতির বিকাশের পথে স্বাধীনতা সঞ্জীবনীশক্তির কাজ করে। তা হলো রুগ্নের ঔষধ। স্বাধীনতা যে অর্জ্জন করে এবং স্বাধীনতা যে দেয়—স্বাধীনতা তাদের দুজনকেই উজ্জীবিত করে তোলে। স্বাধীনতা ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড এবং সমগ্র পৃথিবীকেই নিরাময় করে তুল্‌বে।

বৈদেশিক প্রভুত্ব থেকে মুক্তিলাভের পর ভারতবর্ষকে নতুন নেতৃত্বে নতুন সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। সে সংগ্রাম হলো অভাব, বর্ণভেদ এবং বিগত যুগের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রাম।

ভারতে বৃটিশ-শাসন

প্রায় প্রত্যেকটি ভারতবসীই বল্‌লেন : আমরা হতাশ হয়েছি ; প্রায় প্রত্যেকটি ইংরেজই বল্‌লেন : ভারতবাসীরা উদার নয়। বৃটিশরা আজ ভারতবর্ষে অসুখী, কারণ কারুরই তারা প্রশংসাভাজন নয়। ভারতবর্ষে যে-সমস্ত বৃটিশ কর্ম্মচারী রয়েছেন তাঁদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা যে, তাঁরা ভারতবর্ষের অশেষ হিতসাধন করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-কথাও তাঁরা জানেন যে, এ সম্পর্কে ভারতবাসীদের মনোভাব অন্যরকম।

যে-সমস্ত বৃটিশ পরিবার কয়েক শতাব্দী ধরে নিয়মিতভাবে তাদের ছেলেদের ভারতবর্ষে চাকরী করতে পাঠিয়েছেন তারা আমাকে বলেছিলেন যে, এর মধ্যে এখন আর লেশমাত্র ফূর্ত্তি, উন্নতির আশা অথবা তৃপ্তি নেই। তাদেরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, প্রতিকূল জলবায়ুতে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে, এবং এত দীর্ঘকাল মাতৃভূমি ছেড়ে তাদের বাইরে থাক্‌তে হয় যে, ছুটি নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে তাদের মনে হয় যেন তারা বিদেশে এসেছে। আর এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে তারা পায় ভারতবর্ষের শত্রুতা। ভারতবর্ষের জমিতে ইংরেজদের যেন এক রোষবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যে এক ক্ষুদ্র বন্ধ্যা দ্বীপে বাস করতে হয়। প্রায় সমস্ত রকমের পার্থিব সুখই তারা ভোগ করেন বটে, তবু প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ থেকে তারা বঞ্চিতই থেকে যান।

যে সমমর্য্যাদার ভিত্তিতে মানুষ মানুষের সঙ্গে মেশে, বৃটিশরা তেমন করে ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেনা। ভারতবর্ষের জনৈক উচ্চপদস্থ বৃটিশ রাজকর্ম্মচারী তিনজন মুসলীম ভদ্রলোকের

সঙ্গে আমাকে একবার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভারতীয় অতিথিদের মধ্যে একজনকে তিনি বল্‌লেন, "বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে গেলে অবস্থা কী দাঁড়াবে মিঃ ফিশরকে বলুন।" অতিথি ভদ্রলোক অনিবার্য্যভাবেই তার উত্তরে জানালেন যে, সে দিন পৃথিবীর সমূহ সর্ব্বনাশ। নয়তো তিনি বল্‌লেন, "হিন্দু এবং মুসলমানদের সম্পর্কে মিঃ ফিশরকে কিছু বলুন।" বলাই বাহুল্য, এর উত্তরে তাঁরা তীব্র বিষোদ্গার করতে আরম্ভ করলেন। সেই দিনই কিছু পরে মুসলমান ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বাইরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে' বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। আপনাকে আমি জানাতে এসেছি যে, লাঞ্চের সময় আমি যে-সমস্ত কথা বলেছি তা আমি নিজেই বিশ্বাস করিনা।" এই ধরণের ভারতীয়রা বৃটিশের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেন বটে, তবে তাদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেননা। ইংরেজরাও সে-কথা বোঝে, বোঝে বলেই ভারতবর্ষকে আর এখন তাদের তত ভাল লাগেনা।

গান্ধীজীর মাটির ঘরে এক সপ্তাহ কাটাবার পর তিন দিনের জন্যে আমি হায়দরাবাদের বৃটিশ রেসিডেণ্ট স্যর ক্লড গিড্‌নী এবং লেডী গিড্‌নীর আতিথ্য গ্রহণ করি। প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে বিরাট প্রাসাদ, তারই একটি অংশ আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ধব্‌ধবে সাদা উর্দি-পরা একটি নীরব নগ্নপদ ভারতীয়ই ছিলো আমার অষ্টপ্রহরের পরিচারক। তার বুকের ওপরে লাল এবং সোনালিতে কাজ-করা তক্‌মা আঁটা, ডুম্‌রোনো রঙীন কোমরবন্ধ থেকে খাপখোলা কারুকার্য্যখচিত তলোয়ার ঝুলছে। সকালে চোখ মেলে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কালো কফি আর ফলমূল নিয়ে এসে হাজির হতো— আমার 'ছোট্টা হাজ্‌রি'। কাঁধ থেকে সার্ট্‌টিকে নামাতে না নামাতেই সেটিকে সে তুলে নিয়ে কাচ্‌তে পাঠিয়ে দিত, আমার স্নানের সময় হয়েছে মনে করবামাত্রই সে জল নিয়ে তৈরী।

নয়াদিল্লী থেকে আসবার সময় সাথে করে' আমি একটিও জ্যাকেট নিয়ে আসিনি, ভারতবর্ষের গরমে তার কোনও প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়নি আমার। স্যুটকেসে একটি 'টাই' ছিল বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সেটা সেখানেই পড়ে থাকতো। গিড্নী-ভবনে প্রথম দিন সন্ধ্যায় আমাদের কক্‌টেল পরিবেশন করা হয়েছে ; এমন সময় ডিনার-এর জন্যে পোষাক বদ্‌লাবার উদ্দেশ্যে ক্লড্ আমার কাছে অনুমতি চেয়ে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন। নবাগত অতিথির কাছে একা পড়ে গিয়ে লেডী গিডনী কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন বলে মনে হলো। কথাবার্ত্তা বলা দরকার, তাই যেন তিনি তাঁর কাজের ফিরিস্তি দিতে সুরু করলেন আমার কাছে। নানারকম সাহায্য-অনুষ্ঠান নিয়েই তাঁকে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়, বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যেও তাঁর কাজ পড়ে রয়েছে! তার পর রয়েছে ভারতীয়দের আপ্যায়ন। তিনি বল্‌লেন, "এটা একটা সমস্যা। কোনও ভারতীয়কে যদি লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করা হয় তবে তাতে স্বজাতির মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়ে। এতে তাঁর সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়, ব্যবসাবানিজ্যেরও সুবিধে হতে পারে। ডিনারে নিমন্ত্রিত হওয়াটা এর থেকেও বেশী সম্মানের। আর বৃটিশ অতিথিদের সঙ্গে একসাথে নিমন্ত্রণ পেলে তো কথাই নেই, তাতে নিজের সমাজে তাঁর খুবই সম্মান বেড়ে যায়। নিয়মিতভাবে যাঁরা নিমন্ত্রণ পেয়ে আসছেন তাঁরা যাতে আমার নিমন্ত্রণ থেকে বাদ না পড়েন সেদিকে আমাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় ; নিমন্ত্রণ থেকে বাদ পড়লে সেটাকে তাঁর প্রতি আমাদের অনুগ্রহের অভাব বলে গণ্য করা হবে। তাতে দেশবাসীদের কাছে তিনি জাত খোয়াবেন।"

নিমন্ত্রণেরই যখন এতখানি দৌড়, তখন খেতাব পদক চাকুরী এবং রাজার অনুগ্রহ বিলিয়ে অতি সহজেই যে একদল খয়ের খাঁ এবং হাতের পুতুল তৈরী করে তোলা যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

আর কি করে' যে ঈর্ষ্যার কারণ ঘটিয়ে তাদের মধ্যেও নানা উপাদানের সৃষ্টি করা যায়—সেটা বুঝতে পারাও কিছুই শক্ত নয়। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা আত্মমর্য্যাদাবোধসম্পন্ন, যাঁরা রাজনীতি-সচেতন—এই ধরণের আচরণে বৈদেশিক সরকারের ক্রীতদাসদের সম্পর্কে তাঁদের মন ঘৃণায় ভরে' ওঠে, সরকারকেও তাঁরা আর বিশ্বাস করতে পারেননা।

নবাব কামাল ইয়ার জঙ্ একদিন লাঞ্চে নিমন্ত্রিত হয়ে গিডনীদের বাড়ী এসেছিলেন। গোলগাল চক্চকে চেহারা, সাদা পোষাক, তামাটে মুখ, মাথায় সাদা রঙের উঁচু পাগড়ী। যতদূর মনে পড়ে নবাব সাহেব আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তিন শ' সতেরো বর্গ-মাইল পরিমাণ জমির মালিক, তাতে প্রায় পঁচাশী হাজার প্রজার বাস। তিনি আরো বললেন যে, হায়দরাবাদের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা আশী জনই 'বিক্ষুব্ধ'; তাই "আমাদের অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখে" বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাওয়া অসম্ভব।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রগতিবিরোধী এবং গতিশক্তিরহিত খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছে। সে নিজেও আজ স্থাণু। পার্ল হারবারের পর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বৃটিশ ঘাঁটিগুলো এত সহজেই ধ্বসে পড়লো কেন—ভারতবর্ষের বৃটিশ জঙ্গীলাট স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেলকে (এখন তিনি লর্ড, এবং বড়লাট) আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, "শতাব্দীর পর শতাব্দী সেখানে আমরা শুধু টিন আর রবারই উৎপন্ন করে গেছি—অন্য আর কিছুই করা হয়নি সেখানে; বড় বেশী মেদবহুল হয়ে পড়েছিলাম আমরা, বড় বেশী অলস।"

ওয়াভেল একজন পরিশীলিত, শিক্ষিত এবং সৎ ব্যক্তি। নয়া দিল্লীতে তাঁর বাড়ীতে আমাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রিত করা হয়েছিল;

সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। বহুক্ষণ ধরে ঘরোয়া আলোচনার পরে তিনি আমার সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। সিঁড়িতে আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

তিনি সে কথা স্বীকার করে বললেন, "তিন বছর যুদ্ধ চালিয়ে আমি আজ ক্লান্ত; এ তিন বছরের বেশীর ভাগই পরাজয় দিয়ে ভরা।" তিনি আরো বললেন, "রোমেল একজন উঁচুদরের যোদ্ধা। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি।" ওয়াভেলের সঙ্গে আমার চারবার সাক্ষাৎ হয়; প্রতিবারেই তিনি রোমেলের কথা তুলেছেন।

অশ্বারোহী সৈন্যের মতো সুপুষ্ট পায়ের উপর ভর দিয়ে ওয়াভেল যেন একটি ট্যাঙ্কের মতো হাঁটেন। মুখমণ্ডল অমসৃণ, গভীর রেখাঙ্কিত। বাঁ চোখটি মুদ্রিত, অন্ধ। ঘন ইস্পাত-ধূসর চুল। বাঁদিকের বুকের উপরে পাঁচ সারি সামরিক ফিতে আঁটা, খাকি পোষাকের উপরে তার রঙ্‌ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তিরিশ বছর আগে তিনি যখন ভারতবর্ষে চাকুরী করতে এসেছিলেন তখন তিনি ছিলেন একজন 'সাব অল্‌টার্ণ' মাত্র। ১৯৪১ সালে তিনি জঙ্গীলাট হয়ে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে তিনি পৃথিবীর বহু স্থান পরিভ্রমণ করে এসেছেন, রাশিয়াও। তিনি দেখেছিলেন, রাশিয়ানরা তেজোদৃপ্ত জাত; জারের অধীনেও তারা মাতৃভূমির জন্য চমৎকার লড়াই চালিয়েছে। ১৯৩৬ সালে তিনি সাদা রাশিয়ায় লালফৌজের কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন। সমর-দপ্তরে তিনি যে বিবরণী পাঠান তাতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, মার্শাল তুখাশেভ্‌স্কীর অধীনে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে লালফৌজ একটি দুর্দ্ধর্ষ রাজনৈতিক শক্তিহিসেবে গড়ে উঠ্‌ছে।

ওয়াভেলের সঙ্গে একদিন আমি তাঁর নায়াদিল্লীর বাড়ীর পিছনদিক্‌কার উদ্যানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলাম। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ককেসাসে ছিলেন; এই অবসরমুহূর্ত্তে তারি অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। মনে-পড়ে-যাওয়া কতগুলো রুশ্ ফ্রেজ্ তিনি আমাকে শোনালেন; তারপর হঠাৎ একসময় জর্জিয়ার সেই বিখ্যাত গাথাটি গাইতে স্থরু করলেন—আলাভেদি বোথ্ স্তোবয়।

ওয়াভেলের কাছে আদর্শ পুরুষ হচ্ছেন জেনারেল এলেনবী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ওয়াভেলের কম্যাণ্ডার ছিলেন। আমি যখন ভারতবর্ষে ওয়াভেল তখন এলেনবীর জীবনীর দ্বিতীয় অংশ রচনা করেছেন। দুঃখ করে তিনি বল্লেন যে, লিখবার জন্যে তিনি বড় কম অবসর পান। তারপর, লেখকমাত্রেরই যে দুর্ব্বলতা রয়েছে, ওয়াভেলও তারই পরিচয় দিলেন; পাণ্ডুলিপির একখণ্ড বের করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি তা পড়ে দেখতে ইচ্ছুক কনা। অসমাপ্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে গভীর আগ্রহভরেই আমি তা পড়ে দেখলাম। তাতে 'বানেম আরেফ' নামক একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্রকে তিনি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, বৃটিশ সৈন্যবাহিনী তাঁর মধ্যে একজন মস্ত বড় জেনারেলকে খুঁজে পেলেও ইংরেজী সাহিত্য একজন নিপুণ লেখককে হারিয়েছে। ১৯২২ সালে এলেনবী যখন মিশরের হাই-কমিশনার তাঁর সেই তখনকার কর্ম্মজীবনের মূল আখ্যানটুকুকে এই গ্রন্থখানির অনেকগুলি পৃষ্ঠা জুড়ে নির্দ্বিধায় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বৃটেনের অভিভাবকত্বের অবসান ঘটিয়ে মিশরকে আরও কিছুটা বেশী পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন এলেনবী; তাতে বৃটিশ সরকার নানারূপ আইনঘটিত আপত্তি উপস্থিত করায় এলেনবীর সঙ্গে তাদের বিরোধের সৃষ্টি হয়। নিজের বক্তব্য পেশ করবার জন্যে এলেনবী তখন লণ্ডনে চলে এলেন। প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, লর্ড মিলনার, লর্ড কার্জন—প্রকৃতপক্ষে কেম্টবিস্ট্‌দের নিয়ে

গর্ব্বিত বৃটিশ মন্ত্রিসভার সকলেই এলেনবীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। বিরোধীদের মধ্যে, ওয়াভেল লিখ্ছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ছিলেন উইনস্টন চার্চ্চিল।"

চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এলেনবী ভয় দেখালেন যে, পদত্যাগ করে' তিনি সমগ্র বিষয়টি বৃটিশ জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেন। প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়ায় যুদ্ধ জয় করে' এলেনবীই তুর্কীদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছিলেন, তাঁরই প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে তাড়াতাড়ি প্রথম মহাসমরের অবসান ঘটে; ফলে স্বদেশে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। কেলেঙ্কারীর ভয়ে এলেনবীর কাছে নতিস্বীকার করে' বৃটিশ সরকার তাঁর দাবী মেনে নিতে বাধ্য হলেন। লণ্ডনে মন্ত্রিসভার সঙ্গে এলেনবীর সংগ্রামের বিবরণী পড়তে পড়তে আমার মনে হলো, অনুরূপ অবস্থায় পড়লে ওয়াভেলও হয়তো এলেনবীরই আদর্শ অনুসরণ করবেন।

পাণ্ডুলিপি ফেরত দেবার সময় ওয়াভেলকে আমি একখানা চিঠি পাঠাই। তাতে আমি লিখি, "ভারতবর্ষকে স্বাধীনতাদানের বিরুদ্ধে এখানে আমি যে-সমস্ত আপত্তি শুন্তে পাচ্ছি, মিশরকে স্বাধীনতাদানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও চার্চ্চিল, লয়েড জর্জ, কার্জন, মিলনার এবং অন্যান্যেরা সেই একই আপত্তি তুলেছিলেন। তা সত্ত্বেও এলেনবী তাঁর দাবীকে আঁকড়ে ধরে থেকে জয়লাভ করেন। এ বিষয়ে আপনি নিঃসংশয় যে, এলেনবীর পথই ছিল ঠিক, মন্ত্রিসভার পথ ভুল। আপনার সঙ্গে আমি একমত; সরকার মাঝে মাঝে ভুল পথে চলেন। ১৯১৯ থেকে সুরু করে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস এই ভুল নীতি দিয়েই ভরা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে লণ্ডনের মনোভাবও যে খুব বিজ্ঞ, বৃটিশ মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপে তার কিছুমাত্রও পরিচয় নেই।"

মন্ত্রিসভার সঙ্গে এলেনবীর সংগ্রামকে ওয়াভেল যেরূপ

চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে পরবর্ত্তী এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাই। তাতে তিনি বল্লেন, "এলেনবীর বহু সামরিক সাফল্যের থেকে এ-বিজয় মহত্তর।"

আর একদিন বিকেলে আমি ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম; গোধূলির ম্লান আলোয় কথাবার্ত্তা বল্ছিলাম আমরা। আমরা তাঁর ডেস্কের ধারে বসেছিলাম। সেখানে দেখ্‌তে পেলাম, একটি খুপরির মধ্যে কালো মলাটের ছোট্ট একখানি বাইবেল রয়েছে। ওয়াভেল একখানি কবিতা-সংকলন প্রকাশ করেছেন। ম্যাথু আর্ণল্ড থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে তিনি আমাকে শোনালেন। লাল পেন্সিল দিয়ে ব্লটারের উপরে তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেখা টেনে চলেছিলেন। আবার তিনি বললেন, সাম্রাজ্যে বসে "আমরা বড় মেদ বাড়িয়ে ফেলেছিলাম।" বললেন, যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটেন তার উপনিবেশের প্রজাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্যই পায়নি। তিনি মন্তব্য করলেন, "ভারতীয়রা যে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখায় তা শুধু টাকা আর সম্মানের জন্যেই।" সামরিক চাকুরীটা এখানে বহু পরিবারেরই একটা ঐতিহ্যের মতো, পরিবারের সেই মর্য্যাদাকে তারা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে চায় মাত্র।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ওয়াভেল একজন দার্শনিক-শিল্পী। যে সমস্ত আমলাতন্ত্রী দৈনন্দিন ঘটনাবলীর বিবরণী নিয়েই মত্ত থাকেন ওয়াভেল তাঁদের দলের কেউ নন। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষের প্রতিটি জেলায় কী ঘট্‌ছে বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গো রাত জেগে জেগে তার পর্ব্বতপ্রমাণ বিবরণ পড়তেন। অনুবীক্ষণ দিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছেন, দূরবীক্ষণ দিয়ে নয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে আমেরিকার স্বাধীনতালাভের দিবস উপলক্ষে লর্ড লিনলিথগো ৪ঠা জুলাই তারিখে তাঁর নয়াদিল্লীর জমকালো মর্ম্মর প্রাসাদে এক পার্টি দিয়েছিলেন; সেখানে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা-দানের

বিপক্ষে আমি সর্ব্বপ্রকার যুক্তিই শুন্‌লাম। ব্রহ্মদেশে স্যর হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডারের প্রধান উপদেস্টা ছিলেন জেনারেল উইনটারটন; তিনি আমাকে বল্‌লেন, "স্বাধীন ভারত কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে ?"

উত্তর দিলাম, "স্বাধীন ইংলণ্ডই কি পারে ?"

এককভাবে যারা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ শুধুমাত্র সেই সমস্ত দেশকেই যদি স্বাধীনতা দিতে হয়, তবে তো কাউকেই স্বাধীনতা দেওয়া চলেনা; সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, ফ্রান্স এবং আরো অনেককে তো নয়ই। জেনারেল উইনটারটনের প্রশ্ন থেকেই বুঝতে পারা যায় যে মানবসমাজের পক্ষে আজ এমন একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার যা স্বাধীন ভাররবর্ষ, স্বাধীন ইংলণ্ড, স্বাধীন রুশিয়া এবং অন্যান্য সমস্ত স্বাধীন জাতিকেই আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা করবে। সমাজের কাছে অত্যাচারী এবং পররাজ্যদখলকারীদের অপেক্ষা অসহায় মানুষ এবং অসহায় দেশগুলিরই মূল্য বেশী; স্বাধীনতা পাবার অধিকারও তাঁদেরই বেশী।

সেই সন্ধ্যাতেই আমাকে বড়লাটের সুন্দরী পত্নী লেডী লিন্‌লিথগোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। প্রথমে তিনি আবহাওয়া নিয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তে চেস্টা করলেন। প্রতি সন্ধ্যাতেই তখন একশো দশ ডিগ্রী উত্তাপ; সকলেই ঘর্ম্মাক্তকলেবর। কিন্তু তারপরেই আমরা রাজনীতির আওতায় গিয়ে পড়লাম। তিনি বল্‌লেন, "ভারতবাসীরা কি নিজেদের শাসন করতে সমর্থ ?"

উত্তরে আমি বললাম, "আজকের রাত্রে এ প্রশ্ন বড় অদ্ভুত শোনায়। ১৭৭৬ সালে তেরটি মার্কিণ উপনিবেশ সম্পর্কেও বৃটিশ টোরীরা ঠিক এই কথাই বলেছিলেন।"

ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি ইংরেজই দৃঢ়ভাবে বল্‌বেন যে, বৃটেন শীঘ্রই ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবে। বড়লাটের শাসন-পরিষদের স্বরাষ্ট্র

বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যর রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল তাঁর বাড়ীতে এক ভোজসভায় আমাকে বললেন, "যুদ্ধের পরেই বৃটেন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবে। বরাবরই আমার ধারণা, আমরা কবে ভারতবর্ষ ত্যাগ করবো সে কথার উল্লেখ না করে আমরা ভুল করছি। আমার মনে হয় যুদ্ধের পর দু' বছরের মধ্যেই আমরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করবো।"

জেনারেল ওয়াভেলকে আমি একদিন বলেছিলাম, "ভারতবর্ষে এখন যে অবস্থা, তা পাঁচ কি দশ বছরের বেশী চলতে পারেনা।"

ওয়াভেল দৃঢ়ভাবে আমাকে সমর্থন করে বলেছিলেন, "খুবই সত্য কথা।"

দ্বিতীয়বার আমি যখন বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তিনি আমাকে বলেন, "ভারতবর্ষে অবস্থানের কিছুমাত্র অভিপ্রায় আমাদের নেই। অবশ্য কংগ্রেস সে কথা বিশ্বাস করেনা। কিন্তু সত্যিই আর আমরা ভারতবর্ষে থাকবোনা।" কংগ্রেস একথা বিশ্বাস করেনি, কোনও ভারতবাসীই করেনা। কারণ, যে মুখে তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষ ত্যাগ করবেন, সেই মুখেই আবার তাঁরা ভারতবর্ষে অবস্থানের স্বপক্ষে অবিরাম যুক্তি প্রদর্শন করছেন।

কাগজপত্র ঘেঁটে এবং স্মৃতিমন্থন করে' এমন একটিও দৃষ্টান্ত আমি খুঁজে বের করতে পারলামনা যেখানে ভারতবর্ষের কোনও বৃটিশ কর্ম্মচারী বা কোনও রক্ষণশীল ইংরেজ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের স্বপক্ষে কোনও যুক্তি দেখিয়েছেন। ঠিক তার উল্টো। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাবার জন্যে ভারতবর্ষের বাইরে, বিশেষতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, বৃটিশ সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। তারা এই কথাটার উপরেই জোর দিতে চেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনলাভের যোগ্য নয়। এই কারণেই, বৃটিশ সরকারের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির উপর ভারতবাসীদের কিছুমাত্র আস্থা নেই।

ভারতবাসী এবং বৃটিশের মধ্যে এই যে আস্থার অভাব ভারতের অবস্থা সম্পর্কে এইটাই হলো অন্যতম মূল কথা।

১৯৪২ সালে জাপানীরা এসে ব্রহ্মদেশ দখল করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেখানকার বৃটিশ গভর্ণর ছিলেন স্যর রেজিন্যাল্ড ডরমান-স্মিথ; লণ্ডনের "এশিয়াটিক্ রিভিয়ু কোয়ার্টার্লি" পত্রিকার ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় এক প্রবন্ধে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পূর্ব্ব-এশিয়ায় বৃটিশ-শক্তির দ্রুত পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব্ব-এশিয়া সমস্যার পুনর্বিবেচনা প্রসঙ্গে তিনি বল্‌লেন, "একটি কথা আমি নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি; আমাদের কথা বা উদ্দেশ্য এর কোনটার সম্পর্কেই পৃথিবীর এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে কিছুমাত্রও আস্থা নেই। এর কারণ নির্দ্দেশ করাটাও কিছুমাত্র শক্ত নয়। ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের সামনে আমরা এতবেশী রাজনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে এসেছি যে, কোনও পরিকল্পনা দেখবামাত্রই বা কথাটি শুন্‌বামাত্র তারা এখন মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা এখন মনে করে যে, নির্দ্দিষ্ট কোনও কর্ম্মপন্থা এড়াবার ফন্দীতেই বৃটিশরা এখন এই সমস্ত পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা অন্ততঃ তাই বলে। শত্রুমিত্র সকলের কাছেই সে পরিকল্পনার অর্থোদ্ধার করা শক্ত। তাই, আমাদের পরিকল্পনা দেখলে শুধুমাত্র আমাদের শত্রুরাই যে ঘাবড়ে যায় তা নয়, মিত্ররাও যায়।"

ব্রহ্মকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অথচ তা সত্ত্বেও ১৯৪২ সালের ৩১শে মে রবিবারের স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় দেখা গেল যে, স্যর হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার—ব্রহ্মদেশ জাপ-অধিকৃত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইনি ছিলেন সেখানকার জঙ্গীলাট—নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের কাছে বললেন, "আমাদের ব্রহ্মকে পুনর্দখল করতেই হবে, ব্রহ্ম হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই অংশ।"

ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতালাভ করবে, সেই সঙ্গে সে হবে বৃটিশ

সাম্রাজ্যেরই অংশ। তা কেমন করে হয়? এই পরস্পর-বিরোধী উক্তি নিয়েই স্যর রেজিন্যাল্ড ডরম্যান-স্মিথ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছেন। তিনি লিখছেন, "গ্রেট বৃটেনের নীতি হলো এই যে, ব্রহ্মকে সে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের লক্ষ্যেই পৌছে দেবে। ....সুতরাং ব্রহ্মকে এমনভাবে গড়ে তোলাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য যে, তার যেন বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আস্‌বার কিছুমাত্রও ইচ্ছে না থাকে।...."

স্যর রেজিন্যাল্ড তারপরেই বলছেন যে, 'স্বাধীনতা' কথাটির অর্থ ঠিকভাবে বুঝতে হবে। তিনি বলছেন, "ভিন্ন ভিন্ন রকম লোক যে এ কথাটির ভিন্ন ভিন্ন রকম অর্থ করে নিতে পারেন আমাদের আজ তা বিস্মৃত হবার আশঙ্কা রয়েছে।" তিনি আরো বল্‌ছেন, "স্বাধীনতা অর্থে আমরা কি বুঝি—ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের কাছে তা আজ পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার করে বলাই সঙ্গত কিনা সে কথাটাও আজ আমাদের বিবেচনা করে দেখা দরকার।"

তা হলে দেখা গেল যে, বৃটিশের একটি সাম্রাজ্যবাদী শব্দকোষ রয়েছে; সেখানে সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থানের নামই হলো স্বাধীনতা।

স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ ভারতবর্ষে এসে চার্চ্চিল-সরকারের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক মর্য্যাদা দানের প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন যে, প্রথমেই সে সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে পারবে। এ হলো ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের কথা। অথচ ১৯৪২ সালেরই নভেম্বর মাসে চার্চ্চিল বললেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যকে উড়িয়ে দেবার অভিপ্রায় নিয়ে আমি রাজার প্রধানমন্ত্রী হইনি।" ভারতবর্ষের সম্পর্কেই তাঁর এই বিখ্যাত ঘোষণা। ফলে, বৃটিশরা যখন ভারতবর্ষ ত্যাগের কথা বলেন, ভারতবাসীদের তখন সন্দেহ হয় যে, এটা একটা কথার কথা মাত্র।

একটি চীনা প্রবাদবাক্য আছে যে, ঠিক জিনিষকে ঠিক নামে ডাকাটাই হলো জ্ঞানের প্রথম স্তর।

অষ্ট্রেলিয়া এবং কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউ জীল্যাণ্ড, এবং আয়ারও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আজ স্বাধীন। যুদ্ধই সে কথা প্রমাণ করেছে। আয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি। অপর চারটি ডোমিনিয়ন স্বেচ্ছাতেই মাতৃভূমির পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে সাব্যস্ত করলো। ঐক্যবদ্ধভাবে তারা বীরত্বের সঙ্গেই যুদ্ধ চালিয়েছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর রাজনীতিতে এটা একটা চমকপ্রদ ব্যাপার।

ইংলণ্ড সম্পর্কে ভারতবর্ষের মনোভাব অবশ্য অন্যরকম। বৃটিশরা এখানে যে কার্য্যকলাপ চালিয়েছে, ভারতীয়রা তাতে বৃটিশ সরকারের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে উঠতে পারেননি। বৃটিশরা সে-কথা জানে, এতে তারা ব্যথিত। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস আজ তার মনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক জ্বলন্ত কামনার সৃষ্টি করেছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে কোনও রকম রাজনৈতিক সম্পর্কের গ্রন্থিতেই সে আর নিজেকে বাঁধা পড়তে দিতে চায়না।

আর একটা প্রশ্ন এখানে জড়িয়ে আছে—তা হলো বর্ণ বৈষম্য। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই বর্ণ বৈষম্যই মূল সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীতে শ্বেতাঙ্গদের চাইতে অশ্বেতদের সংখ্যাই বেশী। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তারা নিপীড়িত। শ্বেতাঙ্গদের বোঝা বহন করে' করে' তারা এখন বিরক্ত, ক্লান্ত। শ্বেতাঙ্গদের যান্ত্রিক বুদ্ধিকৌশল, অর্থসম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে তারা স্বীকার করে বটে, কিন্তু তাদের নীতিবুদ্ধি বা রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে তারা স্বীকার করেনা। শ্বেতাঙ্গদের যুদ্ধ-চালানোর শক্তিকে তারা স্বীকার করে বটে, তাই বলে তার শান্তিস্থাপনের সামর্থ্যকে স্বীকার করেনা।

পাশ্চাত্ত্যের অধিবাসীরা বন্ধুভাবে এশিয়ায় অবস্থান করতে পারে। প্রভু হিসেবে তারা আর বেশীদিন সেখানে থাকতে পারবেনা। যে ভারতবর্ষ এবং চীন এতদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের খোঁজ খবর রাখতনা তারাই এখন নিজেদের প্রতিবেশী-সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে তুলছে।

আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই চীন অথবা ভারতবর্ষ, নয়তো রুশিয়া, অশ্বেত মানবদের নেতৃত্বলাভের জন্য চেষ্টা করবে; সংখ্যায় তারা একশত কোটিরও বেশী। 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য'—জাপান তার 'আপন সমৃদ্ধির জন্যেই এই সাম্রাজ্যবাদী দাওয়াই প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও এশিয়াবাসীরা এই দাওয়াই প্রয়োগ করতে পারে। সেটা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

পাশ্চাত্যের সম্পর্কে প্রাচ্যের মনে যেটুকু ভালোবাসা রয়েছে, সে তুলনায় প্রাচ্যের উপরে পাশ্চাত্য বড় বেশী পরিমাণেই বলপ্রয়োগ করেছে।

প্রাধান্যের চিন্তাটা শ্বেতাঙ্গ মানুষের আজ এতখানি মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, সেটা যে অপরকে ব্যথিত করতে পারে তা সে ভুলে যায়। এ-কথাও সে ভুলে যায় যে, সে-প্রাধান্যও সে হারাতে বসেছে।

ইংরেজরা বলেছেন : ভারতবাসীরা নিজেদের দেশকে শাসন করতে অসমর্থ। ভারতবাসীরা বলেন : সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করা শ্বেতাঙ্গ-সমাজের সাধ্যায়ত্ত নয়। দুই বিশ্বযুদ্ধ এবং তার অন্তর্ববর্ত্তীকালের অশান্তি, মননগত বিশৃঙ্খলা, দুঃখযন্ত্রণা এবং একনায়কত্বের বিকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

ভারতবাসীরা আরো বলেন, ভারতবর্ষকে শাসন করবার সামর্থ্য বৃটেনের নেই। তাঁরা বলেন, ইংলণ্ড ভারতকে ঠাণ্ডা করে রাখতে পারে সত্যি—তাই বলে তার অন্নবস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেবার সামর্থ্য ইংলণ্ডের নেই। ক্রমান্বয়ে দুর্ভিক্ষ হওয়াটা শাসন-দক্ষতার পরিচয় নয়। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, বিশেষভাবে সেই দুর্ভিক্ষই ভারতবাসীদের রোষবিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। হিসেব করে দেখা গেছে যে, সেই বিপর্য্যয়ে ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে। অন্ততঃ দশ লক্ষের কম কেউই বলেননি। সাড়ে বারো কোটি ভারতীয়ের ম্যালেরিয়ার কবলিত হওয়া এবং প্রতি বৎসর

তাতে এক লক্ষ করে' লোকের মৃত্যু ঘটার মধ্যেও শাসন-দক্ষতার পরিচয় নেই। পূর্ব্বে পড়্‌তে এবং লিখ্‌তে জানলে তবে তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হতো : ১৯৪১ সালের আদমসুমারিতে শুধুমাত্র পড়তে জানাটাকেই 'শিক্ষা'র মানদণ্ড বলে ধরা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঐ আদমসুমারি অনুসারে ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা মাত্র ১৩'৬ জনই হলো শিক্ষিত। এটাও শাসনদক্ষতার পরিচয় নয়। শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, ভূমিস্বত্বের বি-সম ব্যবস্থা এবং দীর্ঘকালীন বৈদেশিক প্রভুত্বের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে নৈতিক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে—(লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো আমাকে বলেছিলেন, "আমরা হলাম দখলকারী শক্তি")—তা আজ বৃটিশদের সম্পর্কে ভারতীয়দের অসহিষ্ণু করে তুলেছে; কখনো কখনো অসঙ্গতভাবেও। ভারতবর্ষে এইটেই হলো আজ সব চেয়ে বড় কথা।

ভারতবাসীদের মধ্যে অগণিত দক্ষ শাসক, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, প্রকাশক, অর্থনীতিবিদ্‌, সমাজতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, আইনজ্ঞ, প্রচারক, শিক্ষাবিদ্‌ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ হওয়ার উপযুক্ত অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন; তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনাও প্রমাণসিদ্ধ। স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ আমাদের বলেছেন, বড়লাটের ধারণা এই যে, ভারতবর্ষ আজ নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করতে সমর্থ। ১৯৩৯ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে কমন্সসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ক্রীপ্‌স্‌ বলেছিলেন, "অধিকার, ন্যায়বিচার এবং নীতির দিক থেকে ভারতবর্ষ যে আজ স্বায়ত্তশাসনলাভের অধিকারী—একথা কেউ অস্বীকার করবেননা বলেই আমার ধারণা। ভারতবাসীরা যে আজ নিজেদের হাতে শাসনভার গ্রহণ করতে সক্ষম—বড়লাট তা পুরোপুরিভাবেই স্বীকার করে নিয়েছেন। অধিকার এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে আমাদের যে নির্দ্দিষ্ট ধারণা রয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া অধিকারের অংশ

হিসেবে ভারতবর্ষের উপরে শোষণ চালিয়ে যাবার স্বার্থপর লিপ্সা যদি সেই ধারণাকে ডিঙিয়ে না যায় তা-হলে সেই দাবীর কোন্ উত্তর আজ আমরা দেব ?”

ভারতবর্ষ তাহলে নিজেকে নিজে শাসন করতে সমর্থ। বৃটিশরাও সে কথা জানেন। ভারতবর্ষে তাঁরা যে অবাঞ্ছিত—তাও তাঁদের অজানা নয়।

রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষকে দিয়ে ইংলণ্ডের যদি কোন কাজ থেকে থাকে, তা' হলে বৃটিশ প্রজারাই তো স্বাধীন ভারতবর্ষে টাকা খাটাতে, কাজকর্ম্ম চালাতে এবং তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারেন। সাম্রাজ্যের বাইরে আর্জেন্টিনা এবং আরো নানাদেশের সঙ্গে ইংলণ্ড ব্যাপক এবং লাভজনকভাবেই ব্যবসা চালাচ্ছে। অবশ্য ভারতবর্ষের উপর তার রাজনৈতিক আধিপত্য থাকায় একান্তভাবে সে কতগুলি অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা লাভ করে এসেছে: তবে সেটা ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের প্রতি তার অন্যায় আচরণ। অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ থেকে ভারতবর্ষ একটি রুদ্ধদ্বার দেশ। তার চাবি ইংলণ্ডেরই হাতে। মাঝে মাঝে প্রতিযোগিদের কাছেও সে দুয়ার খুলে দেয় বটে, তবে সাধারণতঃ নিজের স্বার্থেই খোলে।

প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে টিঁকে থাক্‌বার জন্যেই কি আজ ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষকে হাতে রাখা প্রয়োজন? তাই যদি হয়, তবে সে যুক্তিতে বৃটিশের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রভুত্ব ভারতবাসীদের কাছে কাম্য হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। ইংলণ্ডকে শক্তিশালী করবার জন্যে তারা কেন পরাধীন হয়ে থাক্‌তে যাবে ?

“প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ইংলণ্ড যে বড় বড় বাহিনী গঠন করেছিল বীরত্বের সঙ্গেই তারা সংগ্রাম চালিয়েছে। দ্রুত জয়লাভে সাহায্য করেছে তারা।”

ভারতবর্ষকে চিরকাল প্রভুত্বাধীন করে রাখবার স্বপক্ষে এই যুক্তি প্রয়োগ করা হতে পারে। কিন্তু জাপানের চীনজয়ের স্বপক্ষেও এ যুক্তি প্রয়োগ করা চল্‌তো। টোকিওর কাছে সেটা জনবলের কী চমৎকার উৎসই না হতো!

"জাপান যেমন চীনকে গ্রাস করে নিয়েছিল, ভারতবর্ষের উপর বৃটেনের আধিপত্য না থাক্‌লে, এই সমৃদ্ধ উপনিবেশটিকেও সে হয়তো তেম্নি করেই গ্রাস করে নিত।" কিন্তু এ-কথার এই উত্তর নয় যে, তার জন্যে ভারতবর্ষ এবং চীনকে উপনিবেশ করেই রাখ্‌তে হবে। এ-কথার উত্তর হলো এই যে, তারা যাতে আক্রমণ-প্রতিরোধে সমর্থ হয়ে উঠ্‌তে পারে তারই জন্যে তাদেরকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং স্বাধীন করে তুল্‌তে হবে। অন্য কারুর দখলের আশঙ্কাতেই যদি আজ ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষে তার দখল বজায় রাখ্‌তে হয় তবে তো ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, বুলগেরিয়া—বস্তুতঃ প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল দেশকেই আজ দু-তিনটি প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে কারুর না কারুর উপনিবেশ করে রাখা উচিত। কিছুদিন বাদে কেউ হয়তো আবিষ্কার করবেন যে, নিজেকে রক্ষা করবার মতো সামর্থ্য ইংলণ্ডেরও নেই, সুতরাং সেও আমেরিকা অথবা রুশিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলেই বুদ্ধির কাজ করবে। যে সমস্ত জাতি আত্মরক্ষায় অসমর্থ তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়ে শান্তিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আজ বাধা কোথায়?

আন্তর্জ্জাতিকতার ঠিক উল্টো বস্তু হলো সাম্রাজ্যবাদ। প্রভাবাধীন এলাকা জমাট বাঁধলেই তা সাম্রাজ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর সে সাম্রাজ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রভাবকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

"জোর যার মুল্লুক তার" নীতিরই বাস্তব রূপ হলো সাম্রাজ্য। ইংলণ্ডকে কেউ ভারতশাসনের অধিকার দেয়নি। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণই নীতিবিগর্হিত।

গ্রামে গ্রামে এবং কোনও কোনও অঞ্চলে, সাম্রাজ্যবাদ স্থানীয় অধিবাসীদের হিতসাধনও করে। পাশ্চাত্য প্রভুত্বের কল্যাণেই এশিয়া আজ সে প্রভুত্বের অবসান ঘটাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন। বিশেষ করে পরবর্ত্তীকালে সে প্রভুত্ব যখন অর্থনৈতিক, আত্মিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে উপনিবেশগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে আরম্ভ করলো তখন থেকেই সে এ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তা সত্ত্বেও নিজেকে সেখানে কায়েম করে রাখে, স্বার্থপর লোভের তাড়নাতেই সে এখানে এসেছিল। উপনিবেশের স্বার্থটা একটা গৌণ বিষয় মাত্র।

১৯৩০ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে চার্চ্চিল দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষ যদি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তবে তা বৃটিশ সাম্রাজ্যেরই পতনের সূচনা করবে; সে পতনকে সে সম্পূর্ণও করে তুল্‌বে।" ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসেও বিষয়টিকে পুনর্ব্বার পুরোপুরি ভাবে ইংলণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখে' তিনি বল্‌লেন, "ভারতবর্ষ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তবে তা আমাদের প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়াবে। যে প্রক্রিয়াফলে আমরা একটা দুর্ব্বল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারি এটা তারই একটা অনিবার্য্য অঙ্গ না হয়ে যায়না।"

"দুর্ব্বল রাষ্ট্র" ধারণাটা উনিশ শতকীয়। সরকারের এবং মানবিক সমস্ত প্রচেষ্টারই লক্ষ্য হচ্ছে ব্যষ্টির সুখবিধান। শান্তিকালীন অবস্থায় ডেনমার্ক, সুইডেন অথবা সুইজারল্যাণ্ডের একজন নাগরিকের অবস্থা মোটামুটিভাবে একজন বৃটিশের অবস্থার চাইতে ভালোই। তারা দুর্ব্বল রাষ্ট্রের নাগরিক কিনা সে প্রশ্নে কী এসে যায়? পররাজ্য দখলের সঙ্গে ব্যষ্টির সুখবিধানের সম্পর্ক কোথায় তা আমি খুঁজে পাইনি। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে এই রাজ্যদখলের ফলে যুদ্ধ-বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছে।

প্যালেষ্টাইনে নিরুদ্বেগ দশ দিন

কথনো বেলুচিস্থানে যাবো বলে ভাবিনি। আমার কাছে তা ছিল একটা নাম মাত্র, মানচিত্রের ওপরে একটা বিন্দু। আমাদের ভারতত্যাগের দিনই বিমানটি এসে বেলুচিস্থানে পৌঁছুলো। সেখান থেকে আরবে, তারপর ইরাকে। নিউ ইয়র্কে ফিরিবার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম; ভেবেছিলাম যে, বেশীক্ষণের জন্যে আর কোথাও থামতে হবেনা।

সময়সূচীতে দেখলাম, মৃত-সাগরের তীরে ক্যালিয়ায় পৌঁছে লাঞ্চ পাবার কথা। ভূপৃষ্ঠের উপরে এইটেই হলো সব থেকে নীচু স্থান; নানারঙা রাসায়নিক সম্ভারে সমৃদ্ধ। বস্‌রা থেকে তাই, আমার সঙ্গে এসে আহার করবার অনুরোধ জানিয়ে, জেরুজালেমের ইংরেজী দৈনিকপত্র 'প্যালেস্টাইন-পোস্ট'এর সম্পাদক গারসন অ্যাগ্রনস্কিকে একটা তার করে দিলাম। একসঙ্গে আমরা ফিলাডেলফিয়ায় কাটিয়েছিলাম; তখন আমরা যুবক। তাকে আরো জানালাম যে, সে যেন তার অন্যান্য বন্ধুদেরও আসতে অনুরোধ করে।

ইহুদী রাষ্ট্রের দাবী প্রচার করবার জন্য গারসন তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছে। ঘণ্টাখানেকের পথটুকু অতিক্রম করে তার স্ত্রী এথেল ক্যালিয়ায় এসে পৌঁছুলেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুও এলেন, নাম ইডা ব্লুম ডেভিডোভিচ্‌। তিনিও আমারই মতো ফিলাডেলফিয়ার বাসিন্দা।

আমি কি ঠিক করেছি তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন। শ'খানেক গজ দূরে সবুজ জলের উপরে ভাসমান বিরাট সী-প্লেনখানা দেখিয়ে দিয়ে দুঃখের সঙ্গে তাঁদের জানালাম যে, তাড়াতাড়ি আমাকে বাড়ী ফিরতে

হবে। পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি নিউ ইয়র্কে গিয়ে পৌঁছুবো বলে আশা করছিলাম। এদিকে এথেল পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লেন, একবার আমাকে জেরুজালেমে যেতেই হবে। বল্‌লাম তা অসম্ভব। বিমানের আসনটি একবার হাতছাড়া করে ফেললে তারপর কয়েক সপ্তাহ, চাই কি কয়েক মাসের মধ্যেও তা আর না মিল্‌তে পারে। আধঘণ্টার মধ্যেই বিমানটির সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও এখান থেকে যাত্রা করতে হবে।

নানারকম যুক্তি দেখিয়ে তারপর তাঁরা অনুনয় বিনয় করতে সুরু করলেন। আমি বললাম—না। অবশেষে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলাম—না-ই বা কেন? তারপর আর ভাবনা-চিন্তা না করেই বিমানটি থেকে মালপত্র নামিয়ে নিয়ে এসে আমরা জেরুজালেমের দিকে যাত্রা করলাম। পৃথিবীর সুন্দর এবং রোমাঞ্চকর সহরগুলির মধ্যে জেরুজালেম অন্যতম। পথে দেখ্‌লাম দুর্গম বাদামী পাহাড়গুলির মধ্যে বৃটিশরা সুড়ঙ্গ বসাচ্ছে, আর বালির বস্তা সাজিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করছে। নাৎসী জেনারেল রোমেল তখন যেখানে এসে পৌঁছেচেন কায়রো থেকে তা মাত্র তিন ঘণ্টার পথ, সুয়েজ খালের অবস্থাও তিনি বিপদাপন্ন করে তুলেছেন। একবার যদি তিনি ভেঙেচুরে ঢুকে পড়তে পারেন তাহলে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি প্যালেস্টাইনে এসে হাজির হবেন।

১৯১৯, ১৯২০ এবং ১৯৩৪ সালের মতো এবারেও আমি স্কোপাস্ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করলাম, গেৎসেমেন-এর জলপাই-কুঞ্জের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ালাম আর ভায়া ডলরোজা দিয়ে এগিয়ে গেলাম। এবারেও করুণস্মৃতি বিজড়িত শোক-দেওয়ালের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম. ওমর মসজিদ দেখে এবারেও উচ্ছ্বসিত হলাম আগের মতই। জেরুজালেমের ধূলিধূসর প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডই প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। কতকগুলি দৃশ্য দেখে তো মনে হয়

সেগুলিকে যেন বাইবেলের পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক, স্বাচ্ছল্যকর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়া সহরের পত্তন হয়েছে পুরোনো জেরুজালেমের পাশেই। ইহুদীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসস্থান গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে সমস্ত ইহুদী বাইরের থেকে এখানে এসে প্রবেশ করেছে তারাই গড়ে তুলেছে এই নতুন সহর। নির্ম্মাতা হিসেবে ইহুদীরা তাদের এই কীর্ত্তির জন্য গর্ব্বিত। ইহুদী পথিকৃৎরা গ্যালিলি এবং ইজ্‌ড্রেলন উপত্যকায় যে কৃষি-পত্তন গড়ে তুলেছে আমাকে তা দেখে আস্‌তে অনুরোধ করা হয়েছিল। পোল্যাড, জারের রুশিয়া, রুমানিয়া এবং অন্যান্য দেশের তাড়া-খাওয়া ইহুদীরা এখানে চলে আসে; প্যালেষ্টাইনের নবাগত ইহুদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এই পাহাড়িয়া বন্ধ্যা অনাবাদী জমি এবং ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত জলাগুলিকে ফলের বাগানে পরিণত করেছে। হাজার হাজার কৃষক এখানে ন্যূনতম পরিশ্রমে সর্ব্বাধিক উৎপাদন-এর ভিত্তিতে কৃষিগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। তাদের নাম কভুৎসোৎ বা মুয়োশাভোৎ।

পত্তনগুলি আমি দেখ্‌তে যাইনি। তার কারণ তাদের সাফল্যের কথা আমি আগেই জান্‌তাম। আরো একটি কারণ হলো এই যে, ভারতবর্ষ থেকে যে ধারণা এবং যে-পরিমাণ শ্রান্তি নিয়ে আমি ফিরে এসেছি তাতে আমার দেহমন তখন ভারাক্রান্ত। তা ছাড়া প্যালেষ্টাইনের মূল রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থাৎ আবব ইহুদী সমস্যা সম্পর্কেই তখন আমি বেশী আগ্রহান্বিত।

বৃটিশ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে রোমেলের জয়লাভে আরবরা তখন উৎসবমত্ত। রোমেলের প্যালেষ্টাইন-প্রবেশকালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আরব গ্রামগুলিতে তখন নিশান এবং পতাকা তৈরী করে রাখা হয়েছে। নাৎসী এবং আরবরা

একত্রিত হয়ে সাংঘাতিক এক ইহুদীনিধনপর্ব্ব উদ্‌যাপন করতে পারত। আমার কয়েকজন মার্কিণ-ইহুদী বন্ধুকে —তাদের কাছে অর্থ এবং ছাড়পত্র দুইই ছিল—আমি পরামর্শ দিলাম যে, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের পক্ষে আমেরিকায় গিয়ে থাকাটাই সঙ্গত। তাতে তারা এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন আমি প্রলাপ বক্‌ছি। তারা স্থানত্যাগ করবেনা। যদি রোমেল আসে, এবং আরবরা যদি ইহুদীদের হত্যা করতে চেষ্টা করে তাহলে তারা প্যালেষ্টাইনের পাঁচ লক্ষ ইহুদীদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আধা-সামরিক কয়েকটি ইহুদী সংগঠনও তখন সশস্ত্র প্রতিরোধে প্রস্তুত। অন্যান্য ইহুদী যুবকরা এর আগেই বৃটিশ সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে ; মিশর, লিবিয়া এবং তারপরে ইটালীতে যুদ্ধ চালিয়েছে তারা। আরবরা বৃটিশবিরোধী, চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সাহায্য দেয়নি।

ইহুদীরা সাহসী এবং দৃঢ়সংকল্প কিছুমাত্র বিষণ্ন বা মুহ্যমান নয়। তখনও তারা যথারীতিই গঠনকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে।

ভূমধ্যসাগরের তীরে ইহুদীদের নতুন সহর তেল আবিব—সেখানে আমি ডেভিডোভিচ্ পরিবারের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলাম। হ্যারি এস ডেভিডোভিচ্ আগে ফিলাডেলফিয়া এবং ক্লীভল্যাণ্ডে ছিলেন। নকল দাঁত তৈরী করেন তিনি ; শেক্সপীয়রের রচনাবলী তিনি হিব্রুতে অনুবাদ করেছেন। দুই মেয়ের মধ্যে বড়টির নাম সুসান ডেভিডোভিচ্, বয়স উনিশ। হুলা হ্রদের তীরে নতুন একটি কৃষি-প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করছে ; জায়গাটি ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত। তার মাতাপিতা ধনী, তবুও ইহুদী-প্যালেষ্টাইনকে গড়ে তুলবার জন্যে যে সৃষ্টির আগ্রহ এবং আদর্শবাদী অনুরাগ তার মনে সঞ্চারিত হয়েছে এই শ্রম তারই পরিচয়। শতাব্দীব্যাপী অবহেলার কবল থেকে এই সমস্ত অঞ্চলকে উদ্ধার করবার সাধনায় তারই মত আরো হাজার হাজার জন

প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়েছে, নয়তো চিরকালের জন্য স্বাস্থ্য হারিয়েছে তারা।

গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের জন্যেও সুসান বড় একটা তার সঙ্গীদের ছেড়ে আসতোনা। তবে তার মা-বাবা এবং আমি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায় তার কাছ থেকে একটা সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল।

একদিন লাঞ্চের পরে হ্যারি ডেভিডোভিচ্ এবং আমার মধ্যে আরব-ইহুদী প্রশ্ন সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলছে। টেবিলের ধারে আমাদের দুজনের মাঝখানে বসে আছে সুসান; মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেও সে একটি কথা বলেনি। খাপছাড়াভাবে হঠাৎ সে বলে উঠ্লো, "কৃষি-পত্তনে আমরা একটা নতুন আলুবাছাইর যন্ত্র পেয়েছি।"

যদিও সুসান অতশত ভেবে এ-কথা বলেনি তবুও মনে হলো আরব-সমস্যা সম্পর্কে এই-ই হলো ইহুদীদের যথার্থ উত্তর। আরবদের ভয়াবহ জুলুমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইহুদীরা আজ একটির পর একটি ইঁট গেথে তুল্ছে, আলুবাছাইয়ের জন্যে নতুন নতুন যন্ত্র সংগ্রহ করে যাচ্ছে তারা।

প্যালেষ্টাইনে একটি ইহুদীরাষ্ট্র অথবা কমনওয়েল্থ্ প্রতিষ্ঠা করাই হলো জিয়নিজ্মের লক্ষ্য। তার জন্যে প্যালেষ্টাইনের অধিবাসিদের মধ্যে ইহুদীদের সে সংখ্যাগরিষ্ঠ করে তুল্তে চায়। দেশটির ইহুদী এবং আরব অধিবাসিদের সংখ্যা অনুমাণিকভাবে যথাক্রমে পাঁচ এবং দশ লক্ষ। বিশেষ ব্যক্তিদের ধারণা, সেচ, বিজলী এবং শিল্পব্যবস্থার প্রথা চালু হলে প্যালেষ্টাইনে আরও লক্ষ লক্ষ লোক বসবাস করতে পারে।

বাইবেলে স্তোত্রকার বলেছেন, "তোমাকে যদি বিস্মৃত হই জেরুজালেম, তবে আমার হাত যেন অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়, আমার জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে।" শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

খণ্ডছিন্নবিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ইহুদীদের মন থেকে প্যালেস্টাইনে ফিরে আসবার আকাঙ্ক্ষা মুছে যায়নি। যারা গোঁড়া ইহুদী, প্যালেষ্টাইন তাদের ধর্ম্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে; যারা ধর্ম্মপ্রাণ নয়, প্যালেস্টাইনই তাদের ধর্ম্ম। মুখ্যতঃ, পুরোনো ঘর, প্রাচীন জন্মভূমির হাতছানি থেকেই ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবীর সৃষ্টি। দেশে দেশে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ছাঁচে নিজেদের ঢেলে নিয়ে জীবনধারণ করেছে; নিজের জীবন, নিজের শাসনব্যবস্থা নিয়ে নিজের দেশে তারা কখনো জীবনধারণ করেনি। নাড়ীর টানে অগণ্য ইহুদী আজ প্যালেস্টাইনের কাছে একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। যে লক্ষ লক্ষ লোক কোনওদিন সেখানে যায়নি, কোনওদিন সেখানে যাবার আশাও যাদের নেই—ইহুদীদের জাতীয়-পুনরুত্থানের স্বপ্ন তাদের মধ্যেও আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে।

এটা একটা ভাবপ্রবণ অনুভূতি, সুতরাং বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখেনা। ফিলাডেলফিয়ায় থাকতে তরুণ বয়সে ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবীর সমর্থক হিসেবে আমারও এরকম একটা অনুভূতি ছিল। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ইহুদী-পল্টনে নাম লিখিয়ে ১৯১৮ সালে আমি প্যালেষ্টাইনে যাই। ২৯২০ সাল পর্য্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। সে অনুভূতি আজ আর আমার নেই। প্যালেষ্টাইনেই তা মিলিয়ে আসতে লাগলো। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত আমি ইউরোপে ছিলাম; ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবী এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে আমার যতো কিছু আগ্রহ এ-সময় তা সম্পূর্ণ মুছে যায়। সমাজ অর্থনীতি এবং রাজনীতির বৃহত্তর সমস্যাগুলির মধ্যেই এ-সময় আমি সম্পূর্ণ ডুবে ছিলাম। ইহুদীরা যে কেন তাদের বেদনাদায়ক সমস্যার উপরে এতখানি ঝুঁকে পড়েছে তা আমি বুঝি। এ সমস্যাকে উপেক্ষা বা অবহেলা করা চলেনা। কিন্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদ এবং তার কুফলের অবসান ঘটাবার

প্রচেষ্টারই একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার প্রতি আমি কোনই আকর্ষণ বোধ করিনা। ভারতবর্ষ এবং ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তারই অংশ। কিন্তু রাষ্ট্রদাবীর ভিত্তিতে ইহুদীরা যে আন্দোলন চালাচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের খুঁটির সঙ্গেই তা বাঁধা।

শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বসমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়েই জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান হবে বলে আমার আশা। ইহুদীরা এর কি উত্তর দেবে তাও আমি জানি। তারা বল্‌বে, 'শেষ পর্য্যন্তে'র আশায় আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌তে পারিনা। এ-কথা আমি জানি। ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবীকে ব্যাহত করতে পারে এমন কোনও কথা আমি বলিনি, তেমন কাজও করিনি। তবে, এ-ব্যাপারে অংশ গ্রহণের জন্য যে চারিত্রিক উত্তেজনা এবং আদর্শগত মতৈক্যের প্রয়োজন তা আমার নেই।

১৯৩৪ সালে আমি একমাস প্যালেস্টাইনে ছিলাম, ১৯৪২ সালে নিরুদ্বেগ দশদিন। কিন্তু ইহুদীদের রাষ্ট্র-দাবীর সমর্থনে যৌবনে আমার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল তা আর ফিরে পাইনি। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস যে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে কোনও জাতির পক্ষেই তার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। ইহুদীদের মতো ছোট একটি জাতির পক্ষে তো নয়ই। আত্মকেন্দ্রিক নীতি অনুসরণের ফলে সাম্প্রতিক কয়েক বছরের মধ্যে কতগুলি জাতি রসাতলে গেছে ?

প্যালেস্টাইন সৌন্দর্য্যময় দেশ। এখানকার ইহুদীদের মধ্যে অনেকের জীবনই বেশ সুখী এবং কর্ম্মময়। সৃষ্টি এবং স্থায়িত্ব থেকেই তাদের এ সুখের উদ্ভব। তারা গড়ে চলেছে—বাড়ীঘর, কৃষিপত্তন, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল আর স্কুল। তারপর, এই বিভিন্ন জড়বস্তুর সমন্বয়ে তাদের পিতৃভূমি গড়ে উঠ্‌ছে—এ

এক অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। তারা যে ত্যাগস্বীকার করেছে তা মনের উপর রেখাপাত করে। ইহুদী-প্যালেষ্টাইন রক্তস্নাত, আদর্শবাদে আপ্লুত। এখানেও ফাট্‌কাবাজ, শোষক এবং স্বার্থান্বেষী লোক রয়েছে বটে তবে সংখ্যায় কম। মানুষ আসলে যা, উদ্দেশ্যের মহত্ব মাঝে মাঝে তাকে তার থেকেও বড় করে তোলে। প্যালেষ্টাইনে গিয়ে বুঝতে পারা যায় যে, সমাজের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে মানুষ যে সাফল্য অর্জ্জন করে তার যোগফলের চাইতে এই সার্ব্বিক সাফল্যের পরিমাণ ঢের বেশী। এই বাড়তি পরিমাণটুকুর নামই বোধ হয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বল্‌তে এখানে সভ্য মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রাকেই বোঝানো হয়েছে।

ইহুদীরা অন্যান্য অঞ্চলেও, যথা—আর্জ্জেন্টিনা, ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া এবং স্যাণ্টো ডোমিংগোতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে গিয়ে বসতিস্থাপনের চেষ্টা করেছিল। সে প্রচেষ্টা অল্পবিস্তর সাফল্যমণ্ডিতও হয়। তবে অর্থনৈতিক দিক্ থেকে প্যালেষ্টাইনে বসতিস্থাপনের চেষ্টাই অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্যালেষ্টাইনকে গড়ে তুলবার জন্যে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের ইহুদীরাই ব্যাপকভাবে অর্থসাহায্য দিয়েছে ; সে সাহায্যের পরিমাণ কোটি কোটি ডলার। প্যালেষ্টাইনের পিছনে ইহুদীরা শুধু টাকাই ঢালেনি, তার উপরে ভালোবাসাও ঢেলে দিয়েছে। প্যালেষ্টাইনের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সোনা দিয়ে গড়া, পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের ইহুদীদের সোনা। তবে সেই ইহুদী-অর্থনীতির সামর্থ্য এখনও পরীক্ষিত হয়নি।

জিয়ন-এর প্রতি একটা টান থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের বহু ইহুদীই বোধ হয় সম্ভব হলে আমেরিকাকেই তাদের বাসস্থান হিসেবে বেছে নেয়। বস্তুতঃ প্যালেষ্টাইনের কিছু কিছু ইহুদীও আমেরিকায় চলে যেতে পারে। মুষ্টিমেয় রেড্‌ ইণ্ডিয়ানের কথা বাদ দিলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাদবাকী সমস্ত অধিবাসীই হলো বহিরাগত এবং

শরণার্থীদের সন্তান। তা সত্ত্বেও সামান্যসংখ্যক নবাগত ছাড়া অন্যান্য সকলের কাছেই তার দুয়ার রুদ্ধ। লোকসংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বিরলবসতিসম্পন্ন অন্যান্য বড় বড় দেশগুলিও—যথা অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল—আজ ইহুদী বহিরাগতদের চায়না।

বাকী থাকে ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইন।

হিটলার-অধিকৃত ইউরোপে ইহুদীদের যে কী বিভীষিকাময় যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। ইউরোপের সত্তর লক্ষ ইহুদীদের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষজনকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হত্যা করা হয়েছে। বোমাবর্ষণে বা যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিহত হয়নি (তাতেও অবশ্য প্রচুর ইহুদী মারা যায়), ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডামাথায় তাদের হত্যা করা হয়েছিল। "তুই-তুই-তুই, তোদের জন্যে গ্যাসকামরা।" "তুই-তুই-তুই, চুল্লীতে পুড়িয়ে মারা হবে তোদের।" "তুই-তুই-তুই, যতক্ষণ না ঢলে পড়ছিস্—নামমাত্র খেতে দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া হবে তোদের, তারপরে তোদের চুল্লীর মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হবে।" পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে নিপুণভাবে হত্যা করা হলো। নাৎসীরা সব মধ্যযুগীয় প্রথায় কুড়ুল চালিয়ে নাৎসীবিরোধীদের উচ্ছেদ করেছিলো; আধুনিক যুগের রসায়ন এবং পদার্থবিত্থার প্রয়োগ করে তারা ইহুদীদের হত্যা করলো।

যে ইউরোপকে হিটলার বিষাক্ত করে তুলেছে ইহুদীরা যে আর সেখানে থাকতে চাইবেনা তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। হিটলারের পূর্ব্বেও, বিভিন্ন দেশে ইহুদীসম্প্রদায়ের উপর অসম্মানজনক নানা বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হলো একমাত্র দেশ—সরকার যেখানে ইহুদী-বিদ্বেষকে সুনজরে দেখ্তেন না। এর জন্যে তাঁরা শাস্তিবিধানও করেছেন। জাতিগত ভিত্তিতে হত্যা করবার যে-একটা সক্রিয় সামাজিক রেওয়াজ ছিল সেখানে তা

প্রায় বিলুপ্তই হয়ে যায়। ইউরোপের অন্যত্র এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই, ইহুদীদের নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কোনও দিন পুরো মর্য্যাদা দিয়ে সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আইন, রাজনীতি, ধর্ম্ম এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইহুদীদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তাদের মধ্যেও প্রতিভাশালী এবং প্রতিভাবান, অপরাধী এবং ব্যর্থকাম ব্যক্তি রয়েছে। সরকারীভাবে আমেরিকায় ইহুদী এবং অ-ইহুদীদের মধ্যে কোনও পার্থক্য গণনা করা হয়না। তবে ব্যক্তিগতভাবে বহু লোক এবং বহু গোষ্ঠীই সে পার্থক্য গণনা করে। আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান ইহুদীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিহার করে' চলে; নয়তো সে-সম্পর্ককে যথাসম্ভব কমিয়ে আনে। সেখানে 'পৃথক' হোটেল রয়েছে, হোটেল রয়েছে 'শুধুমাত্র খৃষ্টান খদ্দেরদের জন্যে।' এটা খুব খৃষ্টীয় আচরণ নয়। ইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে এই যে অনিচ্ছা—এর মূলে গন্ধ, বর্ণ, সম্পদ, আচারব্যবহার, শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি, আহারবিহার, অথবা আপ্যায়নক্ষমতাগত কিছুমাত্রও বৈষম্য নেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই খৃষ্টানরা এখন ইহুদীদের খুঁজে পাবেন যারা তাঁদের সমকক্ষ। ধর্ম্মগত বৈষম্যই কি এই পার্থক্যের কারণ? ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে গিয়ে খৃষ্টানরা শেষ বাইবেলের নামগুলিকেও বর্জ্জন করেছেন। লিঙ্কনের মতো ক'জন খৃষ্টানের নাম আজকাল আব্রাহাম রাখা হয়? অথবা নিউটনের মতো আইজাক? অথবা অ্যাষ্টারের মতো জেকব? অথবা ফ্রাঙ্কলিনের মতো বেঞ্জামিন? অথবা রুটের মতো এলিহু? অথবা ওয়েবষ্টারের মতো নোয়া? সারা লিয়া ইত্যাদি নাম আজকাল আর ক'জনের রাখা হয়? বাইবেলের নামগুলিকে খৃষ্টানরা যেমন আশ্চর্য্যভাবে ইহুদীগন্ধী নাম বলে' মনে করে, ইহুদীরাও তেম্নি আবার অ্যাংলো-স্তাক্সন এবং ফরাসী নাম-গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

আমাদের সভ্যতার একটা মারাত্মক ব্যাধি হলো এই যে, মানুষ তার আপন সত্তাকেই এড়িয়ে চল্‌তে চায়। ইহুদীবিদ্বেষও ইহুদীদের মধ্যে এই ব্যাধিকেই সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। মারাত্মকভাবে তারা হীনম্মণ্য হয়ে পড়ছে। তাদের এখন ধারণা যে, ইহুদীদের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অথবা সংস্কারক অথবা সংবাদপত্রের প্রকাশক হতে যাওয়া উচিত নয়। ইহুদীদের ওপরে অন্যেরা যে বাধানিষেধের বোঝা চাপিয়েছে তারই ফলে ইহুদীরা নিজেরাই এখন নিজেদের ওপরে আরও বাধানিষেধের বোঝা চাপিয়ে চল্‌ছে।

বহু ইহুদীই আজ পৃথিবীতে এখন একটি স্থানলাভের প্রয়োজন বোধ করে ইহুদীরা যেখানে ইহুদী হয়েই বাঁচতে পারবে। ইহুদী হয়ে' বাঁচতে চায় বলেই তারা এর প্রয়োজন বোধ করে, অন্যেরা তাদের চায়না বলে নয়।

ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, ইহুদীরা একান্তভাবেই ধর্ম্মনিষ্ঠ। এ-যুক্তি হাস্যকর। আমেরিকার ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মপ্রাণ নয়, তা-সত্ত্বেও তারা শোণিতসম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধনের টান অনুভব করে। তারা যে ইহুদী—অপরের ইহুদীবিদ্বেষই হয়তো তাদের মধ্যে সেই বোধকে সঞ্চারিত করে দেয়।

ইহুদীদের মধ্যে জুডাইজ্‌ম্‌কে যারা শুধুমাত্র ধর্ম্ম বলেই গণ্য করে—পৃথক ইহুদী-রাষ্ট্র স্থাপনের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এক ক্রমবর্দ্ধমান অংশ আজ ইউরোপের ইহুদীদের জন্য এক স্বর্গরাজ্য খুঁজে বার করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠ্‌ছে। তারা আরও বুঝতে পারছে যে, এ ব্যাপারে বহিরাগত-ভীরু আমেরিকার পরেই হলো প্যালেস্টাইনের স্থান। কয়েক বছর আগেও যারা ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবীর বিরোধী ছিলো, সচরাচর তারা এখন এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ; অনেকে সেই দাবীর সমর্থক হয়েও দাঁড়িয়েছে। এ দাবীর রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে তাদের আপত্তি থাকতে পারে; তবে ঘরছাড়া

শান্তিহীন ইহুদীদের জন্য নতুন বাসস্থান খুঁজে বার করবার প্রয়োজনীয়তা তারা অস্বীকার করতে পারেনা।

এ পৃথিবী যদি আরও ভাল জায়গা হতো ইহুদীদের তা-হলে প্যালেষ্টাইনে যাবার কোনও প্রয়োজনই হতোনা। যেতে চাইতোওনা কেউ। জার্ম্মানী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং অন্যান্য দেশেই তারা বসবাস করতে পারতো। কিন্তু হিটলারের ইহুদীবিরোধী নৃশংসতার রঙ্গভূমিকে পরিত্যাগ করবার আকাঙ্ক্ষাই এখন ইউরোপের ইহুদী-সমাজের মনে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আজ জাতীয়তাবাদ এত বেশী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে, ইহুদীবিরোধী মনোভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই! অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে হিটলারকে পরাজিত করা সহজ; কিন্তু যে বিষ প্রয়োগ করে' হিটলার একটি মহাদেশকে—বস্তুতঃ একটি মহাদেশের অপেক্ষাও ব্যাপকতর অঞ্চলকে জর্জ্জর করে তুলেছিলেন সেই বিষের বিনাশসাধন তত সহজসাধ্য নয়।

ইহুদী, এবং অ-ইহুদীরাও যেরকম ব্যাপকভাবে ইহুদীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীকে গ্রহণ করছেন তাতে বোঝা যায় যে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবী এবং শান্তি সম্পর্কে তারা সন্দিহান।

ইহুদীরা প্রত্যেক দেশেরই বিজ্ঞান, কলা, শিক্ষা, শিল্প এবং শাসন-ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও যে অধিকাংশ দেশই ইহুদীদের দূরে ঠেলে রাখে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যে সব দেশ গড়ে উঠেছে, সেই প্রতিযোগিতাই কি আজ তাদের কাছে অসহ্য? জার্ম্মানীর ইহুদী বৈজ্ঞানিকদের নির্ব্বাসিত, নিপীড়িত এবং হত্যা করবার ফলেই খুব সম্ভবতঃ হিটলারকে পরাজিত হতে হলো। বৃটিশ এবং মার্কিণ সরকার বুদ্ধি করে' তাদের আশ্রয় দিলেন, যুদ্ধের কারখানা এবং গবেষণাগারগুলিতে নিযুক্ত করলেন তাঁদের। অবশ্য, দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, শান্তি-

প্রতিষ্ঠার পর, বেকার সমস্যার সৃষ্টি হবার আশঙ্কা রয়েছে। আমেরিকার ভবিষ্যৎ-উন্নয়ন সম্পর্কে মার্কিণ জনসাধারণের মনে যখন আস্থা ছিল, তখন দরজা খোলাই তাদের। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধির অনন্ত সম্ভাবনা ; তা সত্বেও এখনও পর্য্যন্ত সে খুবই অনগ্রসর।

আরবরাও ইহুদী বহিরাগতদের বাধা দিচ্ছে। জেরুজালেমে থাক্‌তে স্কোপাস পর্ব্বতে অবস্থিত হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ডাঃ জুডা এল ম্যাগনেসের সঙ্গে রোজই আমি কথাবার্ত্তা বল্‌তে বল্‌তে পায়চারি করে বেড়িয়েছি। আগে তিনি নিউইয়র্কে থাক্‌তেন ; কুড়ি বছরেরও ওপর প্যালেষ্টাইনে আছেন। তাঁর মারফতেই বিশিষ্ট আরব রাজনীতিকদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়।

ডাঃ ম্যাগনেস গান্ধীর ধরণের মানুষ। খুবই ধর্ম্মপ্রাণ এবং সমাজ-সচেতন। ঈশ্বর আর সাধারণ মানুষই তাঁর সবসময়ের সঙ্গী। একাধারে তিনি একগুঁয়ে এবং কোমলস্বভাব। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর পথই হলো ঠিক ; এই একগুঁয়েমি এবং কোমলতার সংমিশ্রণ থেকেই সে কথা অনুধাবন করা যাবে। ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবীর সমর্থকদের মধ্যে অধিকাংশেরই ধারণা যে, তাঁর পথ ভুল। আরবদের সঙ্গে আপোষ করে তাদের দিয়ে তিনি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ইহুদীর বহিরাগমন মেনে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রকৃতপক্ষে প্যালেষ্টাইনের কিছু কিছু ইহুদী এ জন্যে তাঁকে ঘৃণা করে।

প্যালেষ্টাইনের বিশিষ্ট ইহুদীদের মধ্যে একমাত্র ম্যাগনেসই বোধ হয় আরবদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। ইহুদী এবং আরবরা সেখানে দুইটি আলাদা আলাদা জগতে বাস করে। পরস্পরের প্রতি তাদের অপরিসীম ঘৃণা এবং বিদ্বেষ। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইনে যে অবস্থা বিরাজমান ছিল তাকে গৃহযুদ্ধই বলা যায়। আরবরা ইহুদীদের অবরোধ করতো, গুপ্তস্থান থেকে আক্রমণ চালাতো তাদের উপরে। দু'-পক্ষেই তখন প্রচুর লোক হতাহত হয়।

দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়াতেই এ গৃহযুদ্ধে একটা ছেদ পড়ে। আপোষ-আলোচনার মধ্য দিয়েই ম্যাগনেস এই অবস্থার অবসান ঘটাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর বিরোধীপক্ষ বলেন, আগে ইহুদীরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করে তুলুক তারপর তারা আরবদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাতে যাবে। যুক্তিহিসেবে তাঁরা বলেন যে, আপোষ করতে গেলে সেটাকে তাদের দুর্ব্বলতা বলেই ধরে নেওয়া হবে। তাতে কোনই সুফল হবেনা।

জেরুজালেমের মুফ্‌তি হজ্‌ আমিন আল্‌ হুসেনি বৃটিশদের হাত থেকে পালিয়ে হিট্‌লারের সঙ্গে দেখা করতে যাবার পর আউনি আবদুল-হাদিই প্যালেষ্টাইনের আরবদের মধ্যে বিশিষ্টতম পুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হয়েছে, ডাঃ ম্যাগনেসও তখন সেখানে ছিলেন। ডাঃ খালিদি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট আরব-নেতার সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎকার হয়। পরে একদিন এক আরব-ভবনে তাঁদের সকলের সঙ্গেই আবার আমার কথাবার্ত্তা হয়েছিল।

এই আরব রাজনীতিকবৃন্দ স্বীকার করলেন যে, প্যালেষ্টাইনের গ্রামাঞ্চলের আরবরা রোমেলকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। ইহুদীদের সম্পর্কে তাঁরা বললেন যে, প্যালেষ্টাইনকে তারা সমৃদ্ধ করে তোলেনি, নিজেদেরই সম্পদবৃদ্ধি করেছে। সর্ব্বোপরি তাঁরা ইহুদী-বহিরাগমন, ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রয় এবং প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্রস্থাপনের ঘোরতর বিরোধী। তাঁরা জানালেন যে, ইহুদী-রাষ্ট্রদাবীর সমর্থকরা এই ক্ষুদ্র দেশটির রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবার অভিসন্ধিতে নিজেদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করে তুলবার চেষ্টা না করলে ইহুদীদের প্যালেষ্টাইন-আগমনে তাঁরা এত বাধা দিতেন না।

আরবদের এই বিরোধিতার আর কোনও নড়চড় নেই। ইহুদীদের উদ্যমশীলতার ফলে প্যালেষ্টাইনের আরবরা স্পষ্টতই উপকৃত হয়েছে।

আরবরা যে ইহুদী-পদ্ধতির নকল করে' কতখানি উপকৃত হয়েছে, ইহুদীবসতির সংলগ্ন কোনও আরব গ্রামের উপর দৃষ্টিপাত করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। সাংঘাতিক রকম চড়া দামে ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রী করেও আরবরা প্রচুর টাকা লুটে নিয়েছে। ইহুদীদের সান্নিধ্যে থেকে আরবদের জীবনধারণের মান, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছে। ইহুদীদের প্যালেষ্টাইন-প্রবেশ আরবদের ক্রুদ্ধ করেছে সত্য, তবে শীঘ্রই এটা হয়তো তাদের ধাতস্থ হয়ে যেত। আরবরা যে মীমাংসাপরাঙ্মুখ হয়ে ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবীকে বাধাপ্রদান করছে—এর মূলে রয়েছে বাইরের উস্কানী।

মধ্য এশিয়ার আরবরা আজ জাতীয়তাবাদ নিয়েই মত্ত। সাম্রাজ্যবাদ সর্ব্বক্ষেত্রেই হলো জাতীয়তাবাদের জনক। ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই আঁচল-ধরা; এ দাবীও তাই আরবদের মধ্যে দ্রুতভাবেই জাতীয়তাবাদের সঞ্চার করে দিয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন, সৌদী আরব, মিশর এবং প্যালেষ্টাইনের সম্ভবতঃ উত্তর আফ্রিকার আরব-অধ্যুষিত অঞ্চলেরও আরব নেতারা আজ ঐক্যের স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্ন দেখছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরব-লীগ একটা প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। আরবরা মূলতঃ যদিও একই জাতি এবং যদিও তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো মুসলমান (আরবদের মধ্যে কিছু কিছু খৃষ্টানও আছে) তা সত্ত্বেও কোনওদিনই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। নানা কারণে তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এমন একটা কিছু উপলক্ষ্য তারা চায় যা তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে। ইহুদীদের রাষ্ট্রদাবীই হলো সেই উপলক্ষ্য। জার্ম্মানদের জাতীয়তাবাদের আগুনে ইহুদীদের ছুঁড়ে দিয়ে হিটলার সেই আগুনকে তাতিয়ে তুলেছিলেন; আরবরাও তেম্নি ইহুদীদের আশাআকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার উপরেই এক আরব-সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায়। মধ্য-এশিয়ার বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ

প্রায়ই নানান রকম নীতি নির্দ্ধারণ করে সে সম্পর্কে ডাউনিং ষ্ট্রীটের অনুমোদন প্রার্থনা করতে ছোটে। বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যে নীতি অনুসরণ করে চলে তা পরস্পরবিরোধী। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, প্যালেষ্টাইনের কোনও একটি দপ্তরের জ্ঞাতসারেই অথবা সাহায্য নিয়েই আরবরা সশস্ত্র হয়ে ওঠে, ওদিকে অন্য একটি দপ্তরের আচরণে ইহুদী-অনুরাগ সুস্পষ্ট।

মোটামুটিভাবে বল্‌তে গেলে বৃটিশ সরকারই আরবদের তোয়াজ করে আরব-লীগ প্রতিষ্ঠার সুবিধে করে দিয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁরা হয়তো মনে করেছিলেন যে, আরবদের সঙ্কল্পকে দমন করে রাখা সম্ভব হবেনা। অথবা তাদের হয়তো আশঙ্কা হয়েছিল যে, বৃটেন যদি আরবদের সমর্থন না করে তাহলে রুশিয়া অথবা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অথবা ফ্রান্স হয়তো আরবদের সমর্থন করতে এগিয়ে আসবে। তাছাড়া, আরবরাও জবরদস্তির ভয় দেখায় এবং বৃটিশ সরকারও তাতে পিছিয়ে যান। ভারতবর্ষের ন' কোটি কুড়ি লক্ষ মুসলমানের কথাও ইংলণ্ডকে স্মরণ রাখতে হয়।

বৃটিশ সরকারের দোমনা, হয়তোবা সহানুভূতিসম্পন্নই, মনোভাব বুঝতে পেরে এবং সেইসঙ্গে প্যালেষ্টাইনের বাইরের আরবদের উস্কানীতে উত্তেজিত হয়ে' পুণ্যভূমির আরবরা আজ সাংঘাতিকভাবে ইহুদী-রাষ্ট্রের বিরোধী হয়ে উঠেছে। প্যালেষ্টাইনে তলে-তলে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চল্‌ছে, কখনো কখনো তা বাইরেও প্রকাশ পায়। ইহুদীরা সাহসী যোদ্ধা; অনেক খণ্ডযুদ্ধ তারা জিতেছে। অবরুদ্ধ হয়েও জুডার এবং গ্যালিলিতে তারা জয়লাভ করে। তেল হাই এবং উত্তর গ্যালিলির কৃফার গিলেদির ইহুদী-কেল্লাকে রক্ষা করবার জন্য আমিও যুদ্ধ চালিয়েছিলাম। সেখানে রাত্রিতে পাহারা দিতে দিতে আমরা শুন্‌তে পেতাম, জর্ডন নদী তার উৎসমুখ থেকে সশব্দে ডান-অঞ্চলের উপরে নেমে আসছে। এ হলো ১৯১৯ সালের কথা।

সমস্যা এখন আরো অনেক গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে ; রণসজ্জা এবং ইহুদী সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপও বৃদ্ধি পেয়েছে সেইসঙ্গে।

১৯৪২ সালে যে-সমস্ত ইহুদীর সঙ্গে আমি আলোচনা করলাম, তাদের পক্ষে বৃটেনকে তার অসংখ্য প্রতিশ্রুতিকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য চাপ দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই। ইতিমধ্যে তারা গঠনাত্মক কাজ চালিয়ে যাবে ; আঁকড়ে থাক্‌বে নিজেদের জমি। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্তও ইহুদী এবং আরবরা যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং যুক্ত বণিকসমিতি গঠন করে' সম্মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের বিরোধের অবসান ঘটাতে পারতো। কিন্তু শ্রমিকদলপন্থী এবং ইহুদী এজেন্সীর অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা মোশে শার্টক ১৯৩৪ সালে জেরুজালেমে আমাকে জানিয়েছিলেন, "আমরা আগে জাতীয়তাবাদী, পরে সমাজতন্ত্রী।" ইহুদীরা হলো জঙ্গী ইহুদী জাতীয়তাবাদী এবং আরবরাও হলো জঙ্গী আরব জাতীয়তাবাদী ; কোনও ম্যাগনেসেরই পক্ষে এ বিরোধের অবসান ঘটাতে পারা সম্ভব নয়। এখন আর তার সময় নেই।

প্যালেস্টাইনে আমার নিরুদ্বেগ দশদিন খুবই অস্বস্তির মধ্য দিয়ে কেটেছে।

জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সচরাচর যে-পথে রাষ্ট্রদাবীর মীমাংসা করা হয়ে থাকে সে-পথে প্যালেস্টাইন-সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। ইহুদী, মুসলমান এবং খৃষ্টানরা আজ যাতে জাতিধর্ম্মগোষ্ঠীনির্ব্বিশেষে বন্ধুভাবে প্যালেস্টাইনে বসবাস করতে পারে—তাই-ই প্যালেস্টাইনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ-লক্ষ্যে পৌঁছুনো কষ্টসাধ্য সন্দেহ নেই। যে-সমস্ত দেশকে তেমন ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হয়নি এবং যে-সমস্ত দেশ অধিকতর সমৃদ্ধ, এখনও পর্য্যন্ত এটা তাদের লক্ষ্যের বাইরেই থেকে গেছে।

১৯৪২ সালে আক্রমণের হাত থেকে প্যালেস্টাইন রক্ষা পেয়ে যায়।

১৯৪২-এর জুন মাসে আমি যখন প্যালেষ্টাইন থেকে কায়রোতে এসে পৌঁছলাম সহরটির অবস্থা তখন উত্তেজনাপূর্ণ। মিশরের হলুদ বালু-রাশির উপর দিয়ে স্পষ্টভাবেই তখন জেনারেল রোমেলের ছায়ামূর্ত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। জয়পরাজয়ের পাল্লা তখন সমান-সমান, মিত্রপক্ষ উৎকণ্ঠিত। পোলদের সহায়তায় বৃটিশ বাহিনী বীরের মতই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তবে তাদের তখন আরও সাহায্য পাবার প্রয়োজন। ১৯৪৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সমরসচিব ষ্টীমসন তাঁর বিদায়বাণীতে বলেন, "লিবিয়াতে গ্রেট বৃটেনের যে ট্যাঙ্ক-বাহিনী ছিল, ১৯৪২-এর গ্রীষ্মকালে একটিমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই মার্শাল রোমেল তার এক বিরাট অংশের ধ্বংসসাধন করেন। সঙ্কটপরিত্রাণের একমাত্র উপায়হিসেবে জেনারেল মার্শাল (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চীফ অব ষ্টাফ) তখন আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করে' আমাদের শিক্ষানিরত বাহিনীর মাঝারি ট্যাঙ্ক-গুলিকে জাহাজযোগে লিবিয়ায় পাঠিয়ে দেন।

"উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি সাঁজোয়াবাহিনী তখন জাহাজে উঠ্‌বার জন্য বন্দরে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এ বাহিনীটির কাছ থেকেও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেওয়া হলো; ট্যাঙ্কগুলির শূন্যস্থান পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত যাত্রা পিছিয়ে দেওয়া হলো তাদের। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ততক্ষণে রোমেলের গতিরোধ করা হয়েছে। সঙ্কটত্রাণ হলো এইভাবে। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, অবস্থা সম্পর্কে মার্শালের ধারণাই ছিল নির্ভুল। হিটলারের ইচ্ছা ছিল যে, মিশরের মধ্য দিয়ে তিনি গিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছুবেন। তিনি তা পারলে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে যেত।"

আল্ আলামিন এবং সুয়েজের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ বালুময় জমিটুকু রোমেলকে কিছুতেই অধিকার করতে দেওয়া হয়নি। ফলে প্যালেষ্টাইন রক্ষা পেয়ে গেল; হিটলারও আর ভারতবর্ষে গিয়ে জাপানীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারলে না। তিনি তা

পারলে চক্রশক্তি হয়তো একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে পারতো, অথবা আরো বেশ কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতো।

রোমেল যেদিন বৃটিশ ট্যাঙ্কবাহিনীর ধ্বংসসাধন করেন, সেদিন আমি কায়রোতে। সে সন্ধ্যায় যে সাংবাদিক বৈঠকের অনুষ্ঠান হয় সেখানে প্রত্যেককেই পাংশু দেখাচ্ছিল। জনৈক ইংরেজ সাংবাদিক বল্‌লেন, "অবস্থা তা হলে এই!" এই অবস্থাতেই রোমেলকে হটিয়ে দেন মার্শাল।

ক্লিপারে করে' ৫ই অগস্ট আমি নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছুই। মিশরে তখনও যুদ্ধ চল্‌ছে। ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ। গান্ধীজী এবং নেহেরু দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করতে উদ্যত। ৮ই আগষ্ট তাঁরা সে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকার গ্রেপ্তার করলেন তাঁদের। সুতরাং ৫ই আগষ্ট তারিখে সকলের দৃষ্টিই ছিল ভারতবর্ষের উপর নিবদ্ধ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার মতামত জান্‌বার জন্যে বহু সাংবাদিক লা গর্ডিয়া বিমানঘাঁটিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। পরদিন সকালের "নিউ ইয়র্ক টাইমস্"-এ "গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপনিরত" অবস্থায় আমার একখানা তিনকলম ছবি ছেপে বেরুলো, সেইসঙ্গে আলাপের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পৌনে এক কলম সংবাদ। 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন'ও আমার মতামত লিপিবদ্ধ করবার জন্য সমান পরিমাণ স্থান ব্যয় করেছিলেন। সারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ছবিখানি এবং সেইসঙ্গে আমার বিবৃতির কিছুটা অংশ পুনর্মুদ্রিত হলো।

খেয়ালের মাথায় প্যালেষ্টাইনে যাত্রা স্থগিত না রেখে, ভারতীয় ঘটনাপ্রবাহ গুরুত্ব লাভ করবার পূর্ব্বেই, আমি যদি দশ দিন আগে এসে বাড়ী পৌছুতাম তা হলে ক্লিপারটির আগমন-সংবাদটুকুমাত্র জানিয়ে পত্রিকাগুলিতে লেখা হতো, "যাঁরা যাঁরা এই বিমানে এসে পৌঁচেছেন লুই ফিশার তাঁদের অন্যতম।"